شَانِ رِسَالَتْ
শানে রিসালত

লেখক
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

সম্পাদনায়
সৈয়দ মুহাম্মদ ইব্রাহীম
সৈয়দ মুহাম্মদ মনছুরুর রহমান
আবু নাছের মুহাম্মদ তৈয়্যব আলী

প্রকাশকাল
১ জুমাদাল উলা, ১৪৩৫ হিজরী
১৯ ফাল্গুন, ১৪২০ বাংলা
৩ মার্চ, ২০১৪ ইংরেজি

হাদিয়া :
১৫০ টাকা মাত্র

প্রকাশনায়
আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট
(প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ)
৩২১, দিদার মার্কেট দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০। ফোন: ০৩১-২৮৫৫৯৭৬, ৬৩৪২৪১, ৬২৪৩২২
www.anjumantrust.org
e-mail:anjumantrust@yahoo.com,anjumantrust@gmail.com

মুখবন্ধ

বিস্‌মিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী ওয়া নুসাল্লিমু 'আলা হাবীবিহিল করীম
ওয়া 'আলা আলিহী ওয়া সাহবিহী আজমা'ঈন

হুযূর-ই আক্‌রাম, নূরে মুজাস্‌সাম, রহমতে আলম, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যেমন আল্লাহর সর্বাপেক্ষা প্রিয় রসূল, তেমনি তাঁর শান বা প্রশংসার আলোচনাও আল্লাহর মহান দরবারে অতীব বরকতমণ্ডিত ও প্রিয় কর্ম। হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর না'ত খাঁ হযরত হাস্‌সান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে মিম্বর শরীফের উপর বসিয়ে দো'আ করেছেন, হযরত কা'ব ইবনে যুহায়র রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে চাদর বিছিয়ে দিয়ে সম্মান দান করেছেন, ইমাম বূসীরী আলায়হির রাহমাহ্‌কে স্বপ্নযোগে দীদার দান করে দুরারোগ্য রোগ থেকে সুস্থ করে দিয়েছেন এবং বুবরদাহ্‌ বা চাদর শরীফ দান করেছেন। এভাবে আরো বহু ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তদুপরি, নবী করীমের মহান সত্ত্বার গুণাবলী ও অগণিত মু'জিযার মধ্য দিয়ে একদিকে নবী করীমের মহা মর্যাদা এবং অন্যদিকে এমন নবীকুল সরদারের মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌ তা'আলার মহা ক্বুদরতের পরিচয় পাওয়া যায়। এর ফলে আলোচনাকারী ও পাঠক-শ্রোতার হৃদয়মন হয় আলোকিত, ঈমান হয় মজবুততর, তদুপরি এমন মহান নবীর উম্মত হতে পারার জন্য তাদের মন আনন্দে ভরে ওঠে, আর তজ্জন্য আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার সুযোগ পান।

এসব কারণে মানুষের মধ্যে ঈমানের প্রাণ নবী করীমের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা সৃষ্টি ও ইসলামের প্রকৃত আদর্শ (সুন্নী মতাদর্শ) প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশিত 'মাসিক তরজুমান-ই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত', চট্টগ্রাম নিয়মিতভাবে অন্যান্য বিভাগের সাথে সাথে 'শানে রিসালত' শিরোনামে একটি বিশেষ বিভাগও প্রকাশ করে আসছে। এ বিভাগে (শানে রিসালত) আজ কয়েক বছর যাবৎ বিশিষ্ট লেখক, গবেষক এবং সংগঠক জনাব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান নিয়মিতভাবে নিবন্ধসমূহ লিখে আসছেন। এসব নিবন্ধে তিনি আমাদের আক্বা ও মাওলা হুযূর-ই আক্‌রাম, রসূল-ই মু'আয্‌যাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শান তথা বিভিন্ন অনন্য বৈশিষ্ট্য, মু'জিযাত ও মহান শিক্ষা নির্ভরযোগ্য কিতাবাদি ও গ্রহণযোগ্য প্রমাণাদির আলোকে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা ও আল্লাহর হাবীব আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস্‌ সালাম-এর মহান দরবারে তাঁর বরকতমণ্ডিত প্রয়াস কবুল হোক এবং এর যথাযথ প্রতিদান প্রাপ্ত হয়ে তিনি এবং প্রকাশক ও পাঠকগণ ধন্য হোন! আ-মী-ন।

এ পর্যন্ত এ বিভাগে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলো থেকে সত্তরাধিক বিষয় (নিবন্ধ) চয়ন করে একটি সুপাঠ্য পুস্তাকারে প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এতে সম্মানিত পাঠক সমাজ সহজে একসাথে এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো পাঠ-পর্যালোচনা ও সংরক্ষণের সুযোগ পাবেন।

প্রবন্ধগুলো এ পুস্তকে বিশেষ বিবেচনা ও নিয়মে সুবিন্যস্ত হয়েছে, যা পাঠক সমাজের সামনে সহজে সুস্পষ্ট হবে। তবে মুদ্রণ প্রমাদ এড়ানো কতটুকু সম্ভব হয়েছে বলা যায় না। পাঠক সমাজের গঠনমূলক পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি রইলো।

সূচি

বিষয়	পৃষ্ঠা
❍ নূর-ই মোস্তফার বয়স কতো?	৫
❍ হযরত আবদুল মুত্তালিব স্বপ্নে সুসংবাদ পেলেন	৭
❍ হযরত আবদুল্লাহর নিকট যখন নূর-ই মুহাম্মদী আসলো	৭
❍ সত্তরজন ইহুদীর চক্রান্ত ব্যর্থ হলো	৮
❍ নূর-ই মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মা আমিনার পবিত্র গর্ভে	৯
❍ যাঁর প্রশংসা তাওরীতে লিপিবদ্ধ	৯
❍ হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বেলাদত শরীফের সময়কার কতিপয় অলৌকিক ঘটনা	১২
❍ হযরত হালীমার সৌভাগ্য	১৬
❍ দুগ্ধপান	২০
❍ মু'জিযা (ইরহাস)	২৩
❍ হযরত খাদীজার আঙ্গিনায় নবূয়তের সূর্য	২৭
❍ নূরনবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ছায়া ছিলো না	৩৪
❍ হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম রহমত-ই আলম	৩৭
❍ খতমে নুবূয়তের উজ্জ্বল নিদর্শন 'মোহর-ই নুবূয়ত'	৪১
'খাতাম' শব্দের বিশ্লেষণ	৪১
'মোহর-ই নুবূয়ত'র আকৃতি	৪৪
❍ হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর রিসালত সার্বজনীন	৪৬
❍ হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর অতুলনীয় সুঘ্রাণ	৫০
❍ হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর হাত মুবারকের খুশবু	৫২
❍ বা'দ আয্ খোদা বুযুর্গ তুঈ ক্বিস্সা মুখ্তাসার	৫৩
❍ হুযূর-ই আক্রামের শিক্ষাদাতা খোদ্ আল্লাহ্ তা'আলা	৫৮
❍ আল্লাহ্ তা'আলা হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে পাঁচ বিষয়ের জ্ঞানও দিয়েছেন	৬১
❍ হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ক্বিয়ামতপূর্ব অনেক আলামত বলে দিয়েছেন	৬৭
❍ বিশ্বনবীর ইল্মে গায়ব	৭৫
❍ দয়া যখন হয়ে যায়	৭৭
❍ হিজরতের সময় হুযূর-ই আকরামের কতিপয় মু'জিযা	৮১
উম্মে মা'বাদের বৃদ্ধা ছাগী দুধেল হলো	৮৪
সুরাক্বাহ্ ইবনে মালিকের ভাবান্তর	৮৫
বুরায়দাহ্ আসলামীর ইসলাম গ্রহণ	৮৬
❍ হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপাদমস্তক শরীফ মু'জিযা	৮৬
❍ হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর আঙ্গুল মুবারকের মু'জিযা	৯০
❍ 'মুহাম্মদ' নামের বরকত ও ফযীলত	৯২
❍ হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর হাত মুবারকের মু'জিযা	৯৩
হাত মুবারকের মাটি শত্রুদের পরাজিত করেছে	৯৪
হাত মুবারকের পরশে উন্মাদনা দূরীভূত হয়েছে	৯৫
হাত মুবারকের বরকতে এক পেয়ালা মালীদাহ্ শত-সহস্র মানুষকে তৃপ্ত করলো	৯৫

বরকতময় আঙ্গুলগুলো থেকে পানির ফোয়ারা প্রবাহিত হয়েছে	৯৮
❍ হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর খেজুরে বরকত	৯৮
❍ ফিরে এলো সূর্য	৯৯
❍ কালো হাবশী ক্রীতদাস হয়ে গেল রুমীদের মতো ফর্সা	১০০
❍ হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হলো	১০৩
❍ হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম জিনদেরও রসূল	১২২
❍ হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর অতুলনীয় বীরত্ব	১১৬
❍ আগন্তুক ও গাছের সাক্ষ্য	১১৯
❍ 'ত্বাব ত্বাব' ও 'মায মায' সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম	১২২
❍ বিরল দা'ওয়াত	১২৯
❍ শাজরাতুল ইয়াক্বীন	১৩১
❍ যেই সৌভাগ্যবানের কোলে আকাশের চাঁদ নেমে এসেছে	১৩৩
❍ হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে খিদমত আঞ্জাম দিলে নামায ভঙ্গ হয় না	১৩৫
❍ কোন্ ধরনের লোকদের আমল বরবাদ হয়ে যাবে	১৪১
❍ খোদার ধনভাণ্ডারে মাহবূব-ই খোদার ইখতিয়ার	১৪৩
❍ সাহায্য ও নুবূয়তের চাবিগুচ্ছ	১৪৪
❍ অদৃশ্য জগতের বৃষ্টি	১৪৬
❍ চতুষ্পদ প্রাণীও হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে চিনতো	১৪৭
❍ সরকার-ই দু'আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করে দিয়েছেন	১৪৯
❍ অন্ধ চোখে জোতি ফিরিয়ে দিয়েছেন	১৫০
❍ হুযূর-ই আকরাম তাঁর খোদা প্রদত্ত ক্ষমতায় একাধিক মৃতকে জীবিত করেছেন	১৫১
❍ রসূলে পাকের সাচ্চা আশেক্বকে আগুন স্পর্শ করেনি	
জনৈক খাওলানী	১৫৩
হযরত আবূ মুসলিম খাওলানী	১৫৪
হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির	১৫৪
হযরত ওমর ফারুক্ব ও হযরত তামীম-ই দারী আগুনকে তাড়িয়েছেন	১৫৫
❍ গো-সাপের সাক্ষ্য	১৫৬
❍ নেকড়ে বাঘের সাক্ষ্য	১৫৭
❍ বোত-প্রতিমা বলে উঠলো	১৫৮
❍ মহান চিকিৎসক	১৫৯
❍ হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বাদশাহী হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম-এর বাদশাহী অপেক্ষা ব্যাপকতর	১৫৯
❍ বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সহানুভূতি	১৬৪
❍ শাহানে ইসলাম যে নবীর প্রতি ক্বোরবান	১৬৬
❍ হায়াতুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতোত্তর মু'জিযাদি	১৬৮
❍ বৃক্ষ শাহানশাহে রিসালতের নির্দেশ পালন করেছে	১৭০
❍ রাওযা-ই আন্ওয়ার আরশ অপেক্ষাও উত্তম	১৭২
❍ ক্বিয়ামতের ময়দানে	১৭৬
❍ হুযূর-ই আক্রামের উজিরদ্বয়ের শত্রুদের অশুভ পরিণতি	১৭৯

বিস্‌মিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াস্ সালাতু ওয়াস্ সালামু
'আলা- হাবীবিহিল করীম। ওয়া আ-লিহী ওয়া আসহাবিহী আজমা'ঈন

নূরে মোস্তফার বয়স কতো?

৬৩ বছর তো রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বাশারিয়াতের বয়স। অর্থাৎ এ ৬৩ বছর নূরের নবী 'বাশারিয়াত'-এর দেহাবরণে দুনিয়াতে সদয় অবস্থান করেছেন; কিন্তু তাঁর নূরী অস্তিত্ব শরীফের বয়স কতো তা আমাদের জানা নেই। রসূল-ই আক্‌রামের নূরের বয়সের আন্দাজ করতে হলে সাইয়্যেদুনা জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম-এর বর্ণনা দেখতে হবে। একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত জিব্রাঈলকে বললেন, "জিব্রাঈল, বলোতো, তোমার বয়স কতো?" তিনি বললেন, "এয়া রসূলাল্লাহ্! আমার বয়স সম্পর্কে এ থেকে আন্দাজ করা যায় যে, আমি আরশের উপর একটি নক্ষত্র দেখতাম। সেটাকে আমি সত্তর হাজার বছর পর একবার দেখতে পেতাম; যাকে আমি বাহাত্তর হাজার বার দেখতে পেয়েছি। এখন কিন্তু সেটাকে দেখতে পাই না।" তখন হুযূর-ই আক্‌রাম মুচকি হেসে বললেন, "সেটা আমার-ই নূর ছিলো।" [সুবহানাল্লাহ্]

একটু চিন্তা করুন! আর আমাদের নবীর নূরের বয়স কতো বলুন! তিনি নিজেই এরশাদ করেছেন- اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُوْرِىْ (আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম আমার নূরকেই সৃষ্টি করেছেন।) অর্থাৎ যখন যমীনরূপী ফরশ বিছানো হয়নি, আসমানরূপী শামিয়ানা টাঙ্গানো হয়নি, চন্দ্র-সূর্যরূপী চেরাগ (প্রদীপ) জ্বালানো হয়নি, নক্ষত্র ও তারকারাজিরূপী লণ্ঠনগুলো আলোকিত করা হয়নি, ঝর্ণা বা জলপ্রপাতের কলকল ধ্বনি প্রকাশ পায়নি, সাগর-মহাসাগরের গতি অস্তিত্বে আসেনি এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনের কোন চিহ্নই ছিলো না, কিন্তু তখনও নূর-ই মোস্তফা আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল ছিলো। খোদ্ হুযূর-ই আক্‌রাম ঘোষণা করেছেন- اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُوْرِىْ অর্থাৎ "সর্বপ্রথম সৃষ্টি হচ্ছে আমারই নূর।" রসূল আমাদের দৃষ্টি থেকে গোপন; কিন্তু আজও জীবিত; আপন হায়াত মুবারকে রয়েছেন। যদি প্রশ্নকরা হয়- আমাদের রসূল যখন ওই ক্বুদ্‌সী জগতে ছিলেন তখন কী করছিলেন? এর জবাব হচ্ছে- তিনি তখন আল্লাহর বিশেষ সান্নিধ্যে তাঁর যিক্‌র করছিলেন, মহান রবের তাসবীহ্ পড়ছিলেন। যদি বলা হয় এখন কি করছেন? তাহলে জবাব আসবে- আপন রবকে স্মরণ করছেন। সুতরাং একথাও সুস্পষ্ট হলো যে, রসূল-ই আক্‌রাম আল্লাহকে যে পরিমাণ স্মরণ করেছেন ওই পরিমাণ স্মরণ (যিক্‌র) গোটা সৃষ্টিজগতে কেউ করতে পারে না। সুতরাং যারা একথা বলার দুঃসাহস দেখায় যে, 'কোন কোন উম্মত আমলের ক্ষেত্রে নবী

অপেক্ষা এগিয়ে যায়, ইলমের মধ্যে শয়তানের ইল্‌ম নবী অপেক্ষা বেশী' (নাঊযুবিল্লাহ্), তাদের লজ্জা থাকা উচিত। (যেমন- কোন কোন দেওবন্দী আমলের মধ্যে নিজেকে নবী অপেক্ষা এগিয়ে গেছে বলে দাবী করেছে, আর ইল্‌ম বা জ্ঞানের মধ্যে শয়তানকে। ওস্তাদ ও শাগরিদ উভয়ই নবী অপেক্ষা এগিয়ে থাকার দাবী করেছে। না'ঊযুবিল্লাহ্। [সূত্র. তাহযীরুন্নাস, পৃ. ৫, কৃত. ক্বাসেম নানূতবী]

অথচ, আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র ক্বোরআনে ঘোষণা করেছেন-

يَآاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ

(হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ্ ও রসূল থেকে এগিয়ে যাবার দুঃসাহস দেখিও না!)

সুতরাং যদি কেউ যমীনের উপর রসূলের আগে চলতে চায়, তবে সে অপরাধী ও পাপী হয়ে যায়, ইবাদতে এগিয়ে যেতে চাইলে দোষী হয়ে যায়, রসূলের আগে রোযা রাখলে পাপী তথা দাগী হয়ে যায়, রসূলের আগে ক্বোরবানী করলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়। সুতরাং ওইসব লোকের একথা বলতে লজ্জা-শরম বোধ করা চাই যারা বলে- "নবী উম্মত অপেক্ষা শুধু ইল্‌মে উত্তম হন; বাকী রইলো আমল্ কখনো কখনো বাহ্যত উম্মত নবীর সমান হয়ে যায়, বরং বেড়ে যায়।"[প্রাগুক্ত]

উম্মত আপন নবী অপেক্ষা আমলে বেড়ে যায় বলতে তাদের লজ্জা করা দরকার, ভয়ে বুক কেঁপে ওঠা উচিৎ।

মনে হয় এ দেওবন্দী অংক শাস্ত্রে খুব পারদর্শী। সে হয়তো হিসাব-নিকাশ করে দেখেছে যে, 'নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বয়স শরীফ ৬৪ বছর। আর তার বয়স ৭৫ বছর। সুতরাং নবী তো শুধু ৬৩ বছর নামায পড়েছেন, কিন্তু সে পড়েছে ৭৫ বছর। নবী করীম শুধু ৬৩ বছর রোযা রেখেছেন, আর সে রেখেছে গোটা ৭৫ বছর। সুতরাং সে এগিয়ে আছে!' আমি তার জবাবে বলবো- তুমি তোমার ৭৫ বছরের সাজদার সাথে সমস্ত মানব জাতি, বরং অন্য সব নবী-রাসূল আলায়হিমুস্ সালাম ও আল্লাহর নৈকট্যধন্য ফিরিশ্‌তাগণের সাজদাগুলোও যোগ করো, এমনকি এর সাথে সমগ্র কায়েনাত (সৃষ্টজগৎ)-এর ইবাদতগুলোকেও যোগ করে নাও, তারপর এর মোট সংখ্যার সাজদা ও ইবাদতগুলোকে এক পাল্লায় রাখো। তবুও কি, এগুলো আমাদের আক্বা ও মাওলা হুযূর-ই আক্‌রামের একটি মাত্র সাজদার সমানও হতে পারে? হতে পারে না। সুতরাং যদি এ সবার ইবাদত হুযূর-ই আক্‌রামের একটি মাত্র সাজদার সমান হতে না পারে, তাহলে হুযূর-ই আক্‌রাম-এর দীর্ঘ ৬৩ বছরের ইবাদতের সমান কিংবা তদপেক্ষা বেশী কীভাবে হতে পারবে? মোটেই পারবে না। কারণ, হুযূর-ই আক্‌রামের মর্যাদা যেমন সর্বাপেক্ষা বেশী, তেমনি ইবাদত-বন্দেগী তাঁরও সর্বাপেক্ষা বেশী। হুযূর-ই আক্‌রামের প্রতিটি গুণই অনন্য অতুলনীয়। আলহামদু লিল্লাহ্!!

হযরত আবদুল মুত্তালিব স্বপ্নে সুসংবাদ পেলেন

হযরত আবদুল মুত্তালিব বলেন, আমি 'হাতীম-ই কা'বা'য় ঘুমাচ্ছিলাম। আমি (স্বপ্নে) দেখছিলাম এক বিরাটাকার বৃক্ষ যমীন থেকে প্রকাশ পাচ্ছে। দেখতে দেখতে সেটা বেড়ে উঠছে। সেটার শাখাগুলো আসমানকে স্পর্শ করলো। আর প্রস্থ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রসার লাভ করলো। সেটার পাতাগুলো সূর্যের চেয়েও বেশী চমকাচ্ছিলো। আমি দেখলাম আরব ও অনারবীয় দেশগুলোর বাসিন্দারা ওই বৃক্ষের সামনে ঝুঁকে গেছে। সেটার আলো ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। তারপর দেখলাম- ক্বোরাঈশের কিছুলোক সেটার শাখাগুলোর সাথে মিলিত হয়ে একাকার হয়ে গেছেন। আর কিছুলোক সেটাকে কেটে ফেলতে চাচ্ছে। কিন্তু যখনই এরা সেটাকে কাটার উদ্দেশ্যে সেটার নিকটে যায়, তখন এক সুন্দর আরবের যুবক তাদেরকে বাধা দেন। আমি আজতক তাঁর চেয়ে বেশী সুন্দর যুবক কখনো দেখিনি। ওই যুবকের শরীর থেকে চতুর্দিকে খুশ্‌বু ছড়িয়ে পড়ছিলো। আমিও চাইলাম ওই আযীমুশ্‌শান বৃক্ষটার সাথে জড়িয়ে যাবো কিন্তু পৌঁছতে পারলাম না।

আমি ওই সুন্দর যুবককে বললাম, ''এর রহস্য কি? তিনি বললেন, ''সৌভাগ্যবানরা সেটার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে।'' এটা শুনতেই আমি আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলো। তারপর আমি এক গনক মহিলার কাছে গেলাম এবং এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করলাম। আমার স্বপ্নের বিবরণ শুনতেই মহিলাটার চেহারার রং বদলে গেলো। আর ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বললো, ''তোমার ঔরসে এক ব্যক্তির জন্ম হবে, যিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের 'শাহানশাহ্' হবেন। সমগ্র দুনিয়া তাঁর সামনে ঝুঁকে যাবে।''

হযরত আবদুল্লাহর নিকট যখন নূর-ই মুহাম্মদী আসলো

যখন ওই নূর মুবারক হযরত আবদুল্লাহর নিকট স্থানান্তরিত হলো, তখন তাঁর মধ্যে বহু আশ্চর্যজনক বিষয় প্রকাশ পেলো। তিনি বললেন, আমি 'বাত্বহা-ই মক্কা' (মক্কার পাথরময়) ভূমি থেকে 'কূহ-ই শোবায়র' (শুবায়র পর্বত)-এ আরোহণ করতাম। তখন আমার পৃষ্ঠদেশ থেকে একটি নূর বের হয়ে দু'টি ভাগে বিভক্ত হয়ে যেতো। একটি অংশ পূর্ব প্রান্তে এবং অপরটি পশ্চিম প্রান্তে প্রসারিত হয়ে যেতো। আর মেঘের আকারে আমার উপর এসে আমাকে ছায়া দিতো। তারপর আসমানের দরজা খুলে যেতো। আর ওই নূর আসমানের উপর চলে যেতো। এর কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে আমার পৃষ্ঠ দেশে মিশে যেতো। যখন আমি যমীনের উপর বসতাম, তখন যমীন থেকে আওয়াজ আসতো, 'হে ওই সত্তা, যাঁর পৃষ্ঠদেশে হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্‌সালাম-এর 'নূর-ই মুক্বাদ্দাস' রয়েছে, আপনার উপর আমার সালাম।'' আর আমি যখন কোন শুষ্ক বৃক্ষ কিংবা

জমির উপর বসতাম, তখন সেটা তৎক্ষণাৎ সবুজ-সজীব হয়ে যেতো এবং সেটার সবুজভরা শাখা-প্রশাখা আমার উপর ছায়া বিস্তৃত করতো। আমি যখন 'লাত', 'ওয্‌যা' ও অন্যান্য বোত্-প্রতিমার পাশ দিয়ে যেতাম, তখন বোত্‌গুলো চিৎকার আরম্ভ করতো। আর বলতো, 'আপনি আমাদের নিকট থেকে দূরে চলে যান! আপনার মধ্যে ওই পবিত্র বস্তু রয়েছে, যার হাতে আমাদের ও দুনিয়ায় সমস্ত বোত্-প্রতিমা ধ্বংস হবে।''

হযরত আবদুল্লাহ্‌র এ কারামত (অলৌকিক ঘটনা)গুলো দূর দূরান্তরে প্রসিদ্ধি লাভ করলো। সৌভাগ্যবানগণ তাঁর বংশে ওই নূরের শুভাগমন কামনা করছিলো, আর হতভাগাগণ সেটার পথ রোধ করার অপচেষ্টা চালাতে লাগলো।

সত্তরজন ইহুদির চক্রান্ত ব্যর্থ হলো!

হযরত আবদুল্লাহর মধ্যে এ সব অলৌকিক ঘটনার সংবাদ পেয়ে ইহুদিগণ বুঝতে পারলো যে, তাঁরই ঔরশে শেষ যমানার নবী, নবীকুল শ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আবির্ভূত হবেন। তাঁরই নূর-এর কারণে হযরত আবদুল্লহ্‌র মধ্যে এ অলৌকিক বৈশিষ্ট্যাদি! তখন তারা হযরত আবদুল্লাহকে হত্যার চক্রান্ত করে ফেলেছিলো, যাতে ওই নূর-ই মোস্তফার শুভ আবির্ভাবের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। সুতরাং সত্তরজন ইহুদি পরস্পর অঙ্গিকার করলো-তারা হযরত আবদুল্লাহকে হত্যা না করে তাদের সম্প্রদায়কে মুখ দেখাবে না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর নূরকে পূর্ণাঙ্গরূপে উদ্ভাসিত করেই ছাড়বেন।

সুতরাং ওই ইহুদীর দল এ কু-উদ্দেশ্যে মক্কা মুকাররামায় আসলো আর সুযোগের সন্ধান করছিলো। একদিন হযরত আবদুল্লাহ্ শিকার করার উদ্দেশ্যে শহরের বাইরে যাচ্ছিলেন। তাঁকে একাকী পেয়ে ওই সত্তরজন ইহুদি তাদের বিষমাখা ধারাল তরবারি নিয়ে তাঁর উপর হামলা করার জন্য এগিয়ে গেলো। কিন্তু এক রংবেরং এর পোশাকধারী অশ্বারোহী সৈন্যদল হঠাৎ আসমান থেকে নেমে আসলো এবং দেখতে দেখতে তারা ওই ইহুদির দলকে শেষ করে দিলো। ঘটনাচক্রে, হযরত ওয়াহাব ইবনে আবদে মানাফ কিছু দূর থেকে এ ঘটনা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। এ কারামাত দেখে তিনি মনে মনে পাকা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তিনি তাঁর মহীয়সী কন্যা হযরত আমেনাকে হযরত আবদুল্লাহর সাথে বিবাহ্ দেবেন। তাৎক্ষণিকভাবে তিনি ঘরে এসে তাঁর স্ত্রী বারবাহ্ বিনতে ওযযাকে এ আশ্চর্জনক ঘটনা বর্ণনা করলেন। আর বললেন, হযরত আমেনার জন্য আরবের এ সুন্দরতম অভিজাত ও অলৌকিক গুণের অধিকারী যুবকই সর্বাধিক উপযুক্ত পাত্র। সুতরাং হযরত বার্‌রাহ্‌কে হযরত আবদুল মুত্তালিবের নিকট পাঠিয়ে এ বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। হযরত আবদুল মুত্তালিবও প্রস্তাবটি সাদরে গ্রহণ করলেন।

নূর-ই মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মা মামিনার পবিত্র গর্ভে। উম্মে ক্বিতালের সাক্ষ্য

হযরত আবদুল্লাহর ঔরসে যতদিন নূরে মুহাম্মদী ছিলো ততদিন হযরত আবদুল্লাহর মধ্যে ওই নূরের চমক উদ্ভাসিত হতো। আরবের অগণিত যুবতী তাঁর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার প্রত্যাশী ছিলো। কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিলো। হযরত মা আমেনার সাথে শাদী হবার পরবর্তী ঘটনা। ওইসব রমণীর মধ্যে 'উম্মে ক্বিতাল' হযরত আবদুল্লাহর সর্বাধিক প্রত্যাশী ছিলো। কিন্তু সে একদিন ভোর বেলায় ঘটনাচক্রে হযরত আবদুল্লাহ্‌র সামনে পড়লো এবং তাঁকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিলো। তাঁর দিকে তাকাতেও সে অনীহা প্রকাশ করলো। হযরত আবদুল্লাহ্‌ তার এ ব্যতিক্রমধর্মী আচরণ দেখে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন! সে বললো, ''আমি যে 'নূর'-এর প্রতি আসক্ত ছিলাম এবং তা পেতে একান্ত আগ্রহী ছিলাম সেটা আজ থেকে তোমার কপাল হতে অদৃশ্য হয়ে গেছে। (সেটা অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়ে গেছে।) এখন থেকে তোমার প্রতি আমার কোন আকর্ষণ নেই।''

হযরত আমেনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন, যখনই হুযূর-ই আক্‌রামের নূর আমার নিকট স্থানান্তরিত হয়েছে তখন থেকে আমার শরীর থেকে অতি মনোরোম খুশ্‌বু প্রবাহিত হতে থাকে। [খাসাইস-ই কুবরা, সীরাত-ই ইবনে হিশাম ইত্যাদি]

যাঁর প্রশংসা তাওরীতে লিপিবদ্ধ

বর্ণিত আছে যে, সিরিয়ার এক ইহুদি এক শনিবার তাওরীত তিলাওয়াত করছিলো। সে তাওরীতের চার জায়গায় হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর না'ত বা প্রশংসা দেখতে পেলো। ইহুদি সেগুলো কেটে নিয়ে জ্বালিয়ে ফেললো। দ্বিতীয় সপ্তাহে (শনিবার) তাওরীত খুললো। দেখলো আট জায়গায় হুযূর-ই আন্‌ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশংসা লিপিবদ্ধ আছে। ইহুদি এবারও ওইগুলো কেটে নিয়ে জ্বালিয়ে ফেললো। তৃতীয় সপ্তাহে (শনিবার) আবার সে তাওরীত তেলাওয়াত করছিলো। সে সেদিন বার জায়গায় হুযূর-ই আক্‌রামের প্রশংসা দেখতে পেলো। এতে ওই ইহুদি চিন্তায় পড়ে গেলো। আর মনে মনে বলতে লাগলো, ''যদি আমি এভাবে কেটে কেটে জ্বালাতে থাকি তবে তো সমগ্র তাওরীত হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশংসায় পরিবর্তিত হয়ে যাবে। সে তার বন্ধুদেরকে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। তারা তদুত্তরে বললো, ''তিনি তো তিহামাহ্‌ (হেজায ভূমি)'র একজন মিথ্যুক (না'ঊযুবিল্লাহ্‌)। তোমার প্রতি তাঁর নজর না পড়া ও তাকে না দেখাই তোমার জন্য মঙ্গল হবে।''

এ কথা শুনে ইহুদি বললো, ''হযরত মূসার তাওরীতের দোহাই! আমাকে তাঁর

সাক্ষাৎ করতে বাধা দিওনা।'' (আমি অবশ্যই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে যাবো)

একদিন সে সিরিয়া থেকে মদীনা মুনাওয়ারার দিকে রওনা হলো। রাত দিন সফর করে সে মদীনা শরীফে পৌঁছে গেলো। হযরত সালমান ফার্সীর সাথে তার সর্বপ্রথম সাক্ষাৎ হলো। হযরত সালমান খুব সুন্দর পুরুষ ছিলেন। ইহুদি মনে মনে ভাবলো, 'সম্ভবত! ইনিই হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) হবেন।' সুতরাং সে ঘোড়া থেকে নেমে বললো, ''আপনি কি মুহাম্মদ?'' (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) একথা শুনতেই হযরত সালমান কাঁদতে লাগলেন। কেননা, তখন হুযূর-ই আন্‌ওয়ারের ওফাত শরীফের তৃতীয় দিন।

এবার হযরত সালমান ভাবলেন, ''যদি আমি তাকে বলি যে, হুযূর-ই আক্‌রাম ওফাত বরণ করেছেন, তবে সে চলে যাবে। আর যদি বলা হয় যে, তিনি আপন নূরানী জীবদ্দশায় আছেন, তবে তা মিথ্যা হবে।'' হযরত সালমান গভীরভাবে চিন্তা করে বললেন, ''আমার সাথে এসো!'' হযরত সালমান ইহুদিকে নিয়ে মসজিদ-ই নবভী শরীফে গেলেন।

সাহাবা-ই কেরাম তখন মসজিদ শরীফে শোকাহত অবস্থায় উপবিষ্ট ছিলেন। ইহুদি ভাবলো, 'হয়ত এ মসজিদ ভর্তি জমায়েতে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামও আছেন।' সে তার ভাষায় বললো, ''আস্‌সালামু আলায়কা এয়া আবাল ক্বাসিম, আস্‌সালামু আলায়কা এয়া মুহাম্মদ!'' এটা শুনা মাত্র সাহাবা-ই কেরামের মধ্যে কান্নার রোল পড়ে গেলো। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ইহুদির নিকট এসে বললেন, ''তুমি কে? তুমি তো আমাদের হৃদয়ের ক্ষতকে পুনরায় (ঘা মেরে) তাজা করে দিলে? খুব সম্ভব তুমি কোন আগন্তুক হবে। তুমি জানো না, আজ তিনদিন হলো আমাদের আক্বা (মুনিব) আমাদের নিকট থেকে পরপারে তাশরীফ নিয়ে গেছেন। আমরা এখন শোক সাগরে নিমজ্জিত!''

এ কথা শুনে ইহুদিও উচ্চস্বরে কেঁদে ওঠলো। আর বলতে লাগলো, ''আফসোস! আমার সফরতো নিষ্ফল হয়ে গেলো! আহা! আমার মা যদি আমাকে প্রসবই না করতেন, আমি যদি তাওরীত না-ই পড়তাম! আমি যদি তাওরীতে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশংসা না পড়তাম! যদি পড়ে নেয়ার পর হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাক্ষাৎ থেকে বঞ্চিত না হতাম!''

এসব বলার পর ইহুদি বললো, ''আমাকে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফার আপাদমস্তক গড়ন শরীফের বর্ণনা দাও!''

হযরত আলী কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহুল করীম ইহুদির প্রবল আগ্রহ নিরসনে বললেন, ''হুযূর-ই আকরাম মাঝারি গড়নের, যথাযথ দেহ-সৌষ্ঠব সমৃদ্ধ। রং

লালচে ফর্সা, কপাল মুবারক প্রশস্ত। ভ্রু-যুগল মিলিত। চেহারা মুবারক হালকা অর্থাৎ বেশী গোশ্তপূর্ণ ছিলো না। মুখ মুবারক প্রশস্ত দন্দান মুবারকগুলো পরস্পর মিলিত ছিলো না। ঘাড় মুবারক উঁচু, শির মুবারক বড়, বক্ষ শরীফ প্রশস্ত, মাথার চুলগুলো না ছিলো কোঁকড়ানো, না ছিলো একেবারে সোজা, দাড়ি মুবারক ঘন, চক্ষুযুগল কালো ও সুরমা লাগানো, পলকগুলো বড় বড়, স্কন্ধ মাংসপূর্ণ ও এর হাড় শরীফ বড়, বক্ষ মুবারকে নাভী পর্যন্ত লোমের হালকা রেখা ছিলো। স্কন্ধযুগল ও কব্জিযুগলে লোম ছিলো, হাতের তালু দু'টি মাংসপূর্ণ, পায়ের গোড়ালী দু'টি নরম ও হালকা। বরকতময় পদযুগলের তালুর মধ্যভাগে কিছুটা খালি। মুচকি হাসলে দাঁত মুবারক থেকে নূর (আলো)'র ঝলক বের হতো। উভয় স্কন্ধের মধ্যভাগে 'মোহরে নুবূয়ত' শোভা পেতো।''

এ বর্ণনা শুনে ইহুদী বললো, ''আপনি সত্য বলেছেন, হে আলী! হুযূর-ই আকরামের কোন পোশাক দেখাও।'' এটা শুনে হযরত আলী হযরত সালমানকে হযরত ফাতিমার ঘরে পাঠালেন যেন হুযূরের জুব্বা শরীফ নিয়ে আসেন।

হযরত সালমান ফার্সী দরজায় গিয়ে ঘরের ভিতর থেকে খাতূনে জান্নাতের কান্নার আওয়াজ শুনলেন। তিনি বলছিলেন, ''এয়া ফখরাল আম্বিয়া! এয়া যায়নাল আউলিয়া!'' মায়ের সাথে হযরত হাসান এবং হযরত হোসাইনও কাঁদছিলেন। হযরত সালমান দরজার কড়া নাড়লেন। ঘরের ভিতর থেকে আওয়াজ আসলো, 'ইয়াতীমদের দরজায় কে এসেছেন?'' হযরত সালমান বললেন, ''আমি সালমান! হযরত আলী আমাকে হুযূর-ই আন্ওয়ারের জুব্বা শরীফ নিতে পাঠিয়েছেন।'' হযরত ফাতিমা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, ''আব্বা হুযূরের জুব্বা কে পরবে?''

হযরত সালমান সূরতে হাল বর্ণনা করলেন। সুতরাং হযরত ফাতিমা জুব্বা শরীফ বের করে দিলেন। ওই জুব্বা শরীফে সাতটি তালি লাগানো ছিলো। হযরত সালমান জুব্বা নিলেন এবং হযরত আলীর নিকট নিয়ে আসলেন। হযরত আলী জুব্বা শরীফ নিয়ে তাতে চুমু খেলেন, ঘ্রাণ নিলেন। সমস্ত সাহাবীও জুব্বা শরীফে চুমু খেলেন। হযরত আলী এবার জুব্বা শরীফ ইহুদিকে দিলেন। সে জুব্বা শরীফের ঘ্রাণ নিয়ে বললো, ''আহা কতোই পবিত্র ও মনোরম খুশবু!''

ওই ইহুদি এবার হুযূর-ই আকরামের রওযা শরীফে এসে দাঁড়ালো আর আসমানের দিকে মুখ করে বললো, ''হে আমার রব! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি আহাদ, (এক) ও সামাদ (অমুখাপেক্ষী)। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রওযা শরীফে যিনি অবস্থান করছেন তিনি তোমার রসূল ও মাহবূব (বন্ধু)। আমার এ ইসলাম গ্রহণ যদি তোমার নিকট কবূল হয়, তবে এ মুহূর্তেই আমার রূহ কব্জ করে নাও!''

এটা বলতেই সে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলো এবং হুযূরের পবিত্র কদম যুগলে নিজের প্রাণটুকু দিয়ে দিলো। হযরত আলী তাকে গোসল দিলেন। তার জানাযার নামাযের পর জান্নাতুল বক্বীতে দাফন করা হয়েছে। [জামেউল মু'জিযাত]

আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন!

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনাহু থেকে বর্ণিত, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, ''আমরা যখন সওর পর্বতের গুহায় ছিলাম, তখন কাফিরদেরকে আমাদের মাথার উপরে গুহার মুখে উপস্থিত দেখতে পেলাম। আমি হুযূর-ই আকরামের সমীপে আরয করলাম, ''এয়া রাসূলাল্লাহ! কাফিররা যদি তাদের পায়ের দিকে দেখে, তবে তারা তো আমাদেরকে দেখে ফেলবে।'' (এখন কি হবে?)

হুযূর-ই আন্ওয়ার এরশাদ করলেন, ''সিদ্দীক্ব! ভয় করার কোন কারণ নেই। আমরা তো দু'জন আছি। আমাদের সাথে আছেন আমাদের খোদা তা'আলা।'' এটা বলে হুযূর-ই আক্রাম গূহার এক কোণায় আপন হাত মুবারক রাখলেন। তখন গূহা ফেটে গেলো। সামনে দেখা গেলো এক বিরাট সমুদ্র। সেটার তীরে একটা নৌযানও বাঁধা অবস্থায় দেখা গেলো।

তারপর হুযূর-ই আক্রাম এরশাদ করলেন, ''আবূ বকর! কাফিরগণ গুহার মধ্যে প্রবেশ করলে আমরা ওই নৌযানে গিয়ে আরোহন করবো। তুমি চিন্তা করো না!''

হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বেলাদত শরীফের সময় অসংখ্য অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পেয়েছিলো। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপঃ

❍ রসূল-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দাদাজান হযরত আবদুল মুত্তালিব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর) বেলাদত শরীফ-এর রাতে আমি কা'বা গৃহের ভিতর ছিলাম। যখন অর্ধরাত হলো, তখন দেখলাম কা'বা মাক্বাম-ই ইব্রাহীমের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। শেষ পর্যন্ত সাজদা করেছে। সেটা থেকে তাকবীরের আওয়াজ আসতে লাগলো-

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ رَبُّ مُحَمَّدِ نِ الْمُصْطَفٰى الْاٰنَ قَدْ طَهَّدَنِىْ
رَبِّىْ مِنْ اَنْجَاسِ الْاَصْنَامِ وَاَرْجَاسِ الْمُشْرِكِيْنَ

অর্থাৎ : আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বাধিক মহান, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর রব। এখন অবশ্যই আমার রব

আমাকে মূর্তিগুলোর অপবিত্রতা ও মুশরিকদের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করলেন।

আর অদৃশ্য থেকে ঘোষণা এসেছে- কা'বার খোদা তা'আলারই শপথ! কা'বাকে চয়ন করা হয়েছে। শোন! কা'বাকে আল্লাহ তা'আলা ক্বেবলা করেছেন, সেটাকে তাঁর ঘরের মর্যাদার দিয়েছেন। যে সব বোত কা'বার ভিতর ছিলো, সেগুলো ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। সবচেয়ে বড় বোত, যাকে 'হুবল' বলা হতো, মুখের উপর ভর করে পড়ে রয়েছে। আওয়াজ আসলো- ''আমেনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার ঘরে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ভূমিষ্ট হয়েছেন এবং ওই রহমতের বাদল অবতীর্ণ হয়েছে।''(সুবহানাল্লাহ্!)[মাদারিজুন্নুবুয়ত:১ম খণ্ড]

❍ বায়হাক্বী ও ইবনে আসাকির প্রমুখ হযরত হানী মাখযূমী থেকে আপন আপন সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন, যে রাতে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ভূমিষ্ঠ হয়েছেন, ওই রাতে ইরান সম্রাট কিস্‌রার রাজপ্রাসাদে কম্পন শুরু হয়েছিলো এবং তা থেকে চৌদ্দটা কঙ্কর খসে পড়েছিলো। চৌদ্দটা কঙ্কর খসে পড়ার মধ্যে এদিকে ইঙ্গিত ছিলো যে, ইরানের বাদশাহদের মধ্যে তার মাত্র চৌদ্দজন অবশিষ্ট থাকবে। আর তাদের সর্বশেষ ব্যক্তি হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর খিলাফত আমলে মসনদে ছিলো। [মাওয়া-হিব ও মাদারিজুন্নুবূয়ত]

❍ ইরানের অগ্নিকুণ্ড নিভে গিয়েছিলো; অথচ সেটা ইতোপূর্বে এক হাজার বছরের মধ্যে কখনো নিভেনি। এ অগ্নিকুণ্ড ছিলো তেমনি যে, ইরানের লোকেরা সেটার পূজা করতো এবং রাত দিন ইন্ধন দিয়ে জ্বালিয়ে রাখতো। ইরানের কিস্‌রা এ'তে অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্থ হয়ে পড়েছিলো। পুরানা ইরানের শহর 'সা-ওয়াহ'র ঝিল শুষ্ক হয়ে গিয়েছিলো। এসব ঘটনা দেখে কিস্‌রা যদিও বাহ্যিকভাবে নিজেকে স্বাভাবিক দেখিয়ে যাচ্ছিলো, কিন্তু মনে মনে ভয়ে কম্পমান ছিলো। তদুপরি ইরানের প্রধান বিচারপতি মূবিদান স্বপ্নে দেখিছিলো-'দ্রুতগামী ও অবাধ্য উট আরবী ঘোড়াগুলোকে টানছিলো আর সেগুলো দাজলা নদী পার হয়ে এ পারের শহরগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছে।' মূবিদান এর ব্যাখ্যা এটা করলো যে, 'আরবে কোন ঘটনা ঘটবে; যার কারণে আরব রাজ্য পরাজিত ও বিপর্যস্ত হয়ে যাবে।' কিন্তু কিস্‌রা (ইরানের শাহ্) এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা ও ওইসব ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য বিভিন্ন গণকের নিকট লোক পাঠালো। শেষ পর্যন্ত লোকেরা সবচেয়ে বড় গণক ও তাদের মতে অদৃশ্য বক্তা সাধক 'সায়ত্বাহ'র খবর পেলো। কিসরার লোকেরা তার নিকট আসলো এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা এবং ওইসব ঘটনার রহস্যাদি জানতে চাইলো। সে বললো, ''যখন ক্বোরআনের তিলাওয়াত প্রকাশ পাবে এবং 'আসা'

(লাঠি) ব্যবহারকারী (অর্থাৎ মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আবির্ভূত হবেন, তখন 'সামাওয়া' নদী জারী হয়ে যাবে, 'সা-ওয়া' শহরের ঝিলগুলো শুষ্ক হয়ে যাবে, ইরানের অগ্নিখুণ্ড নিভে যাবে আর এ 'সায়ত্বাহ্'ও দুনিয়ায় বেঁচে থাকবে না।''

সায়ত্বাহ্ এ কথা শেষ করতেই লুটিয়ে পড়লো ও মরে গেলো। আল্লাহ তা'আলা পরবর্তীতে ইরানের আখেরী বাদশাহ্ ইয়ায্‌দাজার্দের রাজ্য (ইরান)-কে হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্বক্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র হাতে বিজিত করেন। ইয়ায্‌দাজার্দ ইসলামী সৈন্যবাহিনীর সামনে থেকে পালিয়ে গিয়েছিলো। এরপর সে কয়েকবার সৈন্য যোগাড় করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে হামলা করেছিলো। কিন্তু প্রত্যেক বারই পরাজিত হয়েছিলো। অবশেষে খোরাসানের দিকে পালিয়ে গিয়েছিলো। হযরত ওসমান ইবনে আফ্‌ফান রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খিলাফত আমলে তাকে ৩১ হিজরিতে কেউ মেরে ফেলেছিলো।

[মাদারিজ ও আর-রাওয়া-ইহ্‌যাকিয়্যাহ্ ফী মাওলিদে খায়রিল বারিয়্যাহ্]

❍ রসূল-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বেলাদত শরীফের সময়কার অলৌকিক নিদর্শনগুলোর মধ্যে এও ছিলো যে, শয়তানতাদেরকে আসমান থেকে আগুনের উল্কা দ্বারা প্রহার করতে করতে নামিয়ে দেয়া হয়েছিলো। অবশ্য উল্কা দ্বারা মারা ও তাড়ানোর সূচনা হুযূর করীমের নুবূয়ত ঘোষণার সময় থেকে হয়ে ছিলো বলেও প্রসিদ্ধি আছে।

[প্রাগুক্ত]

❍ রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বেলাদত শরীফের সময় থেকে, ইবলিসকে আসমানের খবরাদি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিলো। কারণ, মাঝখানে অন্তরাল ও ব্যবধান তৈরি করা হয়েছিলো। তখন সে এক খুব ভয়ানক চিৎকার করেছিলো।

উল্লেখ্য, শয়তান (ইবলিস) অভিশপ্ত হবার সময়, জান্নাত থেকে বহিস্কৃত হবার সময়, হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র জন্মের শুভ মুহূর্তে এবং সূরা ফাতিহা নাযিল হবার সময় জোরে শোরে চিৎকার করেছিলো। এটা হাফিয ইরাকী 'আল-মাওরিদুল হানা'য় বাক্বা ইবনে মাখলাদ থেকে বর্ণনা করেছেন। [প্রাগুক্ত]

❍ ক্বোরাঈশের একটি গোত্রের একটা বোত (প্রতিমা) ছিলো। প্রত্যেক বছরের সমাপ্তিকালে তারা ওই বোতের চতুর্পাশে সমবেত হতো, 'ঈদ' (খুশী) উদ্‌যাপন করতো এবং সেটা সামনে 'ই'তিকাফরত থাকতো। একরাতে তারা দেখলো- ওই বোত্ সেটার জায়গা থেকে সরে মুখের উপর ভর করে মাটিতে পড়ে আছে। তারা সেটাকে তুলে এনে দূরবর্তী জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিলো।

সেটার আবার- লুটিয়ে পড়লো। তারা পুনরায় সেটাকে সোজা করলো। এভাবে তিনবার করলো। তৃতীয়বারও সেটা মুখের উপর ভয় করে লুটিয়ে পড়লো। এটা দেখে তারা অত্যন্ত পেরেশান হয়ে পড়লো। নিরূপায় হয়ে তারা সেটাকে সেভাবেই ফেলে রাখলো। কিন্তু তারা সেটার পেট থেকে নিম্নলিখিত পংক্তিগুলো পড়ার আওয়াজ শুনতে পেলো-

تُرُوٰی بِمَوْلُوْدٍ اَضَاءَ تْ بِنُوْرِہ
جَمِیْعُ فِجَاجِ الْاَرْضِ بِالشَّرْقِ وَالْغَرْبِ
وَخَدَّتْ لَہُ الْاَوْثَانُ طُرًّا وَاُعِدَّتْ
قُلُوْبُ مُلُوْکِ الْاَرْضِ جَمْعًا مِنَ الرُّعْبِ

অর্থাৎ: পৃথিবীতে এমন এক ব্যক্তিত্বের জন্ম হয়েছে যাঁর বরকতে গোটা দুনিয়া সবুজ-সজীব হয়ে যাবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অর্থাৎ গোটা পৃথিবীপৃষ্ঠ তাঁর নূরে আলোকিত হয়ে গেছে। বোত্-প্রতিমাগুলো তাঁরই সামনে মুখ থুবড়ে পড়েছে। গোটা দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ্গণের হৃদয়গুলো ভয়ে প্রকম্পিত হয়ে গেছে। [মাদারিজ]

আল্লাহ পাক আমাদেরকে তাঁর হাবীবের পবিত্র মীলাদের খুশী উদ্যাপন ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের তাওফীক্ব দিন! আমিন।

হযরত হালীমার সৌভাগ্য!

নূর নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বেলাদত শরীফ হলো। এখন প্রশ্ন হলো এ অমূল্য রত্নরূপ শিশুকে দুগ্ধ কে পান করাবে। মক্কা মু'আয্যামার তদানীন্তন নিয়মানুসারে অভিজাত পরিবারের শিশু সন্তানদের দুগ্ধপান করানোর জন্য ধাত্রী নিয়োগ করা হতো। সুতরাং গ্রামাঞ্চল থেকে বহু ধাত্রী আসলো আর এ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সমাধানের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলো। কিন্তু হযরত আমেনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বললেন -এর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবেন খাজা আবদুল মুত্তালিব। এদিকে এক রাতে হযরত আমেনা অদৃশ্য থেকে আহ্বান শুনলেন- ''হে পূতঃ পবিত্র আমেনা! মনযোগ দিয়ে শোনো! শিশু মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে দুগ্ধ পান করাবেন ধাত্রী বনূ সা'দের এক ভাগ্যবতী মহিলা, যার নাম হালীমা''

এরপর থেকে যেই ধাত্রী আসতো সাইয়্যেদাহ্ আমেনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা তার নাম ও গোত্রের নাম জিজ্ঞেস করতেন।

বস্তুত হযরত হালীমার অদৃষ্টে সৃষ্টিকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে দুগ্ধ পান করানোর সৌভাগ্য লিপিবদ্ধ হয়েছিলো। সুতরাং অবস্থা ও পরিস্থিতি তাঁকে মক্কা মু'আয্যামাহ্ আসতে বাধ্য করলো। হযরত হালিমার গোত্র ওই সময় অসহনীয় দুর্ভিক্ষগ্রস্ত ছিলো। এমন সংকটাপন্ন সময়ে হযরত হালীমার পরিবার সর্বাধিক জর্জরিত ছিলো। তিনি নিজেই অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন- আমি রিক্ত হস্ত হয়ে পড়েছিলাম। মরুদ্যানের গাছের পাতা ছিঁড়ে এনে রান্না করে খেয়ে দিনাতিপাত করতাম। আর বেশীরভাগ সময় আমার ঘরে অনাহারের পালা পড়তো। একদিন আমি আমার সঙ্গীনীদের সাথে বের হলাম। ক্ষুধা নিবারনের জন্য গাছের পাতা ছিঁড়ে খেলাম ও পানি পান করলাম। হঠাৎ উপত্যকা থেকে একজনের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। কিন্তু কাউকে দেখলাম না। তিনি আমাকে মক্কা মু'কার্রামাহ্ যাবার জন্য উৎসাহ দিয়ে বলেন- ''মক্কায় 'মুহাম্মদ' নামের এক শিশু জন্মগ্রহণ করেছেন; তাঁকে দুগ্ধ পান করাও!''

আমি এটা শুনে ঘরের জন্য পাতা সংগ্রহের কথা ভুলে গেলাম। ভীত হয়ে দৌড়ে ঘরে ফিরে এলাম। আমার স্বামী হারিস বললেন, '' হালিমা, খালি হাতে ফিরে এলে?'' আমি হারিসকে অদৃশ্য থেকে শোনা আহ্বানের ঘটনা বললাম। তিনি বললেন, '' হালীমা! চলো মক্কায় যাই। হয়তো ওই শিশুর দুগ্ধপান করানোর সৌভাগ্য আমাদের ভাগ্যে লিপিবদ্ধ হয়েছে।''

আমি তখন গর্ভবতী ছিলাম। অল্প কয়েক দিনের মধ্যে আমার সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো। আমরা তার নাম রাখলাম 'দ্বামরাহ'। তখনকার সময় আমি অনাহারে

অর্ধাহারে কাতর ছিলাম। দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম শারীরিকভাবেও। একদিন আমাকে তন্দ্রা পেয়ে বসলো। দেখলাম এক অদৃশ্য শক্তি আমাকে তুলে নিয়ে এক নহরের তীরে বসিয়ে দিলো। আর বললো, "হালীমা! এ পানিতে গোসল করে নাও।" আমি গোসল করলাম। তখন পুনরায় আহ্বান আসলো, "এখন নহর থেকে পানি পান করো।" আমিও প্রাণভরে পানি পান করলাম। পানিও ছিলো দুধের চেয়ে বেশী সাদা, মধুর চেয়েও মিষ্ট । নহর থেকে মুশ্‌ক আম্বরের খুশ্‌বু প্রবাহিত হচ্ছিল। অতঃপর আওয়াজ আসলো:

"হালীমা! তুমি ধন্য। রসূল-ই আরবীকে দুগ্ধ পান করানো তোমার ভাগ্যে লিপিবদ্ধ হয়েছে। সহসা মক্কা যাও! তুমি আপন গোত্রে সর্বাধিক সচ্ছল ও সৌভাগ্যবতী হতে যাচ্ছো!"

তারঃপর এক অদৃশ্য শক্তি আমার বক্ষে মৃদু আঘাত করে বললো, " আল্লাহ্ তোমাকে দুগ্ধ ও প্রচূর কল্যাণ দান করুন!"

হাঠাৎ আমার তন্দ্রা ছুটে গেলো। দেখলাম -না আছে নহর, না ওই অবস্থা। আমি আপন কামরায়ই শয়নরত আছি। অর্থাৎ উক্ত ঘটনা আমার স্বপ্নেই ঘটেছিলো। তবে, আমার রবের মহত্বেরই শপথ! আমার মনে হচ্ছিলো যেন আমার বক্ষ থেকে এক্ষুনি দুধের ফোয়ারা প্রবাহিত হবে। আমার দুর্বলতা চলে গেলো। চেহারায় সজীবতা আসলো। আমার সঙ্গীনীদের মধ্যে আমাকে সর্বাধিক স্বাস্থ্যবতী দেখাচ্ছিলো। সঙ্গীনীরা আমাকে বলতে লাগলো-

"হালীমা! আমরা তোমাকে দেখছি-তুমি অনাহার-অর্ধাহারে শীর্ণকায় হয়ে গিয়েছিলে, তোমার চেহারা হলদে হয়ে গিয়েছিলো। হঠাৎ তুমি এমন স্বাস্থ্যবতী কিভাবে হয়ে গেলে?"

আমি হেসে কথা এড়িয়ে গেলাম। বাস্তব অবস্থার কিছুই বললাম না। একদিন আমি আমার স্বামী হারিসকে বললাম,"আমাকে মক্কায় নিয়ে যাও।" আমাদের নিকট একটি শীর্ণকায় উট্‌নী ছিলো। হারিস বললেন, "তুমি কি উট্‌নীকে এমন কষ্ট দিতে চাচ্ছো, যা সে সহ্য করতে পারবে না?" আমি বললাম, "আল্লাহর ইচ্ছা হলে আমরা উঠে-পড়ে কোন মতে মক্কায় গিয়ে পৌঁছে যাবো।"

হারিস উট্‌নী নিয়ে আসলেন। সেটা এতই দুর্বল ছিলো যে, আমরা সেটার হাড়গুলো গুন্‌তে পারতাম। হারিস আমাকে উট্‌নীর পিঠে বসালেন। আমি আমাদের শিশু দ্বামরাহ্‌কে কোলে নিলাম। হারিস লাগাম ধরলেন। উট্‌নী বেচারী কচ্ছপ গতিতে চলতে লাগলো। মক্কার রাস্তায় উঠতেই উট্‌নী থেমে গেলো। ক্লান্তির নি:শ্বাস ছাড়ছিলো। হারিস বললেন, "চলো ফিরে যাই। মক্কায় পৌঁছানো তার সাধ্যের বাইরে।" আমি বললাম, "আল্লাহর নাম নিয়ে চলতে থাকুন! দেরীতে হলেও শেষ পর্যন্ত মক্কায় পৌঁছে যাবো।"

কিছুদূর অগ্রসর হতেই উপত্যকা থেকে এক ব্যক্তি আত্মপ্রকাশ করলো। তাঁর

হাতে ছিলো এক চমকদার ছড়ি। তিনি উট্‌নীর নিকটে এলেন আর ছড়ি দিয়ে ইঙ্গিত করে বললেন, "চলো, দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলো সত্যনবী ও আল-আমীনের খিদ্‌মতে।"তারপর লোকটি আমার উদ্দেশে বললেন-

"হালীমা! তুমি ধন্য। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে সাইয়্যেদুল মুরসালীনকে দুগ্ধ পান করানোর জন্য চয়ন করেছেন।"

লোকটির কথা শেষ হতেই উট্‌নীটা অভিজাত সুঠাম ঘোড়ার মতো দৌড়াঁতে লাগলো। সবার আগে হেরম শরীফে পৌঁছে গেলো। মক্কা নগরীকে দেখে মনে হলো- দুল্‌হানের মতো সজ্জিত। মক্কার চতুর্পাশে রঙবেরঙের ফুল ফুটেছে। দেখলাম- আমি ছাড়া অন্যান্য ধাত্রীরাও হেরমের পাশে অপেক্ষমান। প্রত্যেকের দারুন আগ্রহ ছিলো ওই বরকতময় শিশু পেয়ে যাবেন।

হযরত আমিনা যখন শুনলেন যে, বনী সা'দের ধাত্রীরাও মক্কায় এসেছে, তখন তিনি খাজা আব্দুল মুত্তালিবকে বললেন, "হে আমার সদরার! আপনি ধাত্রীদের নিকট যান এবং আপনার পৌত্রের জন্য ধাত্রী নিয়ে আসুন!" আবদুল মুত্তালিব একথা শুনামাত্র ঘর থেকে বের হলেন। তখন অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসলো-

"আমিনা বিনতে ওয়াহবের অনন্য মুক্তা (শিশু) সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁকে দুগ্ধ পান করানোর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা হালীমাকেই নির্বাচন করে রেখেছেন। আমেনা! তুমি আপন শিশু-সন্তানকে হালীমা ব্যতীত কারো হাতে অর্পণ করবে না।" অল্পক্ষণ পর থেকে ধাত্রীগণ আসতে আরম্ভ করলো। সাইয়্যেদাহ্ আমেনা প্রত্যেকের নাম ও গোত্রের নাম জিজ্ঞাসা করছিলেন। যখন তিনি হযরত হালীমার নাম শুনলেন, তখন অতি নম্র সুরে বললেন- "বোন, আমার সন্তান ইয়াতীম"

উল্লেখ্য, 'ইয়াতীম শব্দটি শুনতেই ধাত্রীগণ চলে যেতো। খাজা আবদুল মুত্তালিবকে জিজ্ঞাসা করতো- এটা আপনার সন্তান কিনা। তিনি বলতেন, "আমার নাতি; তবে সর্বাধিক প্রিয় সন্তান! তিনি মায়ের গর্ভে থাকতেই তাঁর পিতা ইনতিকাল করেছেন।" তৎকালীন নিয়মানুসারে ধাত্রীরা দুগ্ধপান করে পারিশ্রমিক ও উপঢৌকন ইত্যাদি নিতো শিশুর পিতা থেকে। তিনি তো শিশুর দাদা! সুতরাং তারা একে একে সবাই চলে গেলো। কিন্তু হযরত হালীমা বললেন-

> "আমি মক্কায় প্রবেশ করতেই জিজ্ঞাসা করলাম- হেরম শরীফের খাদিম কে? জবাব পেলাম- "আব্দুল মুত্তালিব।" সুতরাং আমি খাজা আব্দুল মুত্তালিবের নিকট এলাম এবং সালাম-সম্ভাষণ আরয করে বললাম-
>
> ওহে মক্কার পরম সম্মানিত সরদার! দান ও বদান্যতার পায়কর! আমি বনূ সা'দের এক দুর্ভিক্ষ ও দৈন্যদশায় জর্জরিত মহিলা!। আমাদের পশু-পাখীরা পর্যন্ত দুর্ভিক্ষের শিকার হয়েছে। এ বছরের অবস্থাতো

আরো নাজুক। আমি শুনেছি আপনার পৌত্রের জন্য একজন ধাত্রীর প্রয়োজন। আমি আমার সেবা উৎসর্গ করার জন্য হাযির। আশা করি এ সুবাদে আমাদের অবস্থায় পরিবর্তন আসবে!''

খাজা আবদুল মুত্তালিব বললেন, ''তোমার নাম কি? আমি বললাম, ''হালীমা! বনূ সা'দ আমার গোত্র।'' খাজা আবদুল মুত্তালিব বললেন, ''হালীমা!'' আমাদের ঘরে তো একটি শিশু-সন্তান আছে। শিশুটি এতই অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত যে, আজ পর্যন্ত কোন মা তার মতো এতো সুন্দর শিশু জন্ম দেয়নি। তবে হে হালীমা! তার পিতা ইন্তিকাল করেছে। সুতরাং শিশুটা ইয়াতীম। যদি তুমি তাকে দুগ্ধপান করাতে রাজি হও, তবে 'বিসমিল্লাহ্' করে নিয়ে যাও!''

আমি বললাম, ''হে আমার সরদার! আমার স্বামীও আমার সাথে মক্কায় এসেছেন। তাঁর অনুমতি ছাড়া আমি এ মুহূর্তে আপনাকে কিছু বলতে পারছি না। আপনি অনুমতি দিলে আমি তাঁর সাথে পরামর্শ করে নিতে পারি। যদি তিনি ইয়াতীম শিশুকে নিতে সম্মতি দেন, তবে সবিনয় হাযির হয়ে যাবো।''

তিনি বললেন, ''ঠিক আছে। যাও, পরামর্শ করে সহসা বলে দিও!'' আমি খাজা আব্দুল মুত্তালিবের ঘর থেকে সোজা হারিসের নিকট এলাম। তিনি বললেন, ''কী খবর নিয়ে এলে?'' আমি বললাম, ''খাজা আবদুল মুত্তালিবের ঘরে একটি অতি সুন্দর শিশু সন্তান আছে। কিন্তু শিশুটি ইয়াতীম। আমি আপনার ভয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কিছুই বলিনি। এখন আপনি বলুন, আপনার মতামত কি?'' তিনি বললেন, ''হালীমা! তুমি চিন্তা করো, আমরা হলাম দুর্ভিক্ষের নিষ্পেষণগ্রস্ত লোক। ইয়াতীম শিশুকে নিয়ে আমরা কি করবো?'' আমি বললাম, ''তাঁর দাদা তো আমাদেরকে প্রচুর কল্যাণের ওয়াদা দিয়েছেন।'' হারিস বললেন, ''ধাত্রীরাতো সব সময় শিশুর পিতার নিকট থেকে পুরস্কার-পারিশ্রমিক নিয়ে থাকে, দাদার নিকট থেকে নয়। কাজেই, ইয়াতীম শিশুর প্রতিপালনের বিনিময়ে পুরস্কার-উপঢৌকনের আশা করার অবকাশ কোথায়? বাদ দাও এর চিন্তা-ভাবনা।'' স্বামীর মতামত শুনে আমার মনে খুব দুঃখ পেলাম। কিন্তু ওই দুঃখ মনের মধ্যে চেপে রাখলাম।

পরদিন আমার সফরসঙ্গী ধাত্রীরা শিশু-সন্তান সংগ্রহ করে ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। তাদেরকে দেখে আমার চোখে পানি এসে গেলো। আমি কাঁদছিলাম। এটা দেখে হারিস বললেন, ''হালীমা, কাঁদছো কেন?'' আমি বললাম, ''কাঁদবোনা কেন? বনূ সা'দের সব ধাত্রী শিশু সন্তান নিয়ে চলে যাচ্ছে আমার কোল এখনো খালি?'' হারিস বললেন, ''তুমি কি চাচ্ছো?'' আমি বললাম, ''ওই ইয়াতীম শিশুকেই আমি চাই। হতে পারে তাঁর বরকতে আল্লাহ আমাদের দিন বদলে দেবেন।'' হারিস বললেন, ''তাহলে যাও! তাকে নিয়ে এসো!'' এটা শুনে আমার খুশীর সীমা রইলো না।

ওইদিকে খাজা আবদুল মুত্তালিব আমার তালাশে ঘর থেকে বের হলেন। এদিকে আমিও তাঁর ঘরের দিকে যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হয়ে গেলো। আমি আরয করলাম, ''আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'' তিনি বললেন, ''হালিমা! তোমার নিকটই তো যাচ্ছিলাম।'' আমি আরয করলাম, ''হে আরবের সরদার! আমি আপনার দরবারে যাচ্ছি।'' আর খুশী ভরা অন্তর নিয়ে হাসিমুখে আরয করলাম, ওই অনন্য মুক্তাকে দুগ্ধ পান করানোর জন্য স্বামীর অনুমতি নিয়ে এসেছি।'' একথা শুনতেই তিনি আমাকে সাথে নিয়ে ঘরে এলেন। আমি সাইয়্যেদাহ্ আমেনাকে সালাম আরয করলাম। তিনি অতি আনন্দ চিত্তে আমাকে সমাদর করলেন এবং বললেন, ''আল্লাহরই শপথ! আমার সন্তানকে দুগ্ধ পান করানোর উপযুক্ত তুমিই ছিলে।'' আর হাত ধরে ওই কামরায় নিয়ে গেলেন, যেখানে সাইয়্যেদী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঘুমাচ্ছিলেন।

দুগ্ধপান

হযরত হালীমা বলেন, ''যখন আমি হুযূরের কামরায় প্রবেশ করলাম, তখন তিনি আলোয় ঝলমল করছিলেন।'' আমি সাইয়্যেদাহ্ আমিনাকে বললাম, ''সাইয়্যেদাহ্! মনে হচ্ছে আপনার সন্তানের চতুর্পাশে তারকারাজি ঝলমল করছে।'' তিনি বললেন, ''এ আলো তো আমার উজ্জ্বল শিশুর প্রিয় চেহারা থেকে বের হচ্ছে।'' তখন তিনি পিঠ মুবারকের উপর ভর করে শয়নরত ছিলেন। আঙ্গুল মুবারক চুষছিলেন। গভীর নিদ্রারত ছিলেন। আমি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়লাম। তখন সাইয়্যেদাহ্ আমিনা বললেন, ''আমি তো আগে থেকেই জানতাম যে, তাকে দুগ্ধপান করাবেন 'বনূ সা'দের ভাগ্যবতী মহিলা হালিমাই।'' আমি আরয করলাম, ''সাইয়্যেদাহ্! শিশু মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সৌন্দর্য দেখতেই আমার আপাদমস্তক তাঁর স্নেহ-মমতায় ভরে গেছে।'' এটা বলে আমি তাঁর পবিত্র শিরের প্রান্তে এসে দাঁড়ালাম। আমি তাঁর দিকে দু'হাত প্রসারিত করলাম- ইচ্ছা ছিলো তাঁকে তুলে বুকের সাথে লাগিয়ে নেবো। হঠাৎ তিনি বরকতময় চক্ষুযুগল খুললেন। আর আমাকে দেখে মুচকি হাসছিলেন। তাঁর হাসির সাথে সাথে কামরায় আলোর চাদর-প্রসারিত হয়ে গেলো। মনে হলো আলোর বিম্বগুলো আসমান পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছিলো। আমি তাঁকে কোলে নিয়ে স্নেহভরে চুমু দিলাম। আর ডান স্তন তাঁর মুখে দিলাম। তিনি দুধ পান করলেন। এর পর বাম স্তন তাঁর মুখে দিতে চাইলাম; কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেন নি। তিনি যেন এ বাম স্তন তাঁর দুগ্ধপায়ী ভাই দ্বামরার জন্য রেখে দিয়েছেন। পরবর্তীতেও দেখা গেছে যে, তিনি সব সময় ডান স্তন থেকে দুধ পান করতেন, বাম স্তন তাঁর দুধভাই দ্বামরার জন্য রেখে দিতেন। সুব্হানাল্লাহ!! এখন থেকেই ইন্সাফ কায়েম করছিলেন বিশ্বকুল

সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবার বিদায়ের পালা! হযরত হালীমা বললেন, ''হুযূরকে নিয়ে যখন আমি উঠলাম, তখন আমার আপাদমস্তক খুশীতে ভরে গেলো। আমি নিজেকে সর্বাপেক্ষা বেশী ভাগ্যবতী বলে অনুভব করছিলাম। ''দরজা দিয়ে বের হবার সময় হযরত খাজা আবদুল মুত্তালিব বললেন, ''হালিমা! থামো, কিছু পাথেয় নিয়ে যাও!'' আমি আরয করলাম, ''এখন আমার আর কোন পাথেয়ের প্রয়োজন হবে না। আমার জন্য 'মুহাম্মদ' (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-ই যথেষ্ট।'' তবুও তিনি আমাকে পাথেয় দিলেন। ঘর থেকে বের হবার সময় সাইয়্যেদাহ্ আমেনা আপন সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, চুমু খেলেন, খুব কান্নাকাটি করলেন। মাতা ও পুত্রের এ বিদায়-বিষাদ অতি হৃদয়-বিদারকই ছিলো। তখন মা আমিনা বললেন, ''হে আমার অনন্য রত্ন! খোদা তোমার রক্ষাকারী ও সাহায্যকারী হোন!'' তখন আমিও অশ্রু সংবরণ করতে পারিনি।

হযরত হালীমা বলেন, ''হুযূরকে নিয়ে আমি যখন মক্কা থেকে রওনা হলাম, তখন আমার আশপাশে সবকিছু থেকে আওয়াজ আসতে লাগলো-

''হালীমা তুমি ধন্য! মুহাম্মদ-ই আরবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দুগ্ধপান করানো ধন্য হোক!''

অপেক্ষমান স্বামীর নিকট পৌঁছে দেখলাম সা'দ গোত্রের অন্যান্য ধাত্রীরাও আমার জন্য অপেক্ষা করছে। তারা আমাকে দেখে বলতে লাগলো, ''হালীমা তোমার চতুর্পাশে আলোর ছড়াছড়ি কেন?'' আমি হুযূরের চেহারা মুবারক থেকে কাপড় সরিয়ে বললাম, ''এ আলোর ঝলক এ প্রিয় চেহারা থেকেই।'' সা'দ গোত্রের ধাত্রীগণ হুযূরের চেহারায় নূরের বারিধারা দেখে বললো-

> ''এ প্রিয় চেহারা সৌন্দর্যে অদ্বিতীয়। এমন শিশু সন্তান আমরা আজ পর্যন্ত দেখিনি। এ প্রিয় চেহারা এরই উপযোগী যে, প্রতিটি মুখ থেকে তাঁর গুণগান উচ্চারিত হতে থাকুক!''

ওই রাত আমরা অতি আনন্দে অতিবাহিত করলাম। ভোর হতেই আমরা উঠের পিঠে হাওদা স্থাপন করলাম। সফরের জন্য প্রস্তুতি নিলাম। আমি উটনীর পিঠে আরোহণ করলাম। ডান কোলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ও বাম কোলে দ্বামরাকে নিলাম। কাফেলা রওনা হলো। কিন্তু আমরাই সবার আগে গন্তব্যে পৌঁছে গেলাম।

ধাত্রীরা বলতে লাগলো, ''হালীমা! তোমার উটনী তো এতো দুর্বল ছিলো যে, চলতেও অক্ষম ছিলো; কিন্তু এখন মোটাসোটা ও দ্রুতগামী হয়ে গেছে।'' তখন আল্লাহ তা'আলা উটনীকে কথা বলার শক্তি দিলেন। সেটা সুন্দর ও অলংকার সমৃদ্ধ ভাষায় বললো, ''হে বনূ সা'দের মহিলারা! এতে আশ্চর্যের কি আছে? একটু দেখো, আমার পিঠে 'সাইয়্যেদুল আওয়ালীন ওয়াল আখেরীন' (পূর্ব ও পরবর্তীদের সরদার) আরোহণ করেছেন। তাঁরই বরকতে আমার দুর্বলতাকে

শক্তিতে এবং আমার ধীরগতিকে বিদ্যুৎ গতিতে পরিবর্তিত করা হয়েছে।'' ধাত্রীরাতো উটনীর গতি দেখে ইতোপূর্বেও হতভম্ব ছিলো, এবার উটনীর মুখের কথা শুনে আরো হতভম্ব হয়ে গেলো। আমি বনী সা'দের সব সফরসঙ্গীকে পেছনে বহু দূরে রেখে দ্রুত অতিক্রম করে গেলাম।

হযরত হালীমা বলেন, আমি আমাদের গোত্র বনূ সা'দে পৌঁছে দেখলাম সেখানে এক পাদ্রী হাযির। সে বলতে লাগলো। ''শেষ যমানায় 'মুহাম্মদ' নামে এক ব্যক্তি পয়দা হবেন। তিনি মূর্তিগুলো ভেঙ্গে সেগুলোকে লাঞ্ছিত করবেন।'' ইত্যবসরে আমি সেখানে পৌঁছে গেছি। আমাকে দেখতেই পাদ্রী বলে উঠলো, ''ওই দেখো! হালীমা তাঁকে নিয়ে এসেছেন। দেখো, তার কোলে ওই শিশু রয়েছেন, যাঁর কথা আমি বলছিলাম।''

পাদ্রী খ্রিষ্টান ও মুশরিকদের আগে থেকে হুযূর করীমের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে রেখেছিলো; আজ সে ওই শত্রুতার আগুনে তেল ঢেলে দিলো। আর বললো, ''আজই সুযোগ। এ সুযোগ হাত ছাড়া করলে, শিশু বড় হলে আর কিছুই করা যাবে না। তিনি বোত্-মূর্তি তো ভাঙ্গবেনই, উপরন্তু তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করবেন।'' একথা শুনতেই মুশরিক ও খ্রিষ্টানগণ তলোয়ার উঁচিয়ে আমার দিকে আসছিলো। আমি হুযূরকে আমার বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে বললাম, ''হায়, আমার চোখের মণি মুহাম্মদ!'' আমি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লাম। ইত্যবসরে হঠাৎ আসমান থেকে বিদ্যুৎ নেমে আসলো এবং ওইসব দুশমনকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিলো। আল্হামদুলিল্লাহ!

হযরত হালীমা আরো বলেন, আমি বনূ সা'দে আসার পর বরকত নাযিল হতে লাগলো। দুর্ভিক্ষ দূরীভূত হয়ে গেলো। চারণভূমিগুলো ফলে-ফসলে সবুজ-সজীব হয়ে গেলো। খেজুরের বাগানগুলোতে ফল আসতে লাগলো। দেখতে দেখতে বনূ সা'দ গোত্রে সচ্ছলতা এসে গেলো। গোত্রের লোকেরা জেনে গেলো যে, এসব বরকতের উৎস হচ্ছে- ওই পবিত্র শিশু, যিনি হালীমার কোলে আছেন। গোত্রের লোকেরা তাঁকে এক নযর দেখার জন্য দলে দলে আসতে লাগলো। নারী-পুরুষ-ছোট ছেলেমেয়েরা সবাই আসলো। কেউ হুযূরের কপাল শরীফে চুমু দিলো, কেউ হাতে চুমু খেলো। কেউ কেউ তাঁর নাদুশ-নুদুশ প্রিয় কদমে চুম্বন করলো। আল্লাহ তা'আলা তাদের সবার অন্তরে হুযূরের ভালবাসা ঢেলে দিলেন।

হযরত হালীমা আরো বলেন- দু'বছর হয়েছে, তিনি আমার নিকট এসেছেন। খুব দ্রুত তিনি বেড়ে উঠলেন। আমাকে কখনো তাঁর কাপড় ধুতে হয়নি। তিনি সবসময় পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতেন। আমি কখনো তাঁকে পায়খানা-প্রস্রাব করতে দেখিনি। শৈশব থেকেই তিনি এতোই লজ্জাশীল ছিলেন যে, অতি গোপনে পায়খানা-প্রস্রাব করতেন। এ কাজ সমাধার পর সেখানে

পায়খানা-প্রস্রাবের কোন চিহ্ন পর্যন্ত দেখা যেতো না; বরং সেখান থেকে খুশ্‌বু প্রবাহিত হতো।

তিনি অন্য ছেলে-মেয়েদের খেলাধুলার সময় তাদেরকে দেখতেন; কিন্তু তাদের সাথে সামিল হতেন না। তিনি যখন থেকে কথা বলতে আরম্ভ করেছেন, তখন সর্বপ্রথম এ বাক্য মুখ-মুবারকে উচ্চারণ করেছিলেন-

اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَخْرَجَنِىْ مِنْ بَيْتٍ طَاهِرٍ ـ

(আল্লাহ সর্বাপেক্ষা মহান। সমস্ত প্রশংসা ওই আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে পবিত্র ঘর থেকে প্রকাশ করেছেন)।

মু'জিযা (ইরহাস)

হযরত হালীমা বলেন, একদিন তিনি আমাকে বললেন, ''আম্মাজান! ভোর থেকে দুপুর হয়ে গেলো। কিন্তু আমার ভাই দ্বামরাহকে দেখছি না কেন? সে কোথায়?'' আমি বললাম, ''পুত্র! আপনার বরকতে আল্লাহ আমাদেরকে যে উটগুলো দিয়েছেন, দ্বামরাহ্ সেগুলো চরাতে গেছে।'' হুযূর বললেন, ''আমি তো ঠাণ্ডা ছাউনির নিচে বসে ঠাণ্ডা পানি পান করছি, আর আমার ভাই দ্বামরাহ্ মরুভূমির উত্তপ্ত রোদে উট চরাতে থাকে! আম্মা, এ কেমন ইন্‌সাফের কথা!'' আমি বললাম, ''পুত্র! দ্বারমাহ্ তো মরুভূমি ও এ পাথুরে ভূ-খণ্ডেই লালিত; আর আপনি হলেন এক উঁচু বংশের চক্ষু ও প্রদীপ। দ্বিতীয়ত আমি আশঙ্কা করছি- আপনার উপর কোন হিংসুকের কু-দৃষ্টি পড়ে যায় কিনা। কোন বিরোধী ও দুশ্‌মন আপনার ক্ষতি করে কিনা।'' বললেন, ''যার রক্ষাণাবেক্ষণকারী আল্লাহ, কোন শক্তি তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আম্মা, আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন!'' আমি বললাম, ''আপনার ইচ্ছা কি জানতে পারি?'' তিনি বললেন, ''আমি দ্বামরাহ্‌র সাথে যেতে চাই, কষ্ট ও আরামে তার সাথে থাকতে চাই।'' আমি তাঁর ইচ্ছার বিরোধিতা করতে পারলাম না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে যেতে অনুমতি দিলাম।

পরদিন সকালে আমি তাঁকে গোসল করালাম ও সুন্দর পোষাক পরিধান করালাম। তাঁর চোখে সুরমা লাগিয়ে দিলাম। মাথায় তেল দিলাম। হাতে একটি লাঠি দিয়ে দ্বামরার সাথে রওনা করলাম। উটগুলোর সাথে তিনি মাঠের দিকে রওনা হলেন, উপত্যকা ও গাছপালা অতিক্রম করছিলেন। মনে হচ্ছিলো যেন পূর্বদিক থেকে সূর্য নতুনভাবে উদিত হচ্ছিলো।

বনূ সা'দের লোকেরা হযরত হালীমাকে বললো, ''তাঁকে মাঠে যেতে না দিয়ে ঘরে রাখাই উত্তম ছিলো।'' হযরত হালীমা বললেন, ''আমিও তো তা-ই চাচ্ছিলাম। কিন্তু তাঁর আবদার রক্ষা না করে পারলাম কোথায়?'' তারা বললো, ''তাহলে তুমিও তাঁর পেছনে পেছনে চলে যেও!'' তাদের পরামর্শ আমারও মনঃপূত হলো।

একদিন উভয়ে উট চরাতে গেলো। আমিও পেছনে পেছনে বের হলাম। আমি ও তাদের মধ্যে যথেষ্ট দুরত্ব ছিলো। দূর থেকে আমি হুযূরের প্রিয় চেহারা থেকে নূর চমকাতে দেখেছি। তা দেখে তাঁর প্রতি আমার মনে স্নেহ ঢেউ খেললো। বাধ্য হয়ে আমি তাঁর নিকট চলে গেলাম। সালাম বিনিময়ের পর আমি জিজ্ঞাসা করলাম- ''পুত্র, দ্বামরার সাথে আপনার সময় কেমন কাটছে?'' তিনি বললেন, ''আল-হামদু লিল্লাহ! উট চরাতে খুব মজা পাচ্ছি।'' তারপর দ্বামরাহকে জিজ্ঞাসা করলাম- ''দ্বামরাহ্'! তুমি বলো, প্রিয় মুহাম্মাদের সাথে তোমার সময় কেমন যাচ্ছে?'' দ্বামরাহ্ বললো, ''খুব ভাল যাচ্ছে। তবে আমি অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনা ও বিষয় দেখতে পাচ্ছি।'' আমি বললাম- ''সেগুলো কেমন?'' দ্বামরাহ্ বললো, ''মুহাম্মদ পাথরগুলোর পার্শ্ব দিয়ে যাবার সময় পাথর তাঁকে সালাম বলে। গাছপালার পাশ দিয়ে যাবার সময় তাঁর প্রতি গাছপালা ঝুঁকে যায়। উট তাঁর সব কথা মেনে চলে। যদি তিনি বলেন- 'দাড়াঁও', তখনই সেগুলো দাঁড়িয়ে যায়। আর চলতে বললে সাথে সাথে চলতে থাকে। আরেক দিন গহীন বনে সামনে বাঘ পড়েছিলো। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। উটগুলোও ভয়ে পালিয়ে গেলো। কিন্তু বাঘটি সোজা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফার নিকট আসলো এবং নিজের মাথা তাঁর সামনে ঝুঁকিয়ে দিলো। তিনি বাঘের কানে কি যেন বললেন। অমনি বাঘটি দৌড়ে পালালো। ইতোপূর্বে একটি উট পালানোর সময় সেটার পা ভেঙ্গে গিয়েছিলো। সেটা তাঁর সামনে এসে পাটুকু টেনে দিলো। তিনি সেটার উপর হাত বুলিয়ে দিতেই তা আরোগ্য লাভ করলো।'' দ্বামরার মুখে এসব কথা শুনে আমি (হযরত হালিমা) তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম।

আরেকদিন হুযূর অন্যান্য দিনের মতো দ্বামরার সাথে উট চরাতে গেলেন। দুপুরের সময় গোত্রের মধ্যে শোরগোল পড়ে গেলো। আমিও ভীত-সন্ত্রস্থ হয়ে ঘর থেকে বের হলাম। দেখলাম দ্বামরাহ্ উচ্চস্বরে বলছিলো, ''আম্মা! তাড়াতাড়ি আসুন! মুহাম্মদকে কেউ শহীদ করে ফেলেছে।'' এটা শুনে গোত্রের লোকেরা তরবারি নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে পড়লো। মহিলারা কাঁদতে লাগলো। হারিসও ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন আর বলতে লাগলেন, ''হায় আফসোস! মুহাম্মদ কি ঘরের বাইরে এসে শহীদ হয়ে গেলেন?'' আমি সবার আগে কাঁদতে কাঁদতে দৌঁড়ে যেতে লাগলাম। আমরা উটগুলোর পাশে গিয়ে দেখলাম হুযূর বসে নিরাপদে আছেন এবং মুচকি হাসছেন আমি আত্মহারা হয়ে তাঁর কপালে চুমু দিলাম, স্নেহভরে বুকে জড়িয়ে নিলাম। আর বললাম- ''পুত্র, কি ঘটেছিলো?'' হুযূর বললেন-

> ''আম্মাজান! আমি দ্বামরাহ্‌র নিকট বসে খেজুর খাচ্ছিলাম। হঠাৎ দু'জন অপরিচিত লোক আসলেন। তাঁরা অতি স্নেহ সহকারে আমাকে শোয়ালেন। একজন অতি চমকদার ছুরি বের করলেন আর আমার পেট বক্ষ পর্যন্ত চিরে ফেললেন। আমার অন্ত্রগুলো এবং হৃদযন্ত্র বের করে নিলেন। তিনি আমার হৃদয়কে উল্টেপাল্টে দেখছিলেন। আমার

হৃদয় থেকে একটি কালো অংশ বের করে ফেলে দিলেন।

উল্লেখ্য, এ অংশটা প্রত্যেক মানবদেহে সহজাতভাবে দেহ বৃদ্ধির সাথে সাথে সৃষ্টি হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তা'আলা বারবার বক্ষ বিদারণের মাধ্যমে তা থেকে পবিত্র করে রেখেছেন। এটাও নবী নিষ্পাপ হবার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কারণ, নবী পাকের নূরানী দেহের মানবীয় দিকটিও একেবারে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন ছিলো। তদুপরি, হুযূর এরশাদ করেছেন- আমাকে প্ররোচনা দেয়ার জন্য যেই শয়তান নির্দ্ধারিত হয়ে ছিলো সেও আমার উপর ঈমান এনে মুসলমান ও আমার অনুগত হয়ে গেছে।)

তারপর অপরজন এগিয়ে আসলেন। তাঁর হাতে একটা থালা ছিলো। তাতে পরিষ্কার পানি ছিলো। তা দ্বারা আমার হৃদয় ধুয়ে আমার দেহের পার্শ্বদেশে স্থাপন করে দিয়েছেন। তারপর একটা মোহর বের করলেন এবং আমার হৃদয়ের উপর ছেপে দিলেন। আমার পেট ও বক্ষ একেবারে আগের মতো হয়ে গেছে।

তারপর একে অপরকে বলতে লাগলেন, ''তাঁকে দশজন উম্মতের মোকাবেলায় ওজন করো। ওজন করে দেখা গেলো আমি ভারী হয়েছি। লোকটি আবার বললেন, একশ' জনের মোকাবেলায় ওজন করো। তখনও আমি ভারী হলাম। তখন অপর জন বললো, ''এক পাল্লায় সমস্ত উম্মত রাখলেও এ পাল্লায় তিনি ভারী হবেন।'' তারপর উভয়ে বললেন, ''মুহাম্মদ! আপনার উপর যেই নি'মাত দেয়া হবে তার কোন শেষ নেই।'' এটা বলে উভয়ে আসমানের দিকে উড়ে চলে গেছেন। আমি তাদেরকে দেখতে রইলাম। শেষ পর্যন্ত তাঁরা আমার চোখের অন্তরালে চলে গেছেন।''

এ বর্ণনা শুনে গোত্রের লোকেরা একে অপরের মুখ দেখতে লাগলো। পরবর্তী দিন হারিস আমাকে বললেন, ''হালীমা! তাঁকে তাঁর পরিবারের নিকট দিয়ে এসো! আমরা কোন পরীক্ষার সম্মুখীন যেন না হই।'' গোত্রের লোকেরা বললো, ''তাঁকে কোন গণকের নিকট নিয়ে যাও!'' আমি তাঁকে এক গণকের কাছে নিয়ে গেলাম। গণক বললো, ''ঘটনা শোনাও!'' আমি ঘটনা শুনালাম। শুনতেই সে বললো, ''হে আরববাসী! এ শিশু-সন্তানকে হত্যা করো, ইনি তোমাদের উপাস্যগুলোকে বাতিল সাব্যস্ত করবেন। আর তোমাদেরকে এমন এক দ্বীনের দাওয়াত দেবেন, যা সম্পর্কে তোমাদের কোন ধারণাই নেই।''

গণক শোর-চিৎকার করছিলো। তখন হঠাৎ এক আশ্চর্যজনক গড়নের মানুষ আত্মপ্রকাশ করলেন। তাঁর সাথে এক চমকদার হাতিয়ার ছিলো। সেটার একটি মাত্র আঘাতে গণককে দু'টুকরো করে ফেললেন। আর নিজে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আলহামদু লিল্লাহ!

হযরত হালীমা হুযূরকে নিয়ে ফিরে আসছিলেন। পথিমধ্যে একটি বৃক্ষের তীরে বসে এক মহিলা কাঁদছিলো। আর বলছিলো, 'সে কাঁধের উপর তার শিশু সন্তানকে নিয়ে এ কূপের নিকট আসলো। শিশুটা মাথা নুইয়ে কূপের ভিতরের পানি দেখতে চাইলো। অমনি তার হাত থেকে ছুটে সে কূপের ভিতর পড়ে গেছে।'' এ কথা বলে সে আবারও কাঁদছিলো। তখন হুযূর-ই আকরাম কূপের তীরে দাঁড়িয়ে পানির দিকে আপন আঙ্গুল শরীফ দিয়ে ইশারা করলেন। তখনই কূপের পানি ফুলে তীরের সমস্তরে ওঠে আসলো। আর পানির উপরিভাগে শিশুটা সাঁতরাচ্ছিলো। মহিলা তার সন্তানকে ফিরে পেলো। এ অলৌকিক বিষয় দেখে হযরত হালীমা হুযূরকে কোলে তুলে নিয়ে জড়িয়ে ধরলেন।

পরবর্তী দিন হযরত হালীমা হুযূরকে সাথে নিয়ে মক্কা মুকাররামায় গেলেন। হেরম শরীফে পৌঁছে দেখলেন হেরমের দরজার অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে। এক জায়গায় হুযূর মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) কে বসিয়ে হযরত হালীমা কা'বা শরীফের তাওয়াফ করলেন। ফিরে এসে দেখলেন ওই স্থানে হুযূর নেই। তিনি উঁচু স্বরে ডাকতে লাগলেন। লোকজনকে জিজ্ঞাসা করলে- তারা 'মুহাম্মদ'কে দেখেছে কিনা। তারা বললো, ''কোন্ মুহাম্মদ?'' হযরত হালীমা বললেন, ''মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবদুল মুত্তালিব। আমি তাঁকে তাঁর দাদার নিকট অর্পণ করতে এসেছি।'' এ বলে তিনি কান্নাকাটি করছিলেন। তখন এক বৃদ্ধ লাঠির উপর ভর করে হযরত হালীমার নিকট আসলো আর বললো, ''আমি সর্বাধিক বড় বোত্ হুবলকে জিজ্ঞাসা করে আসি 'মুহাম্মদ' কোথায়।'' বৃদ্ধ এসে হুবলের সামনে হুযূরের নাম নিতেই বোতটি ঝুঁকে পড়লো আর বলতে লাগলো, ''বৃদ্ধ! একদিন এ শিশুর হাতে আমরা নিঃশেষ হয়ে যাবো।'' বৃদ্ধটি বোত্খানা থেকে বেরিয়ে আসতেই মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। তার হাত থেকে লাঠি ছুটে গেলো আর কাঁদতে লাগলো।

হযরত হালীমা বললেন, ''এদিকে আমি অদৃশ্য থেকে আওয়াজ শোনলাম, '' হে লোকেরা শোনো! মুহাম্মদের রব তাঁকে ধ্বংস হতে দেবেন না। তিহামাহ্ উপত্যকায় ইয়ামামাহ্ বৃক্ষের নিচে শিশু মুহাম্মদ বসে আছেন।'' মক্কার লোকেরাও ওই আহবান শুনেছিলো। ওদিকে খাজা আব্দুল মুত্তালিব ঘর থেকে বের হলেন। আর তিহামাহ্ উপত্যকার দিকে দৌঁড়ে গেলেন। আমিও (হযরত হালিমা) দ্রুত ওখানে পৌঁছলাম। দেখলাম, আবদুল মুত্তালিব হুযূরের নিকট দাঁড়িয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করছিলেন। আর বলছিলেন-

''বৎস তুমি কে?'' হুযূর বললেন, ''মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব''। খাজা আবদুল মুত্তালিব বললেন, ''ওহে আমার কলিজার টুকরা! আমি তোমার দাদা আবদুল মুত্তালিব।'' এটা বলে তিনি হুযূরকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আর আমাকে (হযরত হালীমা) খুব আতিথ্য-সমাদর করলেন এবং বহু পুরস্কার-উপঢৌকন দিয়ে বিদায় দিলেন। ওয়া সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলা হাবীবিহী ওয়া সাল্লাম।

হযরত খাদিজা'র আঙ্গিনায় নুবূওয়তের সূর্য!

হযরত খাদিজা স্বপ্নে দেখলেন- 'আসমান থেকে সূর্য তাঁর ঘরের আঙ্গিনায় নেমে এসেছে। তখন মক্কার ঘরে ঘরে আলোর ছড়াছড়ি। হযরত খাদিজা জাগ্রত হলেন। আপন চাচা ওয়ারক্বাহ্ ইবনে নওফলকে স্বপ্নের কথা শুনালেন। তিনি তখন মক্কায় একজন নির্ভরযোগ্য জ্ঞানী ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হতেন। ওয়ারক্বাহ্ বললেন, ''বেটী! তোমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা হচ্ছে- 'নবী-ই আখিরুয্ যামান' (শেষ যমানার নবী) তোমার স্বামী হবেন।''

এ সুসংবাদ শুনে হযরত খাদিজা বললেন, ''চাচাজান! ওই নবী কোন্ শহরের অধিবাসী হবেন?'' ওয়ারক্বাহ্ বললেন, ''মক্কার''। হযরত খাদিজা বললেন, ''তিনি কোন্ গোত্রের হবেন?'' ওয়ারক্বাহ্ বললেন, ''ক্বোরাঈশের''। হযরত খাদিজা আবার বললেন, ''ক্বোরাঈশের কোন শাখার?'' ওয়ারক্বাহ্ বললেন, ''বনূ হাশিমের।'' হযরত খাদিজা বললেন, ''তাঁর নাম শরীফ কি হবে?'' ওয়ারক্বাহ্ বললেন, ''মুহাম্মদ।'' (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)

চাচার নিকট স্বপ্নের ব্যাখ্যা শুনে হযরত খাদিজা খুশীতে অস্থির হয়ে পড়লেন। আর এ অপেক্ষায় প্রহর গুন্ছিলেন যে, কবে বাস্তবেও তাঁর আঙ্গিনায় ওই সূর্য নেমে আসবে।

এদিকে একদিন রসূল-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচা খাজা আবূ তালিবের ঘরে আহার করছিলেন। আবূ তালিব ও তাঁর বোন আতিক্বাহ্ পরস্পর হুযূর-ই আক্রামের সুন্দর চরিত্র ও সদ্ব্যবহার ইত্যাদির প্রশংসা করছিলেন। তাঁরা পরস্পর এ কথাও বলছিলেন, ''এখন মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) মা-শাআল্লাহ্ যৌবনে পদার্পণ করেছেন। কিন্তু আমাদের তো ওই আর্থিক সামর্থ্য নেই, যা দিয়ে তাঁর বিবাহের আয়োজন করতে পারবো। জানিনা আল্লাহ্ পাকের মর্জি মুবারক কি?'' আতিক্বাহ্ খাজা আবূ তালিবকে বললেন, ''ভাইজান! খাজিদা একজন শান্ত শিষ্ট মহিলা। তাঁর ব্যবসা- বাণিজ্যের কাজে যে-ই যোগদান করেছে তার আর্থিক সচ্ছলতা এসেছে। তিনি অতি সত্ত্বর সিরিয়ায় একটি ব্যবসায়িক কাফেলা প্রেরণ করতে যাচ্ছেন। মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) যদি তাঁর নিকট কাজ করলে আপনার কোন আপত্তি না থাকে, তবে কিছু অর্থকড়ি হাতে আসবে। তা দিয়ে আমরা তাঁর বিয়ের আয়োজন করতে পারবো।''

খাজা আবূ তালিবের নিকট আতিকার প্রস্তাব পছন্দ হলো। তিনি হুযূর-ই আক্রামের সাথে পরামর্শ করলেন। হুযূর তাতে সম্মতি দিলেন।

অত:পর আতিকাহ্ হযরত খাদিজার ঘরে গেলেন। আর বললেন, ''মুহাম্মদ

(সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আপনার নিকট কাজ করতে চান।'' এ প্রস্তাব শুনে হযরত খাদিজা চিন্তায় পড়ে গেলেন। আর মনে মনে ভাবতে লাগলেন, ''এ'তো তার স্বপ্নের বাস্তব ব্যাখ্যা। মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) একাধারে আরবী, ক্বোরাঈশী, মক্কী ও হাশেমী। সর্বাপেক্ষা বড় কথা হচ্ছে তাঁর নাম শরীফ 'মুহাম্মদ'। ''হযরত খাদিজা তখনই বিচলিত হয়ে পড়লেন। তাঁর মন চাচ্ছিলো- তখনই আতিকার মাধ্যমে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়ে দিতে; কিন্তু কোন অজানা কারণে তিনি তাঁর আবেগের কথা প্রকাশ করতে পারলেন না। তবে, তিনি আতিকাহকে বললেন, ''আমি তো কাফেলার সাধারণ কর্মকর্তাদেরকে বিশ দিনার হারে দিয়ে থাকি; কিন্তু মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) কে পঞ্চাশ দিনার দেবো।''

আতিকাহ্ খুশী মনে ঘরে ফিরে আসলেন। আর হযরত খাদীজা যা বললেন তা খাজা আবূ তালিবকে শুনালেন। তিনি এবার হুযূরকে চাচাসূলভ ভঙ্গিতে করুণ সুরে বললেন, ''হে আমার চোখের মণি! হৃদয়ের শান্তি! খাদিজার নিকট যাও! আর যে কাজের ভার তোমাকে অর্পণ করবে তা অতি সুন্দরভাবে সমাধা করবে।''

হুযূর-ই আক্রাম হযরত খাদিজার নিকট তাশরিফ আনলেন। তাঁর দরজার সামনে বসলেন। তখন তাঁর নূরানী চক্ষুযুগল থেকে মুক্তারূপী অশ্রুধারা তাঁর গণ্ডদেশ শরীফের উপর গড়িয়ে পড়তে লাগলো। হুযূরের চক্ষুযুগলে অশ্রু দেখে আসমানের ফিরিশ্তারাও কাঁদতে লাগলেন।

হুযূর কাফেলার কাজে যোগদান করলেন। কাফেলা সিরিয়াভিমুখে রওনা হলো। তখন কাফেলার আমীর (তত্ত্বাবধানকারী) ছিলেন 'মায়সারাহ্'। তিনি হুযূরকে বললেন, ''পশমের পোশাক পরে নিন। মাথায় টুপি রাখুন। সবার আগে যে উটটি রয়েছে, সেটার লাগামটি ধরুন!'' হুযূর তাই করলেন যা মায়সারাহ্ বললেন। এখন হুযূর সুদূর সিরিয়ার দিকে পদব্রজে সফর করে যাচ্ছেন। হুযূর আপন মনে ভাবছিলেন, ''আজ আমার মা আমেনা এবং পিতা আব্দুল্লাহ্ এটা দেখে সহ্য করতে পারতেন না যে, তাঁদের চোখের মণি এতো কষ্টকর সফরে আপন জন্মভূমি ছেড়ে বহুদূরে যাচ্ছে।''

দেখতে দেখতে কাফেলা মরুভূমিতে প্রবেশ করলো। হেযাজের রোদের তাপও তার রূপ দেখাতে লাগলো। গরমে সবার রসনা ওষ্ঠাগত। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর হাবীবকে এমতাবস্থায় রোদের তাপ অনুভব করতে দেননি। সাদা মেঘের একটি টুক্রো হুযূরের মাথার উপর এসে শামিয়ানা হয়ে গেলো। তাছাড়া, হযরত খাদিজা মায়সারাকেও নির্দেশ দিয়েছিলেন- কাফেলা যখনই মরুভূমিতে গিয়ে পৌঁছবে, তখন মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)কে আরামদায়ক পোশাক পরিয়ে দেবে এবং উটের পিঠে আরোহণ করিয়ে দেবে।

মায়সারাহও ওই নির্দেশ পালন করলেন। হুযূরও উটের পিঠে সদয় আরোহণ করলেন। মাথা মুবারকের উপর মেঘ ছায়া দিচ্ছিলো। তদুপরি আল্লাহ্ তা'আলা ঠাণ্ডা ও মনোরম হাওয়া প্রবাহিত করলেন। হুযূর উটের পিঠের উপর হাওদায় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। (সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহ্'।) আর উট এগিয়ে যাচ্ছিলো।

পথিমধ্যে যাত্রা বিরতির একটি স্থান আসলো। কাফেলা যাত্রা পথে সাধারণত: ওখানে এসে যাত্রা বিরতি করে। পাশে এক পাদ্রীর (রাহিব) উপাসনালয় ছিলো। কাফেলা ওখানে পৌঁছে একটি গাছের নিচে থামলো। পাদ্রীও উপাসনালয়ের বাইরে এসে দাঁড়ালো। তিনি কাফেলার উপর মেঘ দেখতে পেলেন। তখন ভাবতে লাগলেন- নি:সন্দেহে এ কাফেলায় একজন নবী রয়েছেন। পাদ্রী তাঁর উপসনালয়ে তাঁদের জন্য এক শানদার আতিথ্যের ব্যবস্থা করলেন। কাফেলার সব লোক হুযূরকে মাল-সামগ্রীর নিকট বসিয়ে রেখে পাদ্রীর দাওয়াত খেতে চলে গেলো। পাদ্রী দেখলো মেঘের টুক্‌রো তো উপাসনালয়ের উপর আসে নি। তিনি দরজায় আসলেন। দেখলেন মেঘের টুক্‌রোটা ওই গাছের উপরই রয়ে গেছে। এবার তিনি কাফেলার লোকদের বললেন, ''তোমরা কি সবাই এসে গেছো?'' তারা বললো, ''না, একজন এতিম রয়ে গেছে। তাকে আমরা উটের পিঠে বোঝাইকৃত মাল-সামগ্রীর দেখাশোনা করার জন্য রেখে এসেছি।''

একথা শুনামাত্রই পাদ্রী বেরিয়ে আসলেন। তিনি হুযূরের নিকট আসলেন। হুযূরও আপন সুন্দর নিয়মে দাঁড়িয়ে পাদ্রীর সাথে করমর্দন করলেন। পাদ্রী হুযূরের হাত ধরে তাঁর উপাসনালয়ে নিয়ে আসলেন। হুযূরও দস্তরখানায় বসে গেলেন। এবার পাদ্রী বাইরে এসে দেখলেন- মেঘখণ্ডটি উপাসনালয়ের উপরে এসে স্থির হয়ে আছে। তখনই তিনি ভিতরে এসে হুযূরের সাথে আলাপে রত হলেন। বললেন, ''হে যুবক! আপনার শহরের নাম কি?'' (অর্থাৎ আপনি কোন্ নগরী থেকে এসেছেন?) হুযূর বললেন, ''মক্কা থেকে।'' পাদ্রী বললেন, ''কোন গোত্র থেকে?'' হুযূর বললেন, ''ক্বোরাঈশ থেকে।'' পাদ্রী বললেন, ''ক্বোরাঈশের কোন্ শাখা থেকে?'' হুযূর বললেন, ''বনূ হাশিম থেকে।'' এবার পাদ্রী বললেন, ''আপনার নাম শরীফ কি?'' হুযূর বললেন, ''মুহাম্মদ''। (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এ কথা শুনতেই পাদ্রী হুযূরের কদম শরীফে লুটিয়ে পড়লেন। আর ওঠে হুযূরের কপাল মুবারকে চুমু খেয়ে আরয করলেন, ''আমাকে একটি চিহ্ন দেখতে দিন! যাতে আমার পূর্ণ ইয়াক্বীন হয়ে যায়।'' হুযূর বললেন, ''কোন্ চিহ্ন?'' পাদ্রী বললেন, ''আপনার জামা শরীফটি খুলুন!'' হুযূর জামা শরীফ খুললেন। পাদ্রী হুযূরের পৃষ্ঠ মোবারকে 'মোহরে নুবূয়ত' দেখতে পেলেন। অমনি তা'তেও চুমু খেলেন এবং আপন চেহারাকে সেটার উপর মালিশ করতে করতে আরয করলেন,

''হে হাশরের ময়দানের শোভা! হে উচ্চ সাহসিকতা ও মানসিকতার অধিকারী! হে রহমতের নবী! হে উম্মতের জন্য সুপারিশকারী! ক্বিয়ামত দিবসে আমার জন্যও সুপারিশ করার আবেদন জানাচ্ছি।''

পাদ্রী এ কথা বলছিলেন আর কাঁদছিলেন। তদ্‌সঙ্গে মুখে স্পষ্ট স্বরে পড়ছিলেন-''লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্'' (আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, মুহাম্মদ মোস্তফা আল্লাহর রাসূল।)

কাফেলা এরপর সিরিয়া পৌঁছলো। ব্যবসা সংক্রান্ত কাজ সমাধা হলো। ওই সফরে হযরত আবূ বকরও ব্যবসার উদ্দেশ্যে তাঁদের সাথে সিরিয়া গিয়েছিলেন। একদিন হযরত আবূ বকর, মায়সারাহ্ ও হুযূর-ই আকরাম ইহুদিদের 'ঈদ' (উৎসব) দেখার জন্য তাদের উপাসনালয়ে গিয়ে তাতে প্রবেশ করলেন। হঠাৎ ফানুসগুলোর শিকল আপসে ছিঁড়ে গেলো। ইহুদিরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তাদের পাদ্রীকে বললো, ''শিকলগুলো ছেঁড়ার কারণ কি?'' পাদ্রী বললো, ''তাওরীতে লিখা হয়েছে যে, শেষ যমানার নবী যখন ইহুদিদের ঈদগাহে (উপাসনালয়) আসবেন, তখন এর বিহ্ন প্রকাশ পাবে। সম্ভবত তিনি এসে গেছেন।'' সুতরাং ইহুদিরা এ বলে শোর-চিৎকার করতে লাগলো, ''যদি আমরা তাঁকে দেখতে পাই, তবে হত্যা করে ফেলবো।'' এ কথার ঘোষণা দিয়ে তারা হুযূরের তালাশে বের হলো। হযরত আবূ বকর ও মায়সারাহ্ হুযূরকে আড়াল করে তাড়াতাড়ি ওই উপসনালয় থেকে বেরিয়ে আসলেন। আর মক্কার উদ্দেশে রওনা হবার জন্য দ্রুত প্রস্তুতি নিলেন।

আল্‌হামদু লিল্লাহ্! কাফেলা দ্রুত মক্কার দিকে এগিয়ে চললো। মায়সারার নিয়ম ছিলো যে, কাফেলা ফিরে এসে মক্কার নিকটবর্তী হলে কাউকে অগ্রিম পাঠিয়ে হযরত খাদিজাকে খবর দিতেন যে, সহসা কাফেলা মক্কায় পৌঁছে যাচ্ছে। এ বার মায়সারা এ কাজটি করার জন্য হুযূরকে পাঠাতে চাইলেন। আর বললেন, ''আপনাকে কাফেলার আগমনের খবরটি নিয়ে আগেভাগে পাঠালে কি আপনি তা পছন্দ করবেন?'' হুযূর তাতে সদয় সম্মত হলেন। সুতরাং মায়সারাহ্ একটি উটকে সজ্জিত করে সেটার পিঠে হুযূরকে আরোহণ করালেন। আর কাফেলার আগমনের সুসংবাদ শুনানোর জন্য মক্কা পাঠিয়ে দিলেন।

মায়সারাহ্ খাদিজার নামে একটি চিঠিও লিখে ছিলেন এবং তাও হুযূরের হাতে অর্পণ করলেন। চিঠিতে তিনি যা লিখেছিলেন তা ছিলো- ''হে ক্বোরাঈশ-রমণীদের সরদার! এ বছর পূর্ববর্তী সকল বছরের চেয়ে লাভ বেশি হয়েছে।''

হুযূর উটকে সংকেত দিলেন। আর রওনা হয়ে গেলেন।

এদিকে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত জিব্রাঈলকে বললেন, ''যমীনকে সুগম করে দাও! হযরত ইসরাফীল ও হযরত মীকাঈলকে বললেন, ''মাহবূবের ডানে-বামে

রক্ষাকর্মীর মতো হয়ে চলতে থাকো''। মেঘকে বললেন, ''হাবীবের মাথার উপর শামিয়ানা হয়ে থাকো।'' বাতাসকে বললেন, ''পূর্ণ মনোরম গতিতে প্রবাহিত হতে থাকো।'' এমন সুন্দর ব্যবস্থাপনায় উট এগিয়ে চললো। হুযূর উটের পিঠে ঘুমিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর চোখ মোবারক খুললে মক্কা মুকার্‌রামাহ্‌ নজরে পড়লো।

হযরত খাদিজা প্রতিদিনের ন্যায় আজও দাঁড়িয়ে হুযূরের আগমনের জন্য সিরিয়ার দিকে অপেক্ষারত ছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন দূর থেকে সজ্জিত উটের পিঠে একজন আরোহী আসছেন। তাঁর মাথার উপর মেঘ ছায়া করে আছে। হযরত খাদিজা তাঁর ক্রীতদাসীদের বললেন, ''দেখো তো ওই আরোহীকে চিনতো পারছো কি না?'' এক দাসী বললো, ''দেখে তো মনে হচ্ছে তিনি মুহাম্মদ আল-আমীন।'' (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) হযরত খাদিজা খুশী হয়ে বললেন, ''যদি তিনি মুহাম্মদ হন, তাহলে আমি তোমাদের সবাইকে আযাদ করে দেবো।''

উটটি নিকটে আসলে হুযূরকে দেখে হযরত খাদীজা তাঁর ঘোষণা মতো সকল ক্রীতদাসীকে আযাদ করে দিলেন। আর হুযূরকে সসম্মানে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, ''আপনি যেই উটে আরোহণ করে এসেছেন, সেটা আমি আপনাকে হাদিয়া স্বরূপ পেশ করলাম।'' হুযূর মায়সারার চিঠিখানা হযরত খাদিজাকে অর্পণ করে আপন চাচার ঘরে চলে গেলেন। কয়েকদিন পর হুযূর খাদিজার ঘরে আসলেন। খাদিজা বললেন, ''আপনাকে স্বাগতম! কীভাবে শুভাগমন হলো?'' হুযূর বললেন, ''চাচা পাঠিয়েছেন আমার পারিশ্রমিকটুকু নেয়ার জন্য। তিনি আমার শাদীর আয়োজন করতে চান।'' এ কথা বলার সময় লজ্জাবশত: হুযূর আপন চেহারা মুবারক ঝুঁকিয়ে নিলেন। খাদিজা বললেন, ''পঞ্চাশ দিনার তো অতি ক্ষুদ্র সংখ্যক অর্থ। এতো কম সংখ্যক টাকায় তিনি কি কি কিনবেন?'' হযরত খাদিজা কথা প্রসঙ্গে বললেন, ''আপনার শাদী যদি আমি আরবের এমন এক অভিজাত মহিলার সাথে করিয়ে দিই কেমন হবে, যিনি দেখতে সুন্দরী, ধনবতী। আর আরবের আমীর লোকেরা তাঁর সাথে শাদী করতে দারুন আগ্রহী। কিন্তু তিনি সবাইকে প্রত্যাখ্যান করেছেন; তবে ওই মহিলার মধ্যে একটি ত্রুটিও আছে, তাহলো তিনি বিধবা। এ ত্রুটি সত্ত্বেও যদি আপনি তাকে গ্রহণ করেন, তবে আজীবন তিনি আপনার দাসী হয়ে থাকবেন?''

হুযূর কোন জবাব দিলেন না। তিনি উঠে চাচার ঘরে চলে আসলেন এবং চিন্তিত হয়ে বসে রইলেন। চাচা বললেন, ''পুত্র আমার! কি হয়েছে? চিন্তিত কেন?'' হুযূর বললেন, ''খাদিজা আমাকে অনেক কথা বলেছেন।'' তারপর হুযূর খাদিজার সব কথা চাচাকে বললেন। এর খাজা আবূ তালিব খাদীজার ঘরে আসলেন। তিনি খাদিজাকে বললেন-

''খাদিজা! তোমার নিকট প্রচুর অর্থ সম্পদ আছে সত্যি, কিন্তু আমাদের তো বংশীয় মর্যাদা ও সামাজিক মান-সম্মান আছে। তুমি আমার ভ্রাতুষ্পুত্রকে এমন কথা কেন বলেছো?''

হযরত খাদিজা সাথে সাথে ওঠে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন আর আরয করলেন- ''এমন কে আছে, যে আপনাদের বংশীয় ও সামাজিক মর্যাদাকে অস্বীকার করতে পারে? আমি তো তাঁকে ইঙ্গিতে আমাকে শাদী করার আবেদন করেছিলাম। তিনি যদি কবূল করে নেন, তবে তা আমার সৌভাগ্যের কারণ হবে। আর যদি প্রত্যাখ্যান করেন, তবে জীবনে আর শাদী করবো না।''

খাজা আবূ তালিবের সাথে তাঁর বোন আতিকাহ্‌ও ছিলেন। তিনি হযরত খাদিজাকে বললেন, ''আপনার চাচা ওয়ারক্বাহ্‌ ইবনে নওফল কি আপনার এ ইচ্ছা সম্পর্কে অবগত আছেন?'' হযরত খাদিজা বললেন, ''না, তবে আতিক্বাহ্‌! আমি খাজা আবূ তালিবকে আমার ইচ্ছার কথা বলেই ফেলেছি। আপনারা আমার চাচাকে দাওয়াত দিন এবং তাঁর সাথে কথা বলুন!'' আতিকাহ্‌ ও আবূ তালিব একথা শুনে ঘরে ফিরে গেলেন।

তারপর খাজা আবূ তালিবের ঘরে ওয়ারক্বাহ্‌ ইবনে নওফলের সম্মানে দাওয়াতের আয়োজন করা হলো। আরবের নেতৃস্থানীয় অভিজাত লোকদেরকেও দাওয়াত করা হলো। খাজা আবূ তালিব ওয়ারক্বাহর নিকট হযরত খাদিজাকে হুযূর-ই আকরামের সাথে বিবাহের প্রস্তাব পেশ করলেন। তিনি বললেন, ''আবূ তালিব! এ'তে আমার কোন আপত্তি নেই। তবে আমাকে একটু খাদিজার মতামতও যাচাই করতে দিন!''

দাওয়াত শেষে ওয়ারক্বাহ্‌ হযরত খাদিজার ঘরে আসলেন। তিনি হযরত খাদিজাকে উক্ত প্রস্তাবের কথা বললেন। হযরত খাদিজা বললেন, ''চাচাজান! মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর মধ্যে আমানতদারী এবং চারিত্রিক স্বচ্ছতা ও পবিত্রতা আছে। বংশীয় এবং সামাজিক মর্যাদাও আছে। সুতরাং আমি এ প্রস্তাব কিভাবে প্রত্যাখ্যান করতে পারি?'' ওয়ারক্বাহ্‌ বললেন, ''কিন্তু তাঁর নিকট তো (এখন) অর্থভাণ্ডার দেখছি না।'' হযরত খাদিজা বললেন, ''তাতে কি হয়েছে? চাচাজান! আমার নিকট তো অর্থ-সম্পদের অভাব নেই। তাঁর সম্পদের তো আমার প্রয়োজন নেই। আমি আপনাকে আমার বিবাহের জন্য উকিল হবার ক্ষমতা দিলাম।'' সুতরাং যথানিয়মে হুযূরের সাথে হযরত খাদিজার শাদীর বিষয়টি চূড়ান্ত হলো।

কিছুদিন পরে খাজা আবূ তালিবের ঘরে শাদী মুবারকের আয়োজন করা হলো। মতান্তরে, হুযূর-ই আকরাম নিজেই খোৎবা পাঠ করলেন। এশার সময় হযরত আবূ বকরকে সাথে নিয়ে হুযূর-ই আকরাম হযরত খাদীজার ঘরে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। এদিকে হযরত খাদীজা হুযূর-ই আকরামের সম্মানে একশত

দাস-দাসীকে দরজার ডানে ও বামে দাঁড় করিয়ে রাখলেন। তাদের হাতে ছিলো মণি-মুক্তা ভর্তি থালা। হুযূর তাশরীফ আনলেন। তারা হুযূরের শির মুবারকের উপর মণি-মুক্তা ছিটিয়ে স্বাগত জানালো।

হযরত আবূ বকর হুযূরের নিকট থেকে হযরত খাদিজার ঘরের দরজায় বিদায় নিয়ে ফিরে আসলেন। হুযূর হযরত খাদিজার ঘরে তাশরিফ নিয়ে গেলেন। আর হযরত খাদিজা হুযূরকে স্বাগত জানালেন এবং আরয করলেন-

> ''হে আমার মাথার মুকুট! আমার বাক্‌শক্তি ও নীরবতা! অর্থ- সম্পদ, চাকর-নওকর, স্বর্ণ-রূপা, উট ও ঘরবাড়ি- যা কিছু আমার আছে, এখন থেকে আমার কিছুই রইলো না, সবকিছুই আপনার। আজ থেকে আপনিই সবকিছুর মালিক। যেখানে ও যেভাবে চাইবেন ব্যয় করবেন।''

সুবহানাল্লাহ্! একদিকে হযরত খাদিজার স্বপ্নপূরণ হয়েছে। 'তাঁর আঙ্গিনায় আজ দু'জাহানের সমুজ্জ্বল সূর্য নেমে এসেছে। নবীকুল সরদার তাঁর ঘরে তাশরিফ এনেছেন। অন্যদিকে ক্বোরআন করীমে এরশাদ হয়েছে-

وَوَجَدَكَ عَآئِلاً فَاَغْنٰى

''অর্থাৎ তিনি (আল্লাহ্) আপনাকে সম্পদহীন পেয়েছেন, অত:পর ধনী করে দিয়েছেন। সেটার বাস্তব ব্যাখ্যাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত খাদিজার মাধ্যমে তার প্রচূর অর্থ-সম্পদ হুযূরের কদমে অর্পণ করিয়েছেন।

উল্লেখ্য, উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদিজা বিনতে খুয়াইলেদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হা তাঁর জীবনের দীর্ঘ চব্বিশ বছর পাঁচ মাস সাতদিন হুযূর-ই করীমের সাথে অতিবাহিত করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তন্মধ্যে পনের বছর ওহীর অবতরণ আরম্ভ হবার পূর্বে আর বাকীটুকু ওহীর অবতরণের পর। শাদীর সময় হুযূরের বয়স ছিলো পঁচিশ বছর।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজার পবিত্র গর্ভে হুযূরের তিন পুত্র সন্তান-হযরত ক্বাসিম, হযরত তাহের ও হযরত মুতাহ্হার পয়দা হন এবং শৈশবেই তাঁরা ইনতিকাল করেন। আর চাঁর কন্যা- হযরত ফাতিমা, হযরত যায়নাব, হযরত রুক্বিয়াহ্ ও হযরত উম্মে কালসূম জন্মগ্রহণ করেন। হযরত সাইয়্যেদাহ্ ফাতিমার শাদী হযরত আলীর সাথে ও হযরত যায়নাবের শাদী আবুল আস ইবনে রবী'র সাথে হয়েছিলো। হযরত উম্মে কালসূমের শাদী হযরত ওসমানের সাথে হয়েছিলো। তাঁর ইনতিকালের পর হুযূর-ই আকরাম হযরত রুক্বিয়্যার শাদীও হযরত ওসমানের সাথে করিয়ে দিয়েছিলেন। এসব ক'টি বিবাহ্ জুমু'আর দিনে সম্পন্ন হয়েছিলো। (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা ও আন্‌হুন্না)

নূরনবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ছায়া ছিলো না।

'নূর'-এর ছায়া থাকেনা। এটা বাস্তব ও যুক্তিযুক্ত কথা। আমাদের আক্বা ও মাওলা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'নূর'। তাই তাঁর ছায়া না থাকা নিশ্চিত বাস্তব। বিশ্ববিখ্যাত কিতাব 'সীরাত-ই হালবিয়া'র প্রণেতাও হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর ছায়া না থাকার বিষয়টি বর্ণনা করার সাথে এর কারণ বা যুক্তিটাও উল্লেখ করেছেন-

اِذَامَشٰى فِىْ الشَّمْسِ اَوِ الْقَمَرِ لَا يَكُوْنُ لَهٗ ظِلٌّ لِاَنَّهٗ كَانَ نُوْرًا–

অর্থাৎ হুযূর-ই আকরাম যখন সূর্য ও চন্দ্রের আলোতে চলতেন তখন তাঁর ছায়া থাকতো না, কারণ তিনি নূর ছিলেন। [সূত্র: সীরাত-ই হালবিয়াহ্ :খন্ড- ২,পৃ: ৪২২,মিসরে মুদ্রিত]

হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর ছায়া না থাকার কারণ, হিকমত ও যুক্তির কথা আলোচনার পূর্বে এর পক্ষে অন্য কোন নির্ভরযোগ্য অকাট্য প্রমাণও আছে কিনা দেখা যাক! হ্যাঁ! অবশ্যই এর পক্ষে বিশুদ্ধ হাদীস শরীফ ও আমাদের সালফ-ই সালেহীন ও নির্ভরযোগ্য ইমামগণের বর্ণনা এবং আক্বীদাও এই যে, আমাদের আক্বা ও মাওলা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ছায়া ছিলো না। এটাই আহলে সুন্নাতের আক্বীদা বা বিশ্বাস। এ নিবন্ধে কয়েকটা দলীল নিম্নে পেশ করার প্রয়াস পাচ্ছি-

এক. ইমামুল হাদীস হযরত হাকীম তিরমিযী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি তাঁর কিতাব 'নাওয়াদিরুল উসূল'-এ হযরত যাক্‌ওয়ান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে এ হাদীস শরীফ বর্ণনা করেছেন-

عَنْ ذَكْوَانَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُرٰى لَهٗ ظِلٌّ فِىْ شَمْسٍ وَلَاقَمَرٍ–

অর্থাৎ সরওয়ার-ই আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ছায়া মুবারক না সূর্যের রোদে দেখা যেতো,না চাঁদের আলোতে।

দুই. সাইয়্যেদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে মুবারক ও হাফেয ইবনে জূযী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি আলায়হিমা হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন-

لَمْ يَكُنْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظِلٌّ وَلَمْ يَقُمْ مَعَ شَمْسٍ اِلَّا غَلَبَ ضُوْئُهٗ ضُوْئَهَا وَلَا مَعَ السِّرَاجِ اِلَّا غَلَبَ ضُوْئُهٗ ضُوْئَهٗ–

অর্থাৎ সরওয়রে-ই আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শরীর মুবারকের ছায়া ছিলোন - না সূর্যের রোদে, না প্রদীপের আলোতে। সরকার-ই দু'আলমের নূর সূর্য ও প্রদীপের আলো অপেক্ষা বেশী (সতেজ) থাকতো।

তিন. ইমাম নাসাফী তাফসীর-ই মাদারিক শরীফে হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে হাদীস উদ্ধৃত করেছেন-

قَالَ عُثْمَانُ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ اِنَّ اللّٰہَ مَااَوْقَعَ ظِلَّکَ عَلَی الْاَرْضِ لِئَلَّا یَضَعَ اِنْسَانٌ قَدَمَہٗ عَلٰی ذٰلِکَ الظِّلِّ–

অর্থাৎ হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রসুলে পাকের দরবারে আরয করলেন, মহামহিম আল্লাহ আপনার ছায়া যমীনে পড়তে দেননি, যাতে সেটার উপর কোন মানুষের পা পড়ে না যার।

চার. হযরত ইমাম সুয়ূত্বী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি তাঁর 'খাইস-ই কুবরা' শরীফে ইবনে সুব'ই থেকে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ اِبْنَ سُبُعٍ مِنْ خَصَآئِصِہٖ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اَنَّ ظِلَّہٗ کَانَ لَایَقَعُ عَلَی الْاَرْضِ لِاَنَّہٗ نُوْرًا–اِذَا مَشٰی فِی الشَّمْسِ اَوِ الْقَمَرِ لَا یُنْظَرُ لَہٗ ظِلٌّ–

অর্থাৎ ইবনে সুব'ই বলেছেন, এটাও হুযূর পুরনূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লা-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে, তাঁর ছায়া যমীনে পড়তো না; কেননা তিনি নূর ছিলেন। সূর্য ও চন্দ্রের আলোতে তিনি যখন চলতেন তখন তাঁর ছায়া দেখা যেতো না।

কোন কোন ইমাম বলেছেন, এঘটনার পক্ষে হুযূর-ই করীমের ওই হাদীস শরীফ সাক্ষী, যাতে হুযূর-ই আকরামের এ দো'আ উদ্ধৃত হয়েছে-فَاجْعَلْنِیْ نُوْرًا (হুযূর-ই আকরাম দো'আ করতেন) হে আল্লাহ! আমাকে 'নূর' করে দাও।'' (হুযূর-ই আকরামের দো'আ নিঃসন্দেতেহ কবূল)।

এচারটি হাদীস শরীফ ছাড়াও নিম্নে কতিপয় বিশ্ববিখ্যাত ইমামের উদ্ধৃতিও পেশ করা হচ্ছে-

এক. ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূত্বী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি তাঁর ' আনমূযাজুল লাবীব'-এ বলেছেন-

لَمْ یَقَعْ ظِلُّہٗ عَلَی الْاَرْضِ وَلَا یُرٰی لَہٗ ظِلٌّ فِی شَمْسٍ وَلَا قَمَرٍقَالَ اِبْنُ سُبُعٍ لِاَنَّہٗ کَانَ نُوْرًا وَقَالَ رَزِیْنٌ فَغَلَبَہٗ اَنْوَارُہٗ–

অর্থাৎ হুযূর-ই পুরনূরের ছায়া যমীনের উপর পড়তো না। সূর্য ও চন্দ্রের আলোতেও তাঁর ছায়া নজরে পড়তো না। ইবনে সুব'ই এর কারণ বর্ণনা করেন-হুযূর নূর ছিলেন। আর রাযীন বলেছেন, হুযূরের নূর সবার চেয়ে বেশী সতেজ ছিলো ।

দুই. ইমামুয্ যামান ক্বাযী আয়ায রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেছেন-

وَمَا ذُکِرَ مِنْ اَنَّہٗ لَا ظِلَّ لِشَخْصِہٖ فِی شَمْسٍ وَلَا قَمَرٍ لِاَنَّہٗ کَانَ نُوْرًا وَاِنَّ

الذُّبَابَ کَانَ لَا یَقَعُ عَلٰی جَسَدِہٖ وَلَاثِیَابِہٖ–

অর্থাৎঃ এযে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সূর্য ও চন্দ্রের আলোতে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শরীর মুবারকের ছায়া পড়তো না- সেটার কারণ হচ্ছে হুযূর 'নূর' ছিলেন। তা'ছাড়া তাঁর শরীর মুবারক ও কাপড় মুবারকের উপর মাছি বসতো না। [সূত্র: শেফা শরীফ, কৃত কাযী আয়ায, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪২-৪৩]

তদুপরি আল্লামা শেহাব উদ্দীন খাফ্ফাজী 'নসীমুর বিয়ায'-এ ইমাম ক্বাস্তলানী 'মাওয়াহিব-ই লাদুন্নিয়া,' আল্লামা হোসাইন ইবনে মুহাম্মদ ফিয়ার বকরী 'কিতাবুল খামীস'-এ আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী 'আফদ্বালুল ক্বোরায়ি,' আল্লামা সুলায়মান জুমাল 'ফুতূহাত-ই আহমদিয়া'তে,শায়খ মুহাক্কিক্ব দেহলভী 'মাদারিজুন্নুবূয়াত'-এ এবং ইমাম-ই রাব্বানী মুজাদ্দিদে আলফে সানী তাঁর 'মাকতূবাত শরীফ' ৩য় খণ্ডে - এমর্মে অকাট্যভাবে বলেছেন যে, হুযূর-ই আকরামের ছায়া ছিলো না। বিস্তারিত জানার জন্য আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী কৃত 'ক্বামারুত্ তামাম ফী নাফয়িয্ যিল্লি 'আন সাইয়্যেদিল আনাম' পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'রহমতে আলম' (বিশ্বের সবার জন্য রহমত)

আল্লাহ্ তা'আলার 'রাবূবিয়াত' (প্রতিপালক হওয়া) বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণুকে ঘিরে আছে; বিশ্বে এমন কোন বস্তু নেই, আল্লাহ্ তা'আলা যার রব নন। আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই ঘোষণা করেছেন- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই যিনি সমস্ত বিশ্বের রব। [সূরা ফাতিহা, আয়াত-১]

আবার আল্লাহ্ তা'আলারই ঘোষণা অনুসারে তাঁর প্রিয়তম হাবীব হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওই সমস্ত বিশ্বের জন্য রহমত। যেমন, এরশাদ হয়েছে- وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ (হে হাবীব! আমি আপনাকে সমস্ত জাহানের জন্য রহমত করেই প্রেরণ করেছি।

[সূরা আম্বিয়া]

সুতরাং আমাদের আক্বা (মুনিব) সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যে এ দুনিয়ার জন্যও রহমত, পরজগতের জন্যও রহমত, তা সন্দেহাতীতভাবে স্পষ্ট হলো। একইভাবে, বিশ্বনবী আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর ইহকালীন হায়াত মুবারক (বরকতময় জীবদ্দশা)ও রহমত, ওফাত শরীফ এবং তাঁর ওফাতোত্তর হায়াত (হায়াতুন্নবী)ও রহমত। তিনি নিজেই ঘোষণা করেছেন, حَيَاتِىْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَمَمَاتِىْ خَيْرٌ لَّكُمْ (আমার হায়াতও তোমাদের জন্য কল্যাণ কর, আমার ওফাতও তোমাদের জন্য কল্যাণকর। [শেফা শরীফ, ১ম খণ্ড, পৃ.১০]

এমনিতে প্রত্যেক নবী আপন উম্মতের জন্য রহমত; কিন্তু আল্লাহর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং রহমতই। আল্লামা নাবহানী আলায়হির রাহমাহ্ লিখেছেন, قَالَ بَعْضُ الْعَارِفِيْنَ اَلْاَنْبِيَآءُ خُلِقُوْا كُلُّهُمْ مِنَ الرَّحْمَةِ وَنَبِيُّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَيْنُ الرَّحْمَةِ (অর্থাৎ কোন আরিফ বান্দা বলেছেন, সমস্ত নবী রহমত থেকে পয়দা হয়েছেন, কিন্তু আমাদের প্রিয় নবী স্বয়ং রহমতই।) [আন্ওয়ার-ই মুহাম্মাদিয়াহ, পৃ.৩৭১]

এক. মু'মিনদের জন্য রহমত

মু'মিনদের জন্য হুযূর-ই আক্রামের রহমত হচ্ছে হুযূর-ই আক্রামের মাধ্যমে মু'মিন বান্দা ইসলাম পেয়েছে, হিদায়ত (পথ-নির্দেশ) পেয়েছে, জান্নাত পাবে। অন্যথায় হুযূর-ই আক্রামের শুভাগমনের পূর্বে মু'মিনগণও দোযখের নিকটে ছিলো। যেমন, খোদ্ ক্বোরআন-ই করীম ঘোষণা করছে- وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا (তোমরা দোযখের গহবরের কিনারায় ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তা থেকে বের করে এনেছেন।)

দুই. আপন গোলামদের জন্য রহমত

হুযূর-ই আক্রাম শিশু, দুর্বল, খাদিম ও গোলামদের প্রত্যেক বৈধ দরখাস্ত মঞ্জুর করতেন। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেছেন- হুযূর-ই আক্রাম যখন ফজরের নামায পড়ে নিতেন, তখন মদীনার গোলামগণ পানির পাত্র নিয়ে আসতেন এবং সেগুলো তাঁর সামনে পেশ করতেন। তিনি তখন আপন হাত মুবারক তাতে চুবিয়ে নিতেন (বরকতের জন্য)। কখনো কখনো তো তাঁরা প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মৌসুমেও পানির পাত্র নিয়ে আসতেন। তখন হুযূর তাতেও আপন হাত মুবারক চুবিয়ে নিতেন। [মিশকাত শরীফ, পৃ.৫১৯]

তিন. দুর্বল বিবেক সম্পন্নের আবেদন পূরণ

নিশ্চয় এক মহিলা দুর্বল বিবেক সম্পন্ন ছিলো। মহিলাটা এসে আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার কিছু কাজ আছে, যা আমি আপনার মাধ্যমে সমাধা করতে চাই। হুযূর-ই আন্ওয়ার এরশাদ করলেন, হে অমুকের মা! তুমি কোন্ গলিতে নিয়ে যেতে চাও, যাতে আমি সেখানে গিয়ে তোমার কাজ সমাধা করে দিই! সুতরাং তিনি তার সাথে এক দুর্গম পথে হেঁটে গিয়ে তার কাজটা সম্পন্ন করে দেন। [মুসলিম ও মিশকাত শরীফ, পৃ.৫১৯]

চার. আপন খাদিমের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত স্নেহশীল

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, আমি দীর্ঘ দশ বছর যাবৎ হুযূর-ই আক্রামের খিদমত করেছি। তিনি কখনো এমন কোন জিনিষের জন্যও আমাকে তিরস্কার পর্যন্ত করেন নি; যা আমার হাতে বিনষ্ট হয়ে যেতো। যদি তাঁর ঘর মুবারকের কেউ আমাকে এজন্য তিরস্কার করতে চাইতেন, তখন তিনি বলতেন, তাকে ছেড়ে দাও। কেননা, যা অদৃষ্টে লিপিবদ্ধ, তাই ঘটে থাকে। [মিশকাত শরীফ, পৃ. ৫১৯]

পাঁচ. মুনাফিক্বদের জন্যও রহমত

হুযূর-ই আক্রাম মুনাফিকদের জন্যও রহমত ছিলেন, তাঁর দয়ায় মুনাফিক্বদের প্রাণ কতল থেকে রক্ষা পেয়েছিলো, তাদের সম্পদও রক্ষা পেয়েছিলো।

ছয়. কাফিরদের জন্যও হুযূর-ই আক্রাম রহমত

হুযূর আপাদমস্তক শরীফ নূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কাফিরদের জন্যও রহমত। কারণ, হুযূর-ই আক্রামের কারণে তাদের আকৃতিগুলো বিকৃত হয়না; যেমনিভাবে পূর্ববর্তী উম্মতের আকৃতিগুলো বিকৃত হয়ে যেতো। তাছাড়া, তাদের শাস্তিও বিলম্বিত হয়ে গেছে। পূর্ববর্তী উম্মতগণ কোন অবৈধ কাজ করতেই তাদের উপর তাৎক্ষণিকভাবে আযাব নাযিল হতো। কিন্তু হুযূর-ই আক্রামের রহমতের কারণে এখন কাফিরদের উপর ওই শাস্তি বিলম্বিত হয়ে গেছে। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমাচ্ছেন- وَمَا كَانَ اللّٰهُ

لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ (আল্লাহ্‌র শান এ নয় যে, তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন, অথচ আপনি তাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন।) যখন কাফিরগণ হুযূর-ই আক্‌রামকে কষ্ট দিতো তখন সাহাবা-ই কেরাম আরয করতেন, "হে আল্লাহর রসূল! আপনি তাদের শাস্তির জন্য দো'আ করুন!" তদুত্তরে হুযূর-ই আক্‌রাম এরশাদ করতেন- اِنِّىْ لَمْ اُبْعَثْ لَعَّانًا وَاِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً (নিশ্চয় আমি লা'নত-অভিসম্পাতকারী হিসেবে প্রেরিত হইনি, বরং আমাকে 'রহমত' বানিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।) [মুসলিম শরীফ ও মিশ্‌কাত শরীফ, পৃ. ৫১৯]

সাত. ফিরিশতাদের জন্য রহমত

হুযূর-ই আক্‌রাম যখন মি'রাজ শরীফে তাশরীফ নিয়ে যান, তখন ফিরিশ্‌তাগণ হুযূরের নিকট থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও রহস্যজ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তাছাড়া, তাঁর উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করার বরকতে আল্লাহর রহমতের অবতরণস্থলে পরিণত হয়েছিলেন। [মা'আরিজুন্নুবূয়তের ভূমিকা:পৃ. ১০৭]

আট. হযরত জিব্রাঈলের জন্য রহমত

হুযূর-ই আক্‌রাম একদিন হযরত জিব্রাঈলের উদ্দেশে এরশাদ করলেন, "উভয় জাহানের মহান স্রষ্টা আমাকে সমস্ত বিশ্ব ও বিশ্ববাসীদের জন্য রহমত করে প্রেরণ করেছেন। আমার রহমত দ্বারা তোমার কী উপকার হয়েছে?" তখন হযরত জিব্রাঈল আরয করলেন, "হে আল্লাহর রসূল, আমি আমার শেষ পরিণতি সম্পর্কে ভীত ছিলাম। শয়তানের পরিণতি দেখে আমি আমার পরিণতি নিয়ে চিন্তিত ও সন্ত্রস্ত ছিলাম। যখন আপনার উপর ক্বোরআন নাযিল হলো, আর আমাকে সেটা নাযিল করার জন্য মাধ্যম নিয়োগ করা হলো, তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা আমার সম্পর্কে ক্বোরআন মজীদে এরশাদ করেছেন- ذِىْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَكِيْنٍ مُطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ (ক্ষমাশীল, আরশাধিপতির দরবারে সম্মানিত, তার আনুগত্য করা হয়, ওই স্থানে আমানতদারও।) তখন আমি চিন্তামুক্ত হয়েছি।

[শেফা শরীফ, ১ম খণ্ড: পৃ.১০, মাদারিজুন্নুবূয়ত ১ম খণ্ড: পৃ. ৮০, মুকাদ্দামা-ই মা'আরিজ: পৃ. ১০৭]

নয়. শয়তানের জন্যও রহমত

শয়তান হচ্ছে গোটা সৃষ্টি জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য সৃষ্টি। সেও হুযূর-ই আক্‌রামের রহমত থেকে হিস্‌সা পেয়েছে। তা হচ্ছে সে ফিরিশ্‌তাদের মার থেকে রক্ষা পেয়েছে। বর্ণিত আছে যে, যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা আপন দরবার থেকে অভিশপ্ত ইবলীস শয়তানকে তাড়িয়ে দিলেন, তখন এক ফিরিশ্‌তাকে নির্দেশ দিলেন যেন প্রতিদিন একটি ক্রোধপূর্ণ থাপ্পড় তার মুখের উপর মারতে থাকেন। ওই ফিরিশ্‌তা তা-ই করতে রইলেন। ওই থাপ্পড়ের কারণে শয়তান এমন ব্যাথা ও কষ্ট অনুভব করতো যার প্রভাব পরদিন পর্যন্ত থাকতো। যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা আপন মাহবূব হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা

সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে রিসালতের মসনদে অভিষিক্ত করলেন এবং তাঁর সম্পর্কে আয়াত وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ নাযিল করলেন, তখন অভিশপ্ত শয়তান কেঁদে কেঁদে আরয করলো, "মুনিব! আমিও তো সমস্ত বিশ্বের মধ্যে একজন। আমি কি এ রহমত থেকে কিছু হিস্‌সা পেতে পারি না?" তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা ওই ফিরিশ্‌তাকে নির্দেশ দিলেন- আজ থেকে তাকে থাপ্পড় মেরো না; যাতে সেও আমার হাবীবের রহমত থেকে হিস্‌সা পায়।

[মুক্বাদ্দামা-ই মা'আরিজ; পৃ. ১১০]

এক ব্যক্তি হযরত আল্লামা মুহাক্কিক্ব 'আলাল ইত্বলাক্ব আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হিকে জিজ্ঞাসা করলো, ইবলীস আমাদের আক্বা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফার রহমত থেকে কী হিস্‌সা পেয়েছে? তিনি বললেন, "হুযূর-ই আক্‌রামের সত্যতা ও হিদায়ত এ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন- جَآ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ (সত্য সমাগত, বাতিল অপসৃত।) অর্থাৎ হুযূর-ই আক্‌রাম-এর মতো পরম সত্যের শুভাগমনের ফলে সব বাতিল, মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া নিশ্চিত। এ অনুসারে ইবলীস সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া অনিবার্য ছিলো। কিন্তু সে নিশ্চিহ্ন না হওয়া, এখনো জীবিত ও অস্তিত্বে থাকা একমাত্র রহমতে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এরই প্রভাব। [মাদারিজুন্নবূয়ত: পৃ.৮০]

জিনেরাও হুযূর-ই আক্‌রামের আহ্বানে সাড়া দিয়ে পবিত্র ক্বোরআন শুনে ও মেনে নিয়ে ধন্য হয়েছে। তারাও ঈমান ও খোদা পরিচিতি লাভ করে সফলতা পেয়েছে; সঠিক পথের দিশা লাভ করেছে। [মুক্বাদ্দামা-ই মা'আরিজ]

এগার. পৃথিবী ও এর স্তরগুলোর জন্যও রহমত

পৃথিবী হুযূর-ই আক্‌রামের রহমত দ্বারা এ উপকার লাভ করেছে যে, সেটা একচেটিয়ে কুফর ও শির্ক থেকে পবিত্র হয়েছে এবং সেটার উপর আল্লাহ্‌ পরিচিতির নূরের (নূর-ই ইরফান)' ছড়াছড়ি রয়েছে। মসজিদসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আযান হতে থাকে। আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের নাম এ পৃথিবী পৃষ্ঠে ধ্বনিত হতে থাকে। জলভাগ গযবের তুফান থেকে নিরাপদ হয়েছে, বায়ূপ্রবাহ্‌ শয়তানের পথ হওয়া থেকে মুক্ত হয়েছে এবং কাফিরদের ধ্বংসের জন্য প্রচণ্ড মাধ্যম হওয়া থেকে মুক্তি পেয়েছে, আগুন এখন (আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার চিহ্ন হিসেবে) সাদ্‌ক্বাহ্‌গুলোকে জ্বালায় না; হুযূর-ই আক্‌রাম দুনিয়ায় তাশরীফ আনার পর থেকে আসমান শয়তানের আনাগোনা থেকে পবিত্র হয়েছে। এমনকি শয়তান আসমানের কিনারায় পৌঁছে কথাবার্তা চুরি করার সুযোগও পায় না। হুযূর-ই আক্‌রামের তাশরীফ আনয়নের ফলে পশু-পাখীরা পর্যন্ত উপকৃত হয়েছে। হুযূর-ই আক্‌রামের পবিত্র বেলাদতের পূর্বে পৃথিবীতে অনাবৃষ্টি ও

মারাত্মক দুর্ভিক্ষ বিরাজিত ছিলো; সমগ্র বিশ্বে ফল-ফুল, ঘাস পর্যন্ত শুকে গিয়েছিলো। সমস্ত সৃষ্টির জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়েছিলো। হুযূর-ই আক্‌রামের বেলাদত শরীফের বরকতে, রহমতের বৃষ্টি হয়েছিলো, দূর্ভিক্ষ দূরীভূত হয়েছিলো, গাছ পালা সজীব হয়ে গিয়েছিলো। জঙ্গলেও মঙ্গল হলো। পৃথিবী ধ্বংসে হাত থেকে নিরাপদ হয়ে গেলো।[মা'আরিজুন্নবূয়তের মুক্বাদ্দামা, পৃ.১১০]

এমনকি হুযূর-ই আক্‌রামের জন্য জিহাদের অনুমতি অবতীর্ণ হওয়ার ফলে কাফির তথা খোদাদ্রোহীদের দাপটকে চুরমার করার সুযোগ হলো। আল্লাহর কলেমাকে সমুন্নত করার ব্যবস্থা হলো। সুতরাং হুযূরের জিহাদনীতি ও শাসনের ক্ষেত্রে দুষ্টদের দমন এবং অপরাধীদের শাস্তি প্রদানও বিশ্ববাসীর জন্য রহমত। আল্লাহ্ আমাদেরকে আল্লাহর এ বিশেষ রহমতের মধ্যে স্থায়ী রাখুন! আমীন।

----o----

খত্‌মে নুবূয়তের উজ্জ্বল নিদর্শন 'মোহরে নুবূয়ত'

বিশ্বনবী হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'খাতামুন্নবিয়্যীন' বা সর্বশেষ নবী হওয়া নিশ্চিত ও অকাট্য। ক্বোরআনের আয়াতও এ প্রসঙ্গে এরশাদ হয়েছে আর 'সিহাহ'র বহু সংখ্যক হাদীস, যেগুলো 'মুতাওয়াতির' পর্যায়ে পৌঁছেছে, দ্বারা প্রমাণিত যে, হুযূর-ই আক্‌রাম সর্বশেষ নবী। তাঁর পরে কেউ নবী হবে না। যে কেউ হুযূর-ই আক্‌রামের নুবূয়তের পর অন্য কেউ নুবূয়ত পাওয়া সম্ভব বলে জানে, সে 'খতমে নুবূয়ত'কে অস্বীকার করে এবং কাফির ও ইসলাম বহির্ভূত।

[তাফসীর-ই খাযাইনুল ইরফান, সূরা আহযাব-আয়াত-৪০নং এর তাফসীর দ্রষ্টাব্য]

তদুপরি, হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর স্কন্ধযুগলের মধ্যখানে 'মোহরে নুবূয়ত' ছিলো। এটাও হুযূর-ই আক্‌রামের খতমে নুবূয়তের একটি উজ্জ্বল প্রমাণ। পবিত্র ক্বোরআনের সূরা আযহাবের আয়াত وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ -এর 'খাতাম' শব্দেও এ মোহরে নুবূয়তের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। সুতরাং 'খাতাম' শব্দের বিশ্লেষণ করলে এ বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে।

খাতাম শব্দের বিশ্লেষণ

خاتم (খাতাম) শব্দটি দু'ভাবে পড়া হয়েছে- **ت** -তে 'যবর' সহকারে, অর্থাৎ **خَاتَمٌ** (খাতামুন) আর '**ت**' অক্ষরে 'যের' সহকারে অর্থাৎ **خَاتِمٌ** (খাতিমুন)। **خاتم** ও **خاتِم** (খাতাম ও খাতিম) উভয় শব্দের মূল হচ্ছে **خَتْمٌ**; যার অর্থ হয়- খতম করা ও মোহর লাগানো। অর্থাৎ কোন জিনিসকে এভাবে বন্ধ করা, যাতে ভিতরের জিনিস বাইরে আসতে না পারে এবং বাইরের কোন জিনিস ও ভিতরে যেতে না

পারে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমান- خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ [আল্লাহ্ তা'আলা তাদের (কাফিরদের) হৃদয়গুলোর উপর মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন]; ফলে তাদের কুফর ভিতরে বন্দি হয়ে গেছে। এখন ভিতর থেকে বাইরে আসতে পারে না। আর বাইরে থেকেও কোন হিদায়ত ভিতরে যেতে পারে না।

অনুরূপ, আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমান, يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ অর্থাৎ জান্নাতবাসীদেরকে যেই পানীয় পান করানো হবে, তার পাত্রের মুখে মোহর করা হবে। ফলে ভিতরের খুশ্‌বু ও সূক্ষ্মতা বাইরে আসতে পারবে না। আর বাইরে থেকেও কোন জিনিস সেটার ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে না; যার কারণে ওই পানীয়ের সুক্ষ্মতা হ্রাস পাবে না। দিওয়ান-ই মুতানাব্বাতেও একই বিষয়বস্তুর উপর উল্লেখ করা হয়েছে-

اَرُوْحُ وَقَدْ خَتَمْتَ عَلٰى فُؤَادِىْ بِحُبِّكَ اَنْ يَحُلَّ بِهٖ سِوَاكَ

অর্থাৎ আমি এমতাবস্থায় চলফেরা করি যে, তুমি আমার হৃদয়ের উপর তোমার ভালবাসার এমন মোহর ছেপে দিয়েছো যে, ভিতর থেকে তোমার ভালবাসা বের হতে পারছে না। আর বাইরে থেকেও অন্য কারো ভালবাসা প্রবেশ করতে পারছে না।

সুতরাং আয়াত শরীফে বর্ণিত '**خاتم**' শব্দটিকে যদি **خاتِم** (খাতিম) পড়া হয়, তবে অর্থ দাঁড়াবে- হুযূর-ই পুরনূর, শাফি'ই ইয়াউমিন্‌নুশূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর অস্তিত্ব মুবারক নবীগণ আলায়হিমুস্ সালাম-এর আগমনের ধারাকে সমাপ্তকারী। আর যদি **خاتم** (খাতাম) যবর সহকারে পড়া হয়, তবে অর্থ হবে সাইয়্যেদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নবীগণের মোহর। সুতরাং অন্য কেউ নবীগণের এ পরম্পরায় প্রবেশই করতে পারবে না। আর যেসব নবী আলায়হিমুস্ সালাম তাঁর পূর্বে নুবূয়তের সিল্‌সিলাহ্ বা পরম্পরায় প্রবেশ করেছেন, তাঁরা এ পরম্পরা থেকে বের হতে পারবেন না।

মোটকথা, সাইয়্যেদুল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পর কোন নতুন নবী আসবে না।

এখন দেখুন, বাস্তবিকপক্ষেও নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দু' স্কন্ধ মুবারকের মধ্যবর্তী স্থানে 'মোহরে নুবূয়ত' শোভা পেতো। এ প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ কিতাব 'মাদারিজুন্নুবূয়ত': ১ম খণ্ডে উল্লেখ করা হয়েছে- নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দু' স্কন্ধের মধ্যবর্তী স্থানে মোহরে নুবূয়ত ছিলো। তিনি নবূয়তের ধারা সমাপ্তকারী ছিলেন। 'মোহরে নুবূয়ত' ছিলো ইষৎ উঁচু মাংস বিশেষ, যা হুযূর-ই করীমের শরীর মুবারকের বর্ণের মতোই ছিলো; অর্থাৎ স্বচ্ছ ও নূরানী। উক্ত মাংসপিণ্ডকেই 'মোহরে নুবূয়ত' বা 'খতমে নুবূয়ত' বলা হয়।

'খাতিম' শব্দটির 'তা' বর্ণে 'যের' দিয়ে পড়লে তা **اسم فاعل** (কর্তৃবাচ্য) হয়।

তার অর্থ হচ্ছে কোন কিছুর শেষ প্রান্তে পৌঁছে তার পূর্ণতা সাধনকারী। আর যদি 'খাতাম' শব্দটির 'তা' বর্ণে 'যবর' দিয়ে পড়া হয়, তখন অর্থ হবে 'মোহর বা আংটি'। সার্বিকভাবে خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ-এর অর্থ দাঁড়ায় তাঁর পর আর কোন নবীর আবির্ভাব হবে না। সর্বশেষ নবী যে তিনিই, তার প্রমাণ হচ্ছে 'মোহরে নুবূয়ত'। 'খাতামুন্নবিয়্যীন' হিসেবে তাঁকে আখ্যায়িত করার কারণ এ যে, পূর্ববর্তী বিভিন্ন আসমানী কিতাবে তাঁর পরিচিতি এভাবেই প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং 'মোহরে নুবূয়ত' এমন নিদর্শন, যা দেখে মানুষ বুঝে নিতে পারে যে, তিনিই ওই আখেরী যামানার নবী যাঁর সম্পর্কে পূর্বে সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছিলো।

'মোহরে নুবূয়ত' আল্লাহ্ তা'আলার মহান নিদর্শনাবলীর অন্যতম নিদর্শন, যা দ্বারা হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বিশেষায়িত করা হয়েছে। ইমাম হাকিম স্বীয় 'মুস্তাদেরক'-এ হযরত ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণনা করেছেন, জগতে যতো নবী-রাসূল আবির্ভূত হয়েছেন সকলেরই ডান হাতে 'নুবূয়তের আলামত' বিদ্যমান ছিলো, কিন্তু আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর 'নুবূয়তের আলামত' তাঁর স্কন্ধযুগলের মধ্যবর্তী স্থানে ছিলো। এ সম্পর্কে জনৈক কবি অতি সুন্দরই বলেছেন-

نبوت راتواں آں نامہ در مشت - کہ از تعظیم دارد مہر بر پشت

অর্থাৎ অন্য নবীগণের (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর নুবূয়তের নিদর্শন ডান হাতের মুঠোয় ছিলো। আর নবীকুল সরদার সর্বশেষ নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মানার্থে তাঁর নুবূয়তের নিদর্শন শোভা পেতো তাঁর পৃষ্ঠ মুবারকে।

হযরত শায়খ ইবনে হাজর মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি 'শরহে মিশ্কাত'-এ লিখেছেন, হুযূর-ই আক্রামের 'মোহর-ই নুবূয়ত'-এ লিপিবদ্ধ ছিলো-

اَللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ - تَوَجَّهْ حَيْثُ كُنْتَ فَاِنَّكَ مَنْصُوْرٌ

অর্থাৎ আল্লাহ্ অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই, আপনি যেভাবেই থাকুন না কেন, আপনি মনোনিবেশ করুন! আপনি অবশ্যই বিজয়ী।

বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায়, 'মোহরে নুবূয়ত' নূরানী ছিলো, যা চমকিত ছিলো। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, তাঁর ওফাত শরীফের পর উক্ত 'মোহরে নুবূয়ত' গুপ্ত হয়ে গিয়েছিলো; এ আলামত থেকে বুঝা গেলো যে, তাঁর ওফাত হয়েছে। যেহেতু নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাত শরীফের পর মানুষের মধ্যে এ নিয়ে সংশয় ও মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছিলো যে, আসলে তাঁর ওফাত হয়েছিলো কিনা। 'মোহরে নবুয়ূত' অদৃশ্য হওয়া ছিলো তাঁর ওফাত

শরীফের প্রমাণ। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে এ মতটি শুদ্ধ বলে মনে হয় না। কারণ, তাঁর ওফাতের পরেও তো তাঁর নুবূয়তের বিধান বিদ্যমান। ওফাতের মাধ্যমে নবীর নুবূয়ত ও রিসালত সমাপ্ত হয় না; বরং বিদ্যমান থাকে। 'মোহরে নুবূয়ত' অদৃশ্য হওয়ার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার কি খাস ভেদ নিহিত রয়েছে, তা কেবল আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন।

অধিকাংশ বর্ণনায় আছে, দু' স্কন্ধ মুবারকের মধ্যবর্তী স্থানে 'মোহরে নুবূয়ত' ছিলো। আবার কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, 'মোহরে নুবূয়ত' ছিলো বাম কাঁধের নরম মাংসপিণ্ডের কাছে।

আল্লামা তাওরিশ্তী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেন, দু' রকম বর্ণনার মধ্যে মূলতঃ কোন বৈপরিত্য নেই। কেননা, 'দু' স্কন্ধ মুবারকের মধ্যবর্তী' কথাটার অর্থ এ নয় যে, ঠিক মধ্যবর্তী স্থানে। বাম কাঁধের দিকে হলেও তা দু' কাঁধের মধ্যবর্তীতে ধরা হবে। যে বর্ণনায় ডান কাঁধের পাশে ছিলো বলে উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানেও এরূপ সমাধানই প্রযোজ্য হবে। আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞাতা।

মোহরে নবুয়তের আকৃতি

বর্ণনাকারীগণ 'মোহরে নুবূয়ত'-এর আকার আকৃতিও বর্ণনা করেছেন। অপরকে বুঝানোর জন্য এর উপমা উদাহরণও পেশ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, তা কবুতরের ডিমের ন্যায় সাদা ছিলো। আবার কেউ কেউ বলেছেন, রক্তিম মাংস পিণ্ডের ন্যায় ছিলো। 'সোরাহ্' অভিধান গ্রন্থে লিখা হয়েছে যে, **غُدَّةٌ** (গুদ্দাহ্), যার বহুবচন **غُدُود** (গুদূদ)-এর অর্থ হচ্ছে গোশতের শক্তগ্রন্থি। হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর 'মোহরে নুবূয়ত'-এর 'গুদ্দাহ্'র ন্যায় ছিলো। এর অর্থ হচ্ছে তাতে লাল বর্ণের প্রাধান্য ছিলো। সুতরাং হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর 'মোহরে নুবূয়ত' তাঁর দেহ মুবারকের বর্ণের মতো ছিলো বলে যে বর্ণনা করা হয়েছে তা এর পরিপন্থী নয়। কারণ, এরূপ বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে- যারা বলে 'মোহরে নুবূয়ত'-রং কালো বা নীল ছিলো তাদের বক্তব্যকে খণ্ডন করা। যেমন, ইবনে হাজর মক্কী স্বীয় পুস্তক 'শরহে শামাইল'-এ উল্লেখ করেছেন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে- 'মোহরে নুবূয়ত' ছিলো 'যিররে হাজালাহ্'র মতো; অর্থাৎ 'ঝালরের গুণ্ডী'র ন্যায়। 'যির' শব্দের অর্থ হচ্ছে গুণ্ডি, আর 'হাজালাহ্' মানে ওই স্থান, যেখানে ঝালর দিয়ে সাজিয়ে নব বিবাহিতা বধূকে বসানো হয়। 'হাজালাহ্' শব্দের বহুবচন হচ্ছে 'হিজাল' (**حجال**)। জমহুর বা অধিকাংশ বিজ্ঞ ওলামা এরূপ বলেছেন।

আবার কেউ কেউ 'হাজালাহ'র অর্থ বলেছেন, 'এক প্রকারের পাখী' আর 'যির্'

মানে ‘পাখীর ডিম’। অর্থাৎ তাঁদের মতে ‘মোহর-ই নবূয়ত’ ছিলো ‘হাজালাহ্’ নামক পাখীর ডিমের মতো। যে হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে, ‘মোহরে নুবূয়ত’ ছিলো ‘কবুতরের ডিমের মতো’, এ মতটি উক্ত হাদীস শরীফের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কিন্তু ‘যির্’ শব্দের অর্থ অভিধানে ‘ডিম’ আসেনি। অবশ্য, কোন কোন বর্ণনায় رزايت, ‘রা’ বর্ণটা ‘যা’ বর্ণের পূর্বে এসেছে। তা যদি হয়, তবে এর অর্থ ডিম। তিরমিযী শরীফের এক বর্ণনায় এসেছে- ‘মোহরে নুবূয়ত’ ছিলো একখানা মাংসপিণ্ড। আবার অন্য এক বর্ণনায় এসেছে **مشت** বা এক মুষ্ঠির ন্যায়; যার মধ্যে ‘সাআ-লীল’ (ثاليل)-এর মতো তিলক বিদ্যমান ছিলো। ‘সাআ-লীল’ বলা হয় ওইসব দানাকে যেগুলো চামড়ার নিচে সৃষ্টি হয়।

মোটকথা, এসব বর্ণনা হচ্ছে ‘মোহরে নুবূয়ত-এর বাহ্যিক আকৃতি ও ধরণ সম্পর্কিত। তবে এর অন্তরালে রয়েছে আল্লাহ্ তা‘আলার মহান কুদরতের এক অবর্ণনীয় রহস্য ভাণ্ডার; যা কেবলই হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর জন্যই খাস বা নির্দ্ধারিত ছিলো। অন্য কোন নবীর জন্য এমনটি ছিলো না। আল্লাহ্ তা‘আলাই সর্বাধিক জ্ঞাতা। [মাদারিজুন্নুবূয়তঃ ১ম খণ্ড]

হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর রিসালত সার্বজনীন

আল্লাহ্ তা‘আলা হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে নিখিল বিশ্বের সমগ্র জিন্ ইনসান তথা সমস্ত মাখলূকাতের জন্যই প্রেরণ করেছেন। তাঁর রিসালতকে শুধু মানবজাতির জন্য সীমাবদ্ধ করেননি; বরং আল্লাহ্ তা‘আলার রাবূবিয়াত যেমন সমস্ত বিশ্বকে বেষ্টন করে নিয়েছে, তেমনি তাঁর রিসালতকেও আল্লাহ্ তা‘আলা সমস্ত বিশ্বকে পরিব্যাপ্ত করেছেন। সমগ্র বিশ্বের মধ্যে যার জন্য মহান আল্লাহ্ রব, তার জন্য বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম রহমত। আল্লাহ্ হলেন রাব্বুল আলামীন আর তাঁর হাবীব হলেন রাহমাতুল্লিল আলামীন।

বিশ্বনবী আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর রিসালতের ব্যাপকতা সম্পর্কে ‘মাওয়াহিব-ই লাদুন্নিয়াহ’-এর প্রণেতা লিখেছেন যে, কিছু সংখ্যক বিজ্ঞ আলিম বলেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর রিসালতের পরিধি ফিরিশ্‌তাকুল পর্যন্ত ব্যাপৃত। তাঁরা তাঁদের এ মতের পক্ষে ক্বোরআন-ই করীমের এ আয়াত শরীফকে প্রমাণ স্বরূপ উপস্থাপন করে থাকেন- অর্থাৎ রসূলে পাককে প্রেরণ করা হয়েছে সমস্ত জগদ্বাসীকে ভীতি প্রদর্শনের জন্য। এখানে ‘আলামীন’ শব্দে আক্বল বা বিবেকবান সকলেই সামিল করা হয়েছে। ফিরিশ্‌তাগণ যেহেতু আক্বল বিশিষ্ট সৃষ্টি, সেহেতু তাঁদের বেলায়ও রসূলে পাকের রিসালত প্রযোজ্য। উক্ত মতে সপক্ষে হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস শরীফ প্রনিধানযোগ্য। তিনি বর্ণনা করেন, হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-অর্থাৎ আমাকে সমস্ত মাখলূকের প্রতি রসূল হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে।

এ আয়াতের হুকুম সম্পর্কে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মত হচ্ছে- এটা আম। এতে ইনসান, জিন ও ফিরিশতা সবাই সামিল। এ সম্পর্কে অভিশপ্ত ইহুদীরা একটি বদ আক্বীদা প্রচার করার অপপ্রয়াস চালিয়েছিলো যে, নবী করীম নাকি কতিপয় মানুষের নবী। তাঁর রিসালত নাকি শুধু আরবদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ইত্যাদি। এ বদ-আক্বীদাগুলোর খণ্ডন হয় এ আয়াত শরীফ দ্বারা অর্থাৎ (হে আমার হাবীব, আপনি বলেদিন) হে মানবকুল, আমি নিঃসন্দেহে তোমাদের সকলের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। এ প্রসঙ্গে মুহাক্বিক্বিক্ব আলাল ইত্বলাক্ব হযরত আবদুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলভী আলায়হির রাহমাহ্ তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব

'মাদারিজুন্নুবূয়ত'-এ লিখেছেন, অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন কোন কোন মুহাক্কিক্কিক্ব বলেছেন যে, হুযূর-ই আক্রাম হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শুভ আবির্ভাব জগতের সমস্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশের সাথেও সম্পৃক্ত। যাদের মধ্যে প্রাণীকুল, উদ্ভিদরাজি ও জড়পদার্থও সামিল। তবে তাদের মধ্যে যারা বিবেক বিশিষ্ট তাদের প্রতি তাঁর রিসালতের বিধানাবলী প্রয়োগ করা হয়েছে- তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া' দায়িত্বশীল করা, শুভ সংবাদ প্রদান ও গযবে ইলাহীর ভয় প্রদর্শনের নিমিত্তে। আর প্রাণীকুল ও জড় পদার্থগুলোর প্রতি তিনি প্রেরিত হয়েছেন তার পূর্ণতার ফয়য পৌঁছানোর জন্য। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন- অর্থাৎ আমি আপনাকে সমস্ত জগতের জন্য রহমত করেই প্রেরণ করেছি। সুতরাং জড় পদার্থ হুযূর-ই পাককে সালাম করেছে। 'আস্সালামু আলায়কা এয়া রাসূলাল্লাহ্' (হে আল্লাহর রসূল, আপনাকে সালাম) বলেছে। এটা তাদের পক্ষ থেকে তাঁর রিসালতের স্বীকারুক্তি।

যদি কেউ প্রশ্ন করে- আদেশ, নিষেধ, সুসংবাদ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শন হচ্ছে রিসালতের কাজ। ফিরিশ্তাদের বেলায় এগুলো কখন সংঘটিত বা সম্পন্ন হয়েছে? এ প্রশ্নের জগত 'মাওয়াহিব-ই লাদুন্নিয়া'য় এভাবে দেওয়া হয়েছে যে, হয়তো এ দাওয়াত মি'রাজ রজনীতে সম্পন্ন হয়েছে, যদিও এ রজনীর জন্য সেটা নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই; বরং সব সময়ই তা সম্পন্ন হবার সম্ভাবনা ছিলো। কেননা, হুযূর-ই আক্রামের পবিত্র দরবারে অধিকাংশ সময় ফিরিশতাদের আগমন ঘটতো, যেমনিভাবে জিন্ জাতি হুযূর-ই পাকের পবিত্র দরবারে আগমন করতো। তিনি তাদেরকে দ্বীনের দাওয়াত প্রদান করতেন। জিনদেরকে দাওয়াত দেওয়ার প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে; কিন্তু ফিরিশ্তাদের ব্যাপারে তার উল্লেখ নেই। এর কারণ হচ্ছে জিনদের ক্ষেত্রে অবাধ্যতা ও ফ্যাসাদের তৎপরতা ছিলো; পক্ষান্তরে ফিরিশতাদের বেলায় এমনটির সম্ভাবনা নেই। তাই তাঁদেরকে নিষেধ করা কিংবা ভয় প্রদর্শনের কোন প্রয়োজন হয় না; যেহেতু তাঁরা গুনাহ্ করেন না। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন-(অর্থাৎ তারা আল্লাহর কোন কথা অতিক্রম করে না। আর আল্লাহর নির্দেশ সম্বন্ধে! তারা জানে।)

এ কারণে, 'আলম-ই মালাকূত' (ফিরিশতাজগত) কে 'আলম-ই আমর' (নির্দেশ জগত) বলা হয়। কেননা, সেখানে নিষেধ বা নিষিদ্ধতার কোনরূপ অবকাশ নেই। হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম ছাড়াও অন্যান্য ফিরিশ্তা যে হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পাক দরবারে আসতেন সে সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে 'আক্বাত্তুন্নবী' অধ্যায়ে বর্ণনা এসেছে। বর্ণিত হয়েছে, হুযূর-ই করীমের নিকট একদিন হযরত জিব্রাঈল এসেছেন। তাঁর সাথে

ছিলেন 'ইসমাঈল' নামের এক ফিরিশ্তা। ইসমাঈল-ফিরিশতা এক লক্ষ ফিরিশতার সরদার ছিলেন। এক লক্ষ ফিরিশতার প্রত্যেকেই আবার একেক লক্ষ ফিরিশতার সরদার ছিলেন। তাছাড়া, সূরা ফাতিহার ফযিলত একং সূরা বাক্বারার শেষ আয়াতগুলোর ফযিলত সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, একজন ফিরিশ্তা হাযির হয়েছেন, যাঁর সম্পর্কে হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম বলেছেন, 'এ এমন এক ফিরিশতা, যে আজকের এ দিন ছাড়া পৃথিবীতে আর আগমন করেনি।'' সুবহা-নাল্লাহ। এও বর্নিত হয়েছে যে, হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর রওযা-ই আত্বহারের সম্মানার্থে সকাল-সন্ধ্যায় সত্তর হাজার ফিরিশ্তা আগমন করে থাকেন। সুতরাং যেসব ফিরিশ্তা হুযূর-ই আক্রাম-এর ওফাত শরীফের পর রওযা শরীফে আগমন করে থাকেন, তাঁরা তার জীবদ্দশায় যে আসতেন না তা কেমন করে কল্পনা করা যায়?

[সূত্র. মাদারিজুন্নুবূয়ত: ১ম খণ্ড]

বিভিন্ন বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, জীবজন্তু ও পশুও হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর রিসালতের প্রতি অনুগত ছিলো। তাঁর সামনে ওইগুলো সাজদা করতো, ফরিয়াদ জানাতো, তাঁর রিসালতের পক্ষে সাক্ষ্য দিতো। জঙ্গলের হরিণ তাঁর কলেমা পড়েছিলো। 'ইয়া'ফূর' নামের গাধাতো হুযূর-ই আক্রামের অকৃত্রিম আশেক্বই ছিলো। হযরত ইবনে আসাকির বর্ণনা করেন, যখন হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম খায়বার জয় করলেন, তখন তিনি এক গাধাকে জিজ্ঞাসা করলেন- তোমার নাম কি? সে বললো, ''আমার নাম ইয়াযীদ ইবনে শিহাব। আল্লাহ্ তা'আলা আমার পূর্বপুরুষ থেকে ষাটটি গাধা সৃষ্টি করেছেন। তাদের পিঠে নবী ব্যতীত অন্য কেউ আরোহণ করেনি। আমি আশা করি আপনিও আমার পিঠে আরোহণ করবেন। কেননা আমার ঊর্ধ্বতম পুরুষটির বংশে আমি ব্যতীত আর কেউ অবশিষ্ট নেই। আর নবীগণের মধ্যেও আপনার পরে আর কেউ নবী হবে না।'' গাধাটি আরো বললো, ''ইতোপূর্বে আমি এক ইহুদীর করায়ত্বে ছিলাম। আমি স্বেচ্ছায় তাকে আমার পিঠে আরোহণ করতে দিতাম না। উঠতে চাইলে আমি তাকে ফেলে দিতাম। এ কারণে সে আমাকে ক্ষুধার্ত রাখতো।''

হুযূর-ই আক্বদাস এরশাদ করলেন, ''আজ থেকে তোমার নাম 'ইয়া'ফূর'। এরপর থেকে 'ইয়া'ফুর' সব সময় হুযূর-ই আক্বদাসের দরবারে থাকতো এবং হুযূর-ই আক্বদাসের নির্দেশ পালন করতো। হুযূর-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কখনো তাকে কোন সাহাবীকে ডেকে আনার জন্য প্রেরণ করতেন। তখন সেটা তাঁর ঘরের দরজায় গিয়ে মাথা ঠেকাতে থাকতো। আর ইঙ্গিতে বলতো, ''আপনাকে হুযূর-ই আক্রাম তলব করেছেন।'' ওই সাহাবাও তা বুঝে ফেলতেন এবং পবিত্র দরবারে হাযির হতেন।

যখন হুযূর-ই আক্বদাস এ দুনিয়া থেকে পর্দা করেছেন (ওফাতবরণ করেছেন) তখন ইয়া'ফুর তাঁর বিদায় বিষাদসহ্য করতে পারলো না। আর একটি কূপে লাপিয়ে পড়ে নিজের প্রাণটুকুও বিসর্জন দিয়েদিলো।

[সূত্র. শেফা শরীফ, পৃ. ২০৭, মাদারিজুন্নুবূয়তঃ ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩১]

এমনকি বৃক্ষলতা, পাথররাজিরও হুযূর-ই আক্রাম রসূল ছিলেন। হুযূর-ই আক্রাম তাশরীফ নিয়ে যাবার সময় গাছপালা ও পাহাড়-পর্বত এবং পাথর তাঁকে সালাম করতো। উহুদ পাহাড় তো হুযূর-ই আক্রামকে আপন পৃষ্টদেশে পেয়ে খুশীতে নেচে উঠেছিলো। [সূত্র. মিশকাত শরীফ]

মেঘমালা হুযূর-ই আক্রামকে ছায়া দিতো। বৃক্ষকে ডাকলে সেটা হুযূর-ই আক্রামের তৎক্ষণাৎ আনুগত্য করতো। 'ক্বীসদাহ্' বোর্দাহ্' শরীফে আছে-

অর্থাৎ হুযূর-ই আক্রাম গাছগুলোকে ডাকা মাত্রই সাজদারত হয়ে হাযির হয়ে গেলো, কাণ্ডের উপর ভর করে, পা ছাড়াই হেঁটে এসেছে।

'উস্তনে হান্নানাহ্' তো হুযূর-ই আক্রামের বিচ্ছেদে শিশুর ন্যায় কান্না করেছে। হুযূর সেটাকে জড়িয়ে ধরে তার কান্না থামিয়ে ছিলেন। [মিশকাত শরীফঃ পৃ. ৫৩৬]

এক বর্ণনায় আছে যে, ''আল্লাহরই শপথ, সেটাকে আমি জড়িয়ে না ধরলে সেটা ক্বিয়ামত পর্যন্ত কাঁদতো। [শেফা শরীফঃ পৃ. ১৯৯]

অন্য এক বর্ণনায় আছে, সেটাকে হুযূর এরশাদ করেছেন, ''তুমি চাইলে আমি তোমাকে বাগানে তোমার পূর্ববর্তী স্থানে লাগিয়ে দেবো। তুমি আবার শাখা-প্রশাখায় তরুতাজা হয়ে যাবে। তুমি আবারো ফল দেবে। আর যদি চাও আমি তোমাকে জান্নাতে লাগিয়ে দেবো; যাতে আল্লাহর (প্রিয়) বান্দারা সেখানে তোমার ফল খেতে থাকবে।'' হুযূর নিজ কান মুবারকে সেটার জবাব শুনেছেন। সেটা বলেছে- ''এয়া রাসূলাল্লাহ্' আমাকে বেহেশতে লাগিয়ে দিন; যাতে আল্লাহর বন্ধুরা আমার ফল আহার করেন। আমিও যেন পুরাতন ও বিলীন না হই।'' তার এ কথা মসজিদ শরীফে যাঁরা ছিলেন তাঁরাও শুনেছেন। হুযূর-ই আক্রাম এরশাদ করলেন, ''আমি তেমনি করবো।'' হুযূর আরো এরশাদ করেছেন, ''সেটা এ অস্থায়ী জগতের উপর স্থায়ী জগতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেছেন, ''হে আল্লাহর বান্দারা! যখন শুকনো লাক্ড়ি হুযূর-ই আক্রামের ইশক্ব ও ভালবাসায় কাঁদছে, তখন তোমরা তো মানুষ! তোমরা এর অধিকতর উপযোগী। হুযূর-ই আক্বদাসের দীদারের প্রতি অধীর আগ্রহী হও!

[সূত্র. শেফা শরীফঃ ১ম খণ্ড, পৃ. ২০০, মাদারিজুন্নুবূয়তঃ পৃ. ২৩৬]

হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দেহ মুবারকের সুঘ্রাণ তাঁর সত্তাগত ও অতুলনীয়

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বিস্ময়কর গুণাবলীর মধ্যে তাঁর দেহ মুবারক থেকে প্রবাহিত সুঘ্রাণ অন্যতম। এ গুণটি তাঁর সত্তাগত ছিলো। তিনি দেহ মুবারকে কোনরূপ সুগন্ধি ব্যবহার না করলেও তাঁর দেহ মুবারক থেকে এমন সুঘ্রাণ বের হতো যে, পৃথিবীর কোন সুগন্ধি তার সমতুল্য হতে পারতো না। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, যত প্রকারের সুগন্ধি আছে- চাই তা মিশ্ক হোক কিংবা আম্বর, আমি তার ঘ্রাণ গ্রহণ করেছি; কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্রতম দেহের সুগন্ধির সমতুল্য কিছুই হতে পারে না। হযরত ওতবাহ্ ইবনে ফারক্বাদ সালামী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর স্ত্রী হযরত উম্মে 'আসিম বর্ণনা করেন, আমরা চার মহিলা হযরত ওত্বার স্ত্রী ছিলাম। আর আমরা চার সতীন প্রত্যেকেই চেষ্টা করতাম কে কার চেয়ে বেশী খুশ্বু ব্যবহার করে ওত্বার নিকটে যেতে পারি। এজন্য আমরা প্রত্যেকেই খুব বেশী খুশ্বু ব্যবহার করতাম। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে- আমাদের সকলের খুশ্বুই ওতবার দেহের খুশ্বুর কাছে ম্লাণ হয়ে যেতো। আর হযরত ওতবারও খুশবু ব্যবহারের অভ্যাস এমন ছিলো যে, তিনি হাতে স্বাভাবিকভাবে একটু তেল মালিশ করে দাড়িতে মেখে নিতেন। এর বেশী কিছুই নয়। কিন্তু তবুও দেখা যেতো, তাঁর খুশ্বুই আমাদের সকলের উপর প্রবল হয়ে গেছে। এদিকে হযরত ওতবা যখন বাইরে যেতেন, তখন লোকেরা বলাবলি করতো, আমরাও তো সুগন্ধি ব্যবহার করে থাকি, কিন্তু ওতবার সুগন্ধির তুলনায় আমাদের সুগন্ধি তেমন তেজস্কর নয়। হযরত উম্মে আসেম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন, আমি একদিন আমার স্বামী ওতবাকে বললাম, ''আমরাতো সকলেই সুগন্ধি ব্যবহার করে তার সুঘ্রাণ ছড়াতে যথাসাধ্য চেষ্টা করি, কিন্তু আমাদের খুশ্বু তো আপনার সুবাসের ধারে কাছেও পৌঁছাতে পারে না। এর কারণ কি?'' তখন তিনি বললেন, ''রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় আমার সমস্ত শরীরে একবার অত্যধিক গরমের কারণে ফোস্কা পড়ে গিয়েছিলো। (এর কারণে মনে হতো যেন আমার সমগ্র শরীরে আগুন লেগে গেছে।) এতে অস্থির হয়ে আমি হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মহান দরবারে হাযির হয়ে আমার অসুস্থতার অবস্থা বর্ণনা করলাম। তখনই তিনি এর চিকিৎসা করে দিলেন। তা

এভাবে যে, তিনি এরশাদ করলেন, "তোমার গায়ের কাপড় খুলে ফেলো।" আমি গায়ের কাপড় খুলে তাঁর সামনে বসে পড়লাম। হুযূর-ই করীম স্বীয় হাত মুবারক আমার গায়ের উপর বুলিয়ে দিলেন। পেট পিঠে ও হাত বুলিয়ে দিলেন। তখন থেকেই আমার শরীরে এ সুগন্ধের সৃষ্টি হয়। (গায়ের ফোস্কা তো নিশ্চিহ্ন হয়ে আরোগ্য লাভ করেছি। (এ ঘটনা ইমাম তাবরানী 'মু'জাম-ই সগীর'-এ বর্ণনা করেছেন।

এক ব্যক্তি তার কন্যাকে বিয়ে দিয়ে স্বামীর ঘরে পাঠানোর সময় সুগন্ধি খোঁজাখুজি করছিলেন। কিন্তু কোথাও না পাওয়ায় তা যোগাড় করতে পারছিলেন না। অবশেষে লোকটি হুযূর-ই পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দরবারে হাযির হয়ে সমস্যার কথা বর্ণনা করলেন। তখন হুযূর-ই আকরাম তাঁকে খুশ্‌বুর ব্যবস্থা করে দিলেন। তা এভাবে যে, তখন হুযূর-ই আক্‌রামের নিকট কোন খুশ্‌বু ছিলো না। তিনি লোকটিকে বললেন, "একটি শিশি নিয়ে এসো।" লোকটি শিশি নিয়ে আসলে তিনি নিজের শরীর মুবারক থেকে নির্গত ঘাম মুবারক দিয়ে শিশিটা পুরে দিয়ে বললেন, "এ ঘাম তোমার মেয়ের গায়ে মেখে দিও।" ওই শিশি থেকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র ঘাম নিয়ে যখন কন্যাটির গায়ে মেখে দেওয়া হলো, তখন সমগ্র মদীনা মুনাওয়ারায় এর ঘ্রাণ প্রবাহিত হতে লাগলো। এরপর থেকে ওই বাড়ির নাম রাখা হয়েছিলো, 'বায়তুল মুত্ত্বাইয়্যিবীন' (খুশ্‌বু বিতরণকারীদের ঘর)।

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, একদিন হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমার বাড়িতে তাশরীফ নিয়ে আসলেন। দুপুর বেলায় তিনি 'ক্বায়লূলাহ্' (শয়ন) করছিলেন। নিদ্রিত অবস্থায় হুযূর-ই আক্‌রামের দেহ মুবারক থেকে খুব ঘাম নির্গত হচ্ছিলো। আমার আম্মাজান উম্মে সুলায়ম একখানা শিশিতে ঘাম মুবারক জমা করছিলেন। হুযূর-ই পাকের ঘুম ভেঙ্গে গেলো। তিনি চোখ মেলে তাকালেন। আর বললেন, "হে উম্মে সুলায়ম! তুমি কি করছো?" তিনি আরয করলেন, "এয়া রসূলাল্লাহ্! আপনার ঘাম মুবারক জমা করেছি। আমি এগুলো খুশ্‌বু হিসেবে ব্যবহার করবো। কেননা, আপনার ঘাম মুবারকের খুশ্‌বু সর্বাপেক্ষা উত্তম খুশ্‌বু। এ হাদীস শরীফ মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে এও বর্ণিত হয়েছে যে, সাহাবীগণ হুযূর-ই আক্‌রামের দর্শনের প্রত্যাশী হয়ে এসে তাঁকে না পেলে রাস্তায় নেমে খুশ্‌বু শুঁক্‌তে থাকতেন। তিনি অতিক্রম করার ফলে যেই সুবাস রাস্তায় ছড়িয়ে পড়তো, তাঁরা তার অনুসরণ করতেন। মদীনা মুনাওয়ারার অলি-গলিতে যে খুশবু অনুভব করতেন, সেদিকেই তাঁরা ছুটে যেতেন।

এখন পর্যন্ত মদীনা মুনাওয়ারার দেয়ালে দেয়ালে তাঁর মনোরম খুশ্‌বুর ঘ্রাণ অনুভব হয়; যার সুবাস আশেক্বদের উতলা করে তোলে, যেন ওই খুশ্‌বুর মৃদু সমীরণ ফক্বীর-দরবেশ ও প্রেমিক মুসাফিরদেরকে এখনো স্বর্গীয় তৃপ্তির পরশ বুলিয়ে যাচ্ছে। মদীনা মুনাওয়ার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে আবূ আবদুল্লাহ্ আত্তার কতই সুন্দর বলেছেন-

بِلَطِيْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ فَطَابَ نَسِيْمُهَا
فَمَا الْمِسْكُ وَالْكَافُوْرُ الْمَنْدِلُ الرَّطَبُ

অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর খুশ্‌বুতে মদীনা তাইয়্যেবার পরিবেশ সুরভিত। মেশ্‌ক ও কাফূরের সুগন্ধি কি জিনিষ? তেমন সুগন্ধি তো সেখানকার খেজুরের ভিতরও বিদ্যমান।

জাগ্রত অনুভূতি সমৃদ্ধ আলিম হযরত শোবায়লী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, মদীনা মুনাওয়ারার পবিত্র মাটিতে এক বিশেষ সুঘ্রাণ নিহিত আছে। যার উপস্থিতি মেশ্‌ক ও আম্বরেরও পাওয়া যায়। মদীনা তাইয়্যেবার মাটিতে এমন খুশ্‌বু সত্যি এক বিস্ময়কর ব্যাপার।

আবূ নু'আয়ম হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নূরানী চেহারার উপর নির্গত ঘামের বিন্দুগুলো মুক্তার দানার মতো চমকাতো। আর এর খুশ্‌বু মেশকের চেয়েও বেশী ছিলো।

পবিত্র হাত মুবারকের খুশ্‌বু

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর হাত মুবারকের বর্ণনায় হযরত জাবির ইবনে সামুরাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-র হাদীস শরীফে আরো উল্লেখ করা হয়েছে, একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমার গণ্ডদেশে (চেহারা) হাত মুবারক বুলিয়ে দিলেন। তাতে আমি এত শীতলতা ও সুগন্ধি অনুভব করলাম যেন হুযূর-ই আক্‌রাম তাঁর হাত মুবারকখানা এইমাত্র আতরের শিশি থেকে বের করে এনেছেন। এ অবস্থায় যদি কেউ তাঁর সাথে মুসাফাহাহ্ (করমর্দন) করতো, তাহলে সমগ্র দিন হাতের মধ্যে ওই সুবাস লেগে থাকতো।

তিনি কখনো কোন শিশুর মাথায় যদি স্নেহের হাত বুলিয়ে দিতেন, তাহলে ওই শিশু অন্যান্য ছেলেমেয়ের মধ্যে এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে যেতো। কোন কোন হাদীস শরীফে বর্ণনা এসেছে যে, হুযূর-ই আক্‌রামের পবিত্র ঘাম মুবারক থেকে গোলাপ ফুলের জন্ম হয়েছে। অন্যত্র এমনও বর্ণিত হয়েছে যে, হুযূর-ই আক্‌রাম এরশাদ করেছেন, আমার ঘাম থেকে শবে মি'রাজে সাদা ফুল,

অর্থাৎ চামেলী এবং লাল ফুল অর্থাৎ গোলাপের জন্ম হয়েছে। হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম-এর ঘাম থেকে জন্ম হয়েছে হলদে বর্ণের ফুল, অর্থাৎ চাঁপাফুল। এতদভিন্ন আরো বর্ণনা এ প্রসঙ্গে এসেছে। যেমন হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, মি'রাজের ভ্রমণ শেষে যখন আমি পৃথিবীতে পদার্পণ করি, তখন আমার ঘামের একটি ফোঁটা মাটিতে পড়ে। তা থেকে গোলাপের সৃষ্টি হয়েছে। কেউ যদি আমার দেহের ঘ্রাণ গ্রহণ করতে চায়, তবে সে যেন গোলাপের ঘ্রাণ গ্রহণ করে। অন্য বর্ণনায় এসেছে- তিনি এরশাদ করেন, আমার ঘামের একটি ফোঁটা যখন মাটিতে পড়লো, তখন মাটি খুশীতে নেচে উঠলো এবং গোলাপ ফুল জন্ম দিলো। উপরোক্ত হাদীসমূহ সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ নিজ নিজ পরিভাষায় বিশ্লেষণধর্মী বক্তব্য রেখেছেন। [সূত্র. মাদারিজুন্নুবূয়ত ইত্যাদি]

বা'দআয্ খোদা বুযুর্গ তুঈ ক্বিস্সা মুখ্তাসার

উপরিউক্ত ফার্সী ইবারতটুকুর মর্মার্থ হচ্ছে- আল্লাহ্ তা'আলার পর সমগ্র সৃষ্টি জগতে সর্বাধিক সম্মান ও বুযুর্গীর অধিকারী হলেন আমাদের আক্বা হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। এ কথার সর্বপ্রথম সাক্ষী হচ্ছে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহূর পাক কালাম ক্বোরআন মজীদ। যেমন এরশাদ হচ্ছে-

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

অর্থাৎ সম্মান তো আল্লাহ্, তাঁর রসূল ও মু'মিনদের জন্যই; কিন্তু মুনাফিক্বদের নিকট এর খবর নেই। [৬৩:৮, কান্যুল ঈমান]

আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত শরীফে তাঁর নিজের ও তাঁর নবীর মহা সম্মানের ঘোষণা দিয়েছেন এবং তাঁর নবীর মাধ্যমে মু'মিনদের সম্মান এবং মর্যাদাও প্রকাশ করেছেন। পক্ষান্তরে, যারা নবী-ই পাকের মান-মর্যাদাকে অস্বীকার করে, তাদের স্পষ্টভাবে খণ্ডন করেছেন। এ কয়েকটা বিষয় এ আয়াত শরীফের শানে নুযূল থেকে স্পষ্ট হয়- হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম যখন ঐতিহাসিক মুরায়সী'র যুদ্ধ শেষে একটি কূপের নিকটে সদয় অবস্থান গ্রহণ করলেন, তখন ওখানে হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর খাদিম জাহ্জাহাহ্ গিফারী ও মুনাফিক্বদের সরদার আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই মুনাফিকের বন্ধু সিনান ইবনে ওয়াবর জাহান্নামীর মধ্যে ঝগড়া হয়ে গেলো। তখন আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই মুনাফিক্ব সিনানের পক্ষপাতিত্ব করতে গিয়ে হুযূর আলায়হিস্ সালাম-এর শানে বেয়াদবীপূর্ণ কথাবার্তা বলেছিলো। সে বলেছিলো, ''আমরা সম্মানিতরা মদীনায় পৌঁছে হীন ও নীচদেরকে বের করে দেবো।'' সে 'হীন ও নীচ' বলে

'মুহাজিরদের' বুঝিয়েছে। এমনকি সে তার সম্প্রদায়কে বললো, ''যদি তোমরা মক্কাবাসীদেরকে তোমাদের উচ্ছিষ্ট খাদ্যটুকু খেতে না দাও, তবে তারা মদীনা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হবে।'' (নাঊযু বিল্লাহ্) হযরত যায়দ ইবনে আরক্বাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ওই মুনাফিক্বের এসব জঘন্য বেয়াদবীপূর্ণ কথা শুনে তা সহ্য করতে না পেরে তাৎক্ষণিকভাবে ওই মুনাফিক্বের উদ্দেশে বললেন, ''তুই-ই হীন, নীচ ও অপমানিত। আর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শির মুবারকের উপর মি'রাজের তাজ রয়েছে, পরম করুণাময় (রহমান) তাঁকে অসাধারণ ক্ষমতা ও সম্মান দিয়েছেন।'' এটা শুনে ইবনে উবাই গোস্তাখ মুনাফিক্বের বুক ভয়ে কেঁপে উঠলো। এবার সে প্রাণ রক্ষার জন্য বাহানা- অজুহাত রচনা করতে লাগলো। সে বললো, ''ইবনে আরকাম চুপ থাকো, আমি তো এসব কথা ঠাট্টাচ্ছলে বলেছিলাম।'' হযরত যায়দ ইবনে আরক্বাম! রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তার বেয়াদবীর কথা হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছালেন। হুযূর আলায়হিস্ সালাম আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন- 'তুমি কি একথা বলেছো?' সে শপথ করে ফেললো এবং বললো, ''আমি একথা বলিনি।'' তার সম্প্রদায়ও তার পক্ষে সাফাই গাইতে লাগলো। তখনই এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো। এতে ইবনে উবাই মুনাফিক্বকে জঘন্য মিথ্যুক এবং হযরত যায়দ ইবনে আরক্বাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে সত্যবাদী সাব্যস্ত করা হলো।

'তাফসীর-ই রূহুল বয়ান'-এ এ আয়াত শরীফের তাফসীর প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই মুনাফিক্বের পুত্র অতি সম্মানিত সাহাবী ছিলেন। তাঁর নামও ছিলো আবদুল্লাহ্। তিনি যখন শুনলেন যে, তাঁর পিতা ইবনে উবাই মুনাফিক্ব নবী-ই পাকের শানে এমন জঘন্য বেয়াদবীপূর্ণ কথা বলেছে, তখন তিনি মদীনা-ই পাকের মূল-ফটকে তাঁর পিতার পথ রোধ করে দাঁড়ালেন আর তলোয়ার উঁচিয়ে বললেন, ''হে আমার পিতা! স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করো ও ঘোষণা করো যে, ''আল্লাহ্ পরম সম্মানিত ও হযরত মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্ও অতিমাত্রায় মর্যাদাবান ও সম্মানিত। অন্যথায় তোমার মাথা তোমার দেহ থেকে আলাদা করে ফেলবো।''

ইবনে উবাই মুনাফিক্বকে প্রাণের ভয়ে তা স্বীকার করে ঘোষণা দিতে হয়েছিলো। এ ঘটনা শুনে হুযূর-ই আক্বদাস খুব খুশী হলেন এবং তাঁকে (হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই)র জন্য দো'আ করলেন।

এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, রসূলে পাকের মান-মর্যাদার উপর মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি ও নিজের মান-সম্মান সবকিছু উৎসর্গ করা সাহাবা-ই কেরামেরই সুন্নাত বা তরীক্বা। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা, তাঁর রসূল এবং রসূলে পাকের বদান্যতায় মুসলমানদের জন্যও সম্মান এবং উঁচু মর্যাদার ঘোষণা দেওয়া

হয়েছে। ইয্যাত (সম্মান) মানে বিজয় ও ক্ষমতা। বাস্তবেও তা-ই ঘটেছে। বিজয় মহামহিম আল্লাহ্, তাঁর রসূল আলায়হিস্ সালাম ও মুসলমানদের জন্য অবধারিত ও নিশ্চিত। এটা ক্বিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

প্রথমত, আল্লাহর সীমাহীন ইয্যাতের এ যে, দুনিয়ার কোন কাজই আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত সম্পন্ন হতে পারে না। তিনিই মহত্বের মালিক। তিনিই প্রকৃত ক্ষমতার মালিক। অপ্রতিরোধ্য রাজত্ব একমাত্র তাঁরই। তিনিই সবার অভিভাবক ও সাহায্যকারী। তিনি যাকে সম্মান দেন, তাঁকে কেউ অপমানিত করতে পারে না। পক্ষান্তরে, তিনি যাকে অপমানিত করেন, তাকে কেউ সম্মান দিতে পারে না। তাঁর মহত্ব চিরস্থায়ী। বাকী সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী আর তিনিই স্বাধিষ্ঠ, অমুখাপেক্ষী।

দ্বিতীয়ত, রসূল আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর মহা সম্মানের হচ্ছে তাঁর পরিণতি যে অত্যন্ত শুভ ও সুন্দর তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। তাঁকে মহামহিম প্রতিপালক অসাধারণ সম্মান দিয়েছেন, শাফা'আতের ক্ষমতা দান করেছেন, তাঁর দ্বীনকে সমস্ত ধর্মের উপর বিজয়ী করেছেন, তাঁর জন্য মহান রবই যথেষ্ট, অন্য কোন সৃষ্টির তিনি মুখাপেক্ষী নন, বরং সবাইকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মুখাপেক্ষী করেছেন এবং তাঁকে সম্মান করা মহান রবকে সম্মান করার নামান্তর। তাঁর প্রতি অসম্মান দেখানো মহান রবের প্রতি অসম্মান দেখানোর সামিল তাঁর আনুগত্য মহান রবেরই আনুগত্য, তাঁর বিরোধিতা মহান রবেরই বিরোধিতা, তাঁর নূরানী সত্তা, মহান রবের মহান ও পবিত্র সত্তার প্রকাশস্থল। সব ধরনের গুনাহ্গারকে তাঁরই দরজায় হাযির হবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আর দুনিয়ার প্রতিটি জিনিষের উপর তাঁর ক্ষমতা চলে। পাথর ও গাছপালা তাঁকে সালাম জানায়। জিন্ ইন্সান ও ফিরিশ্তা তাঁর দো'আ চায়। বিশ্বের রাজা-বাদশাগণ তাঁর দরজার ভিখারী। হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম তাঁর পাক দরজা ও দরবারের খাদিম। আরশ-ই আ'যমকে তিনি অলংকৃত করেছেন। ফরশ (ভূ-পৃষ্ঠ) তাঁর সিংহাসনের স্থান, সর্বোপরি, ক্বিয়ামত দিবসে সবার আশা-আকাঙ্ক্ষার দৃষ্টি তাঁর হাত মুবারকের প্রতি নিবদ্ধ থাকবে। মোটকথা, তাঁর মহামর্যাদা ও সম্মানের কোটি ভাগের এক ভাগও বর্ণনা করে শেষ করার ক্ষমতা আমাদের নেই। তিনি তো ওই সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেছেন, যার সম্পর্কে মহান দাতা রব্বুল ইয্যাতই জানেন আর অর্জনকারী মাহ্বূব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম জানেন। আমরাতো শুধু এতটুকু বলে ক্ষান্ত হবো- *بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر* (বা'দ আয্ খোদা বুযুর্গ তূঈ ক্বিস্সা মুখ্তাসার।) অর্থাৎ আল্লাহর পর, সমগ্র সৃষ্টি জগতে, হে আল্লাহর হাবীব, আপনিই মর্যাদাবান ও সম্মানিত। ব্যস ক্বিস্সা খতম। এটাই চূড়ান্ত কথা।

তা হবেও না কেন? আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সর্বাপেক্ষা খোদাভীরু,

ইবাদতপরায়ণ ও সৎকর্মপরায়ণ নবীকুল সরদার আমাদের আক্বা ও মাওলা হযরত মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। এ-ই সম্পূর্ণ নিষ্পাপ সত্তার ইবাদতগুলোর সাওয়াব যে অপরিসীম ও অতুলনীয়, তাঁতে সন্দেহ নেই। আর তিনি যেই সহস্র-কোটি, বরং ক্বিয়ামত পর্যন্ত অসংখ্য, অগণিত মানুষ ও জিনকে হিদায়ত করেছেন এবং তাঁর হিদায়ত গ্রহণ করে যারা আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীতে রত আছেন, তাদের সাওয়াব ও প্রতিদান তাঁর দরবারে বহুগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে পৌঁছে যাচ্ছে ও যেতে থাকবে। এ মূলনীতিকে সামনে রেখে একটু চিন্তা করলে আল্লাহর হাবীবের মর্যাদা যে কত মহান তা আরো স্পষ্ট হয়ে যায়।

'মাওয়াহিব-ই লাদুনিয়াহ্' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুসলমান যে নেক কাজই করুক না কেন, তার এক সাওয়াব তো যে কাজটি করছে সে পাবে, দু'টি পাবেন তার মুর্শিদ, চারটি পাবেন তাঁর মুর্শিদের মুর্শিদ, আর আটটি পাবেন তাঁর মুর্শিদ। এভাবে যতো উপরে যাবেন, সাওয়াব বাড়তে থাকবে। এভাবে যখন এ সাওয়াব হুযূর করীম হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবার পর্যন্ত পৌঁছে, তখন তা অগণিত ও অসংখ্য হয়েই পৌঁছে।

এ'তো এক উম্মতের নেক কাজ। এখন প্রতিদিন কত সংখ্যক উম্মত কত নেক কাজ করছে আর হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে কত সাওয়াব পৌঁছছে তাতো হিসাব-নিকাশেরও বাইরে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে- **مَنْ دَلَّ عَلٰى خَيْرٍ فَلَهٗ مِثْلُ اَجْرِ فَاعِلِهٖ** অর্থাৎ "যে ব্যক্তি নেক কাজের প্রতি পথ দেখান তিনি ওই কাজ সম্পন্নকারীর মতো সাওয়াব পান।"

[মিশকাত শরীফ, কিতাবুল ইল্ম]

সমগ্র জাহানের সর্বোচ্চ পর্যায়ের পথ প্রদর্শক তো হুযূর-ই করীম হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। যে কেউ কোন প্রকার নেক কাজ করে অথবা ক্বিয়ামত পর্যন্ত করবে, সে তো হুযূর-ই আক্রামের পথ প্রদর্শনের কারণেই করে ও করবে। এখন চিন্তা করুন, হুযূর-ই আক্রাম-এর সাওয়াব ও প্রতিদানের অবস্থা কি!

'শতরঞ্জ' বা দাবার ছক আবিস্কারক তাঁর আবিস্কৃত 'ছক'টা নিয়ে তাঁর দেশের বাদশার নিকট গেলেন। বাদশাহ্ এমন আবিস্কার দেখে খুশী হলেন আর বললেন, "কিছ পুরস্কার চাও!" বললেন, 'আমার আবিস্কৃত ছকটির খানা বা ঘরগুলো চাউল দিয়ে এভাবে ভর্তি করে দিন যেন প্রত্যেক আগের খানায় তার পেছনের খানার দ্বিগুণ হয়। অর্থাৎ প্রথম খানায় একটি চাউল হলে তার সম্মুখস্থ দ্বিতীয় খানায় দু'টি, তৃতীয় খানায় চারটি, চতুর্থ খানায় আটটি, পঞ্চম খানায় ষোলটি চাউল হবে। এভাবে সব খানা ভর্তি করুন! বাদশাহ্ এত সূক্ষ্ম হিসাব

বুঝার চেষ্টাও করেননি, বরং বললেন, "এ হিসাব কে করবে? তুমি গিয়ে আমার বাবুর্চিখানা থেকে দু' বস্তা চাউল নিয়ে যাও!" লোকটি আরয করলেন, হুযূর! আমাকে এই হিসাবে দিন!" যখন হিসাব করা হলো, তখন দেখা গেলো সমগ্র রাষ্ট্রেও এত পরিমাণ চাউল উৎপন্ন হয়নি, যতটুকু এ লোকটি তার হিসাবানুযায়ী চাচ্ছেন।

এর কারণ হচ্ছে- দাবার ছকে ৬৪টি খানা বা ঘর আছে। আর চাউলের হিসাবও যদি এভাবে করা হয়- আট চাউলে এক রত্তি, আট রত্তিতে এক মাশাহ্, বার মাশায় এক তোলা, আশি তোলায় এক সের। এ হিসাবানুসারে মাত্র চব্বিশটি খানা বা ঘরে এক মণ হয়। তারপর যখন প্রতিটি খানার দ্বিগুণ করে হিসসা করা হলো, তখন শেষ পর্যন্ত এত পরিমাণ চাউল দাঁড়ালো যে, যদি ওই চাউলের মূল্যে স্বর্ণ দেয়া হয়, তবে এক বিরাট অংক দাঁড়াবে কারণ- স্বর্ণ ও চাউলের হিসাবও যদি এভাবে করা হয় যে, অগেরকার আমলের হিসাবানুযায়ী, চাউল এক টাকায় চার সের হয় এবং স্বর্ণ পঁচিশ টাকার এক তোলা হয়, তবে স্বর্ণ দাঁড়ায় উনিশ কোটি মণ, আর চাউলের হিসাব তো করাই সম্ভব হয় না।

এটা ছিলো চৌষট্টি খানার হিসাব, যা ওই যুগের বাদশাহ্ দিতে পারেন নি। কিন্তু আমাদের আক্বা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উম্মতের আমল যখন পৌঁছে, তখন তাও দ্বিগুণ, চারগুণ, আটগুণ হয়ে বৃদ্ধি পায় এবং এত বেশী হয়ে যায় যে, তার হিসাব করা সম্ভবপর হয় না। উপরিউক্ত উদাহরণে পার্থিব বাদশাহ্ দাবার আবিস্কারককে তার হিসাবানুসারে পুরস্কার দিতে পারেন নি, কিন্তু এখানে সাওয়াবের বেলায় হিসাব যতোই বৃদ্ধি পাক না কেন, প্রতিদান দাতা তো স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা। তাঁর ধন-ভাণ্ডারে অভাব কিসের। তাতো অসীম। এ-ই হচ্ছে রসূলে পাকের সম্মান বা মান-মর্যাদার একটা মাত্র দিক। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমায়েছেন-وَاِنَّ لَکَ لَاَجْرًا غَيْرُ مَمْنُوْن অর্থাৎ হে হাবীব! আপনার জন্য রয়েছে বন্ধ হয় না এমন সাওয়াব।

উল্লেখ্য যে, হুযূর-ই আক্রামের মাধ্যমে মুসলমানগণও সম্মানিত। তাদের সম্মান হচ্ছে এ যে, তাঁরা দোযখের স্থায়ী শাস্তি থেকে নিরাপদ। তারা আপন রবের সাচ্চা বান্দা। তারা রাজার বিশ্বস্ত প্রজার মতো। তাদের সামনে ধর্মীয় দিক দিয়ে সমস্ত জাতির মস্তক অবনত। যদি সত্যিকার অর্থে মু'মিন মুসলমান থাকে, তবে দুনিয়ার তখ্ত ও তাজ তাদেরই জন্য অবধারিত। এমন ঘোষণা দিয়েছেন খোদ্ আল্লাহ্ তা'আলা وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ (অর্থাৎ তোমরাই সর্বোন্নত যদি তোমরা সাচ্চা মুসলমান থাকো।)

তাছাড়া, ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাদের দ্বীন স্থায়ী হবে, তাদের কিতাব (ক্বোরআন মজীদ) সংরক্ষিত। তাদের মধ্যে ওলী, আলিম, গাওস ও ক্বুত্ববগণ সর্বত্র মওজুদ থাকবেন। ক্বিয়ামতে তাদের হাত, মুখ ও পাগুলো পূর্ণিমার চাঁদের মতো

চমকাবে ওযূর চিহ্ন হিসেবে। সমস্ত উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম তারা বেহেশতে প্রবেশ করবে। অর্দ্ধেক জান্নাতের তারা মালিক হবে, আর অর্দ্ধেকের বাকী সব উম্মত। মুসলমানদের ক্বেবলা হচ্ছে 'কা'বা মু'আয্যামাহ্'। আর অন্যান্য উম্মতগণ এখনো বায়তুল মুক্বাদ্দাসকে ক্বেবলা মানে। অথচ বায়তুল মুক্বাদ্দাসের পুনঃনির্মাতা হলেন হযরত মুসলায়মান আলায়হিস্ সালাম। আর তাতে কাজ করছে জিনেরা। কিন্তু কা'বা মু'আয্যামাহ্ নির্মাণের নির্দেশদাতা হলেন খোদ্ আল্লাহ্ তা'আলা, সেটার সীমানা ও নকশা বাত্লিয়েছেন হযরত জিব্রাঈল রুহুল্লাহ্, নির্মাণ করেছেন হযরত খলীলুল্লাহ্, তাঁকে সহযোগিতা করেছেন হযরত যবীহুল্লাহ্ আলায়হিমুস্ সালাম। আর সেটাকে আবাদকারী হলেন হযরত হাবীবুল্লাহ্ মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। বায়তুল মুক্বাদ্দাসে হাজারো নবী আলায়হিমুস্ সালাম আরাম করেছেন, কিন্তু মদীনা মুনাওয়ারায় তাশরীফ রাখছেন নবীকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। মদীনা মুনাওয়ারায় সারা বছর যে পরিমাণ যিয়ারতকারী উপস্থিত হন, বায়তুল মুক্বাদ্দাসে তার দশ ভাগের এক ভাগও যায় না। মোটকথা, দ্বীনী ও দুনিয়াবী-উভয় প্রকারের অসংখ্য সম্মান আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকেও দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ্ ওয়াস্ সালাতু ওয়াস্ সালামু আলা রসূলিল্লাহ্।

হুযূর-ই আক্রামের শিক্ষাদাতা খোদ্ পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলা

আল্লাহ তা'আলা ক্বোরআন মজীদে এরশাদ করেছেন- "আররাহমা-নু আল্লামাল ক্বোরআন।" তরজমা:পরম করুণাময় (আপন হাবীবকে) ক্বোরআন শিক্ষা দিয়েছেন। [সূরা আর রাহ্মান: আয়াত ১-২]

এ আয়াতে 'আল্লামা' অতীতকাল বাচক শব্দ। অর্থাৎ পূর্ববর্তীকালে সমগ্র ক্বোরআন শিক্ষা দিয়েছেন। উল্লেখ্য, এ সূরা মক্কী। এ সূরা নাযিল হবার সময় পর্যন্ত ক্বোরআনের অনেকাংশ নাযিল হবার বাকী ছিলো। অথচ এরশাদ হয়েছে- আল্লাহ তা'আলা প্রথম থেকেই আপন হাবীবকে সমগ্র ক্বোরআন শিক্ষা দিয়েছেন। এ থেকে বুঝা গেলো হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর এ জ্ঞান অর্জিত হওয়া ক্বোরআন মজীদ নাযিল হবার উপর নির্ভরশীল ছিলো না। তিনি ক্বোরআনের জ্ঞান শিক্ষা লাভ করেই দুনিয়াতে জন্মগ্রহণ করেছেন।

যখন রাহমান (পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা) হুযূর-ই আকরামকে ক্বোরআন শিক্ষা দিয়েছেন, তখন বুঝা গেলো যে, তিনি না জিব্রাইলের ছাত্র, না অন্য কোন মাখলূক (সৃষ্টি)'র খাস শাগরিদ বা ছাত্র। হুযূর-ই আকরাম-এর প্রকৃত শিক্ষাদাতা হলেন আল্লাহ তা'আলা, হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালাম হলেন নিছক পয়গাম আনয়নকারী।

একথাও বুঝা গেলো, হুযূর-ই আকরামের মতো জ্ঞান দুনিয়ার কারো অর্জিত হয়নি, হবেও না। কারণ, সবাই তো কোন না কোন মানুষের নিকট থেকে শিক্ষা

লাভ করে জ্ঞানী ও শিক্ষিত হয়; কিন্তু আমাদের আক্বা ও মাওলা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'রাহমান' (পরম করুণাময়)-এর নিকট থেকে শিখে জ্ঞানবান হয়েছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উস্তাদগণের পার্থক্য অনুসারে ছাত্র এবং তাদের জ্ঞানে পার্থক্য আসে। সুতরাং এখন যে কেউ হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর জ্ঞানে ত্রুটি বের করার দুঃসাহস দেখায় সে মূলতঃ হয়তো এ আয়াত শরীফের অস্বীকারকারী, নতুবা মহান রবকে অপূর্ণ মনে করে। (নাঊযুবিল্লাহ্)

যখন মহান রব 'কামিল' (পরিপূর্ণ) আর মহান কামিল রবই ঘোষণা করছেন, 'আমি তাঁকে ক্বোরআন শিক্ষা দিয়েছি', তখন 'অপূর্ণ' বলার তুমি কে? বস্তুত আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে পবিত্র ক্বোরআনের 'মুতাশাবিহ' বা দ্ব্যর্থবোধক আয়াতগুলোর জ্ঞানও দান করেছেন। কারণ, এ আয়াতগুলোও পবিত্র ক্বোরআনের অংশ। আল্লাহ তা'আলা আপন হাবীবকে পূর্ণ ক্বোরআনই শিক্ষা দিয়েছেন। তাছাড়া পবিত্র ক্বোরআন সম্পর্কে খোদ আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন- وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ এবং হে হাবীব! আমি আপনার উপর এ ক্বোরআন নাযিল করেছি, যা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বিবরণ। [১৬:৮৯, তরজমা : কান্যুল ঈমান]

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ইল্ম শরীফ সম্পর্কে অতি আশ্চর্যজনক ও বিরল নুক্তাহ্ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন- ইল্ম (জ্ঞান) অপূর্ণ থাকার চারটি কারণ থাকতে পারেঃ ১. ওস্তাদ অপূর্ণ হওয়া, ২. ওস্তাদ কামিল, কিন্তু তিনি ছাত্রের প্রতি দয়াশীল বা আন্তরিক নন, ৩. পাঠ্য বই অপূর্ণ হওয়া এবং ৪. ছাত্র অপূর্ণ হওয়া। অর্থাৎ কেউ কামিল (দক্ষ) ওস্তাদ থেকে কামিল (পূর্ণাঙ্গ) কিতাব (পাঠ্য বই) পড়লো, কিন্তু নিজে পূর্ণ বুঝ শক্তি সম্পন্ন নয়, তাই জ্ঞান লাভ করতে পারলো না।

আলহামদুলিল্লাহ! এ চারটা কারণের কোনটাই আমাদের আক্বা ও মাওলা হুযূর পূরনুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম -এর বেলায় প্রযোজ্য নয়, কোনটাই হুযূর-ই আকরামের বেলায় পাওয়া যায় না। কারণ, খোদ্ 'রাহমান' (পরম করুণাময়) শিক্ষাদাতা। তিনি কামিল দয়ালু, ক্বোরআন শরীফ কামিল কিতাব এবং যিনি পড়েছেন তিনি হলেন- কামিল ইনসান, নূরানী বশর, যাঁর মতো কামিল (পরিপূর্ণ) ব্যক্তিত্ব খোদা তা'আলার খোদায়ীর মধ্যে নেই। সুতরাং তাঁকে ইল্মও পূর্ণাঙ্গভাবে প্রদান করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা আরো এরশাদ করেছেন- خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۔ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ এ আয়াত শরীফে আল্লাহ তা'আলা আপন দু'টি কুদরতের কথা বর্ণনা করেছেনঃ

'ইনসানকে সৃষ্টি করা এবং তাকে জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া। এ আয়াতে 'ইনসান' ও 'বয়ান' -এর যে কয়েকটি তাফসীর বা ব্যাখ্যা রয়েছে তন্মধ্যে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হচ্ছে- এখানে 'ইনসান' মানে হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। আর 'বয়ান' মানে مَاكَانَ وَمَاتَكُوْنُ (যা হয়েছে ও হবে)-এর জ্ঞান। [তাফসীর-ই রূহুল বয়ান ও সাভী]

এ তাফসীরের মূলকথা হচ্ছে-মহান রব মানবতার প্রাণ হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁকে 'মা-কা-না ওয়ামা-ইয়াকূ-নু'র পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান দান করেছেন।

'বয়ান' শব্দের দু' অর্থ- ১. গোপন বস্তু খুলে বলা এবং ২. পুংখানুপুংখরূপে পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তা'আলা উভয় অর্থের 'বয়ান' দান করেছেন। হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম মহান রবের যাত (সত্তা) ও তাঁর গুণাবলী, জান্নাত, দোযখ, আরশ, কুরসী, লাওহ, কলম- অদৃশ্য জগতের যেগুলো গূঢ় রহস্যই ছিলো সবই প্রকাশ করে দিয়েছেন। যদি নবী করীমের এ মহান যাত মধ্যভাগে না হতো, তবে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে সম্পর্কই কায়েম হতো না। মহান রবের এ গূঢ় রহস্যাদিও প্রকাশ পেতো না। না আমরা ক্বোরআন শরীফ পেতাম, না লওহ-ই মাহফূযের জ্ঞানভাণ্ডারের হদিস কেউ পেতো।

তাছাড়া, হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যা, কুফর ও ইসলাম, আলো ও আঁধার, হালাল ও হারাম, সৌভাগ্যবান ও হতভাগা, জান্নাতী ও দোযখী-পরস্পর পৃথক হয়েছে। ইতোপূর্বে সিদ্দিক্ব ও যান্দিক্ব (মহাসত্যবাদী ও বে-দ্বীন) এক ধরনের মনে হতো। বুঝা যেতো না কোন্ বক্ষের মধ্যে মহান রব কোন ধরনের বীজ আমানত রেখেছেন। হুযূর-ই আকরামের মাধ্যমে এ সবের মধ্যে পার্থক্য নির্ণীত হয়েছে। যেভাবে হুযূর-ই আকরাম এগুলোর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেছেন, তেমনিভাবে আরবী, আজমী, রূমী, হাবশী, পূর্বাঞ্চলীয়-পশ্চিমা, কালো বর্ণ ও শ্বেতবর্ণের মানুষকে মুসলমান বানিয়ে এক করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ ফরমায়েছেন- هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ (তিনি তাদেরকে মুসলমান নামে অভিহিত করেছেন)।

সুতরাং এমন নির্ভুল ও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানে সমৃদ্ধ নবী-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মত হবার সৌভাগ্য আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দান করেছেন। তজ্জন্য আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে অগণিত শোকর।

আল্লাহ্ তা'আলা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে 'পাঁচ বিষয়'-এর জ্ঞানও দিয়েছেন!

আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র ক্বোরআনে 'সূরা লোক্বমান'-এর ৩৪নং আয়াতে এরশাদ করেছেন ১. ক্বিয়ামত কবে আসবে, ২. বৃষ্টি কবে বর্ষিত হবে, ৩. মায়েদের গর্ভাশয়ে কি রয়েছে, ৪. আগামীকাল কে কি কাজ করবে এবং ৫. কে কোথায় মৃত্যুবরণ করবে এ পাঁচ বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো নিকট নেই। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমান-

اِنَّ اللّٰهَ عِنۡدَهٗ عِلۡمُ السَّاعَةِ ۚ وَيُنَزِّلُ الۡغَيۡثَ ۚ وَيَعۡلَمُ مَافِى الۡاَرۡحَامِ وَمَا تَدۡرِىۡ نَفۡسٌ مَاذَا تَكۡسِبُ غَدًا ؕ وَمَا تَدۡرِىۡ نَفۡسٌ بِاَىِّ اَرۡضٍ تَمُوۡتُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيۡمٌ خَبِيۡرٌ O

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহর নিকট রয়েছে ক্বিয়ামতের জ্ঞান এবং বর্ষণ করেন বৃষ্টি, আর জানেন যা কিছু মায়েদের গর্ভে রয়েছে এবং কেউ জানে না কাল কি উপার্জন করবে, আর কেউ জানে না সে কোন্ ভূ-খণ্ডে মৃত্যুবরণ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞাতা, সর্ব বিষয়ে খবরদাতা। [সূরা লোকমান: আয়াত ৩৪, তরজমা-কান্‌যুল ঈমান]

বস্তুত আয়াত শরীফে গভীরভাবে দৃষ্টি দিলে একথা সুস্পষ্ট হয় যে, আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতে এরশাদ করেছেন- আল্লাহ্ তা'আলার বাত্‌লানো ছাড়া নিজে নিজে কেউ পাঁচ বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ্ জ্ঞান দান করলে ওই পাঁচ বিষয়ের জ্ঞানও যে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর রয়েছে তাতে সন্দেহ থাকতে পারে না। কারণ, এগুলো হচ্ছে এমনই পাঁচটি গায়ব, যেগুলো নিছক বিবেকের হিসাব দ্বারা এবং আন্দাজ-অনুমান দ্বারা জানা যায় না; শুধু আল্লাহর ওহী দ্বারাই নিশ্চিতভাবে জানা যেতে পারে। এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে আয়াতের **مَاتَدۡرِىۡ** (মা তাদ্‌রী) শব্দে। কারণ, **تَدۡرِىۡ** (তাদ্‌রী) **درايت** (দিরায়ত) থেকে নেওয়া হয়েছে। আরবীতে 'দিরায়ত' বলে 'বিবেক-বুদ্ধি ও হিসাব-আন্দাজ দ্বারা জানাকে। সুতরাং আয়াতে 'দিরায়ত'কে অস্বীকার করা হয়েছে। (অর্থাৎ ওই গায়বগুলো কেউ ওহীর সাহায্য ছাড়া নিছক বিবেক-বুদ্ধি ও অনুমান-আন্দাজের সাহায্যে জানতে পারে না।)

তাছাড়া, আয়াতের শানে নুযূলে, হারিস ইবনে আমর হুযূর করীমের উপর ওহী

আসার বিষয়কে অস্বীকার করে এ পাঁচটি গায়ব সম্পর্কে হুযূরকে প্রশ্ন করেছিলো। কারণ, সে নবীর নবূয়তের জ্ঞানকে তাঁর সত্তাগত বলে ধারণা করতো, আল্লাহর দান ও ওহীর সাহায্যের বিষয়টি সে মানতো না। সে নবী পাকের দরবারে এসে বলতে লাগলো, "আপনি যদি সত্য নবী হন, তবে বলুন, ক্বিয়ামত কবে হবে? আমি ক্ষেতে বীজ বপন করেছি। বলুন, বৃষ্টি কবে হবে? আমার স্ত্রী গর্ভবর্তী। বলুন, পুত্র হবে, না কন্যা? আর বলুন, আগামীকাল আমি কি কাজ করবো? বলুন, আমি কোথায় মারা যাব?" তার খণ্ডনে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। [তাফসীর-ই নূরুল ইরফান]

এখন দেখুন, আল্লাহ্ তা'আলা আপন হাবীবকে এ পাঁচ বিষয়ের ইল্‌ম-ই গায়ব (অদৃশ্য জ্ঞান)ও দিয়েছেন। সুতরাং আরিফ বিল্লাহ্ হযরত শায়খ আহমদ সাভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেছেন-

قَالَ الۡعُلَمَآءُ اَلۡحَقُّ اَنَّهٗ لَمۡ يَخۡرُجۡ نَبِيُّنَا مِنَ الدُّنۡيَا حَتّٰى اِطَّلَعَهُ اللّٰهُ عَلٰى تِلۡكَ الۡخَمۡسِ وَلٰكِنَّهٗ اُمِرَ بِكَتۡمِهَا [صاوى-ج ٣، صفحه ٢٦٠]

অর্থাৎ ঃ বিজ্ঞ আলিমগণ বলেছেন, বাস্তব সত্য কথা হচ্ছে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওই সময় পর্যন্ত দুনিয়া থেকে তাশরীফ নিয়ে যাননি, যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এ পাঁচ বিষয়ে জ্ঞান দান করেছেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা আপন হাবীবকে এ সব জ্ঞান সাধারণভাবে গোপন করার নির্দেশ দিয়েছেন। [তাফসীর-ই সাভী; ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬০]

হযরত ক্বুত্ববুল ওয়াক্বত সাইয়্যেদী আবদুল আযীয দাব্‌বাগ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেছেন-

كَيۡفَ يَخۡفٰى اَمۡرُ الۡخَمۡسِ عَلَيۡهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَسَلَّمَ وَالۡوَاجِدُ مِنۡ اَهۡلِ التَّصَرُّفِ مِنۡ اُمَّتِهِ الشَّرِيۡفَةِ لَا يُمۡكِنُهُ التَّصَرُّفُ اِلَّا بِمَعۡرِفَةِ هٰذِهِ الۡخَمۡسِ [كتاب ابريز : صفحه ١٥٨]

অর্থাৎ ঃ ওই পাঁচ বিষয়ের জ্ঞান হুযূর করীমের নিকট কীভাবে গোপন থাকতে পারে, যখন তাঁর একজন ক্ষমতা প্রয়োগে সক্ষম উম্মতের পক্ষে ওই পাঁচ বিষয়ের জ্ঞান ব্যতীত ওই ক্ষমতা প্রয়োগ করা সম্ভবপর নয়? [কিতাব ইব্‌রীয : পৃষ্ঠা ১৫৮]

সম্মানিত পাঠক সমাজ! হযরত ক্বুত্ববুল ওয়াক্বত সাইয়্যেদুনা আবদুল আযীয দাব্বাগ আলায়হি রাহমাহ্‌র এ উক্তি একথা সুস্পষ্ট করে দিলো যে, হুযূর করীম তো হুযূরই! সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে তাঁর সর্বোচ্চ শান সম্পর্কে আর বলার অপেক্ষা রাখে না! হুযূরের গোলাম-খাদিমগণও এ পাঁচ বিষয় সম্পর্কে (আল্লাহ্‌র দানক্রমে) জানেন। এখন দেখুন!

এক. ক্বিয়ামত সম্পর্কে হুযূরের জ্ঞান!

ওই পাঁচ বিষয়ের জ্ঞানের মধ্যে প্রথম হচ্ছে- ক্বিয়ামতের জ্ঞান। অর্থাৎ ক্বিয়ামত কবে হবে? এ প্রসঙ্গে আরিফ বিল্লাহ্ শায়খ আহমদ সাভী রাহ্মাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি সূরা আহযাবের আয়াত–وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ الاية (এবং তারা আপনাকে ক্বিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে)-এর তাফসীর বা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন-

وَهٰذَا اِنَّمَاهُوَ وَقْتَ السُّؤَالِ وَاِلَّا فَلَمْ يَخْرُجْ نَبِيُّنَا صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الدُّنْيَا حَتّٰى اِطَّلَعَهُ اللّٰهُ عَلٰى جَمِيْعِ الْمَغِيْبَاتِ وَمِنْ جُمْلَتِهَا السَّاعَةُ لٰكِنْ اُمِرَ بِكَتْمِ ذٰلِكَ [صاوى- ج-٣ صفحه ٢٨٩]

অর্থাৎঃ এটাতো যখন হারিস ইবনে আমর প্রমুখ কাফিরগণ হুযূর করীমকে ক্বিয়ামত ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল, তখনকার কথা। অন্যথায় হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম দুনিয়া থেকে তখন পর্যন্ত তাশরীফ নিয়ে যাননি, যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সমস্ত গায়ব বা অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেছেন। আর ওই অদৃশ্য বিষয়াদির মধ্যে ক্বিয়ামতের জ্ঞানও রয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে ক্বিয়ামত কবে আসবে- সে সম্পর্কে জ্ঞানকে উম্মতের নিকট থেকে গোপন রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। [তাফসীর-ই সাভী: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৪৯]

হুযূর ক্বিয়ামতের বিভিন্ন পূর্বাভাস দিয়েছেন, যেগুলো ক্বিয়ামত সম্পর্কে হুযূরের জ্ঞানের প্রমাণ বহন করে। কারণ হুযূর এরশাদ করেছেন বলেই আজ ছোট শিশুরা পর্যন্ত জানে যে, ক্বিয়ামত জুমার দিন সংঘটিত হবে, ওই তারিখ হবে মুহার্রমের ১০ তারিখ। তাছাড়া, হুযূর ক্বিয়ামতের পূর্বাভাস দিয়েছেন-ক্বিয়ামতের পূর্বে ইয়াজূজ-মাজূজ বের হবে, দাজ্জাল বের হবে, ইমাম মাহদী আত্মপ্রকাশ করবেন, হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম অবতরণ করবেন, শিঙ্গায় ফুৎকার করা হবে এবং হাশর-নশর, হিসাব-নিকাশ ইত্যাদি। এ সব বিষয় সরওয়ার-ই কা-ইনাত আপন উম্মতদের বলে দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, আল্লাহর অনুমতিক্রমে হুযূর ক্বিয়ামতের চিহ্নগুলো বলেছেন। আল্লাহরই নিষেধের কারণে তিনি ক্বিয়ামতের সালটি বলে দেন নি। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন- لَا تَاْتِيْكُمْ اِلَّا بَغْتَةً অর্থাৎ ক্বিয়ামততো একেবারে হঠাৎ আসবে। কাজেই, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যদি ক্বিয়ামতের সনও উম্মতকে বলে দিতেন, তবে ক্বিয়ামত হঠাৎ করে আসবে কিভাবে? লোকেরা সব সময় ক্বিয়ামতের আগমনের দিন, তারিখ ও সন গণনা করতে থাকবে। মোটকথা, এ ব্যাপারে আহলে সুন্নাতের আক্বীদা হচ্ছে- আল্লাহ্ আলিমুল গায়বি ওয়াশ্ শাহাদাহ্ আপন মাহবূবকে ক্বিয়ামতের জ্ঞান দিয়েছেন। তিনি ভালভাবে জানতেন ক্বিয়ামত কবে সংঘটিত হবে।

মায়েদের গর্ভাশয়ে কি আছে?

মায়ের গর্ভাশয়ে কি আছে- পুত্র না কন্যা? এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা আপন হাবীবকে জ্ঞান দান করেছেন। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আবূ নু'আয়ম তাঁর বিশ্ববিখ্যাত কিতাব 'দলা-ইলুস্ সুন্নাত'-এ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন- হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর চাচী উম্মুল ফদ্বল হুযূর করীমের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তখন হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, ''চাচীজান! আপনার গর্ভে পুত্র সন্তান রয়েছে। সে যখন জন্মগ্রহণ করবে তখন তাকে আমার নিকট নিয়ে আসবেন।'' সুতরাং উম্মুল ফদ্বলের বর্ণনা, ''যথাসময়ে আমার পুত্র সন্তানটি জন্মগ্রহণ করলো। আমি যখন তাকে নিয়ে হুযূর করীমের পাক দরবারে হাযির হলাম, তখন হুযূর তার ডান কানে আযান ও বাম কানে ইক্বামত পড়লেন। আর আপন বরকতময় মুখের থুথু শরীফ তার মুখে খাইয়ে দিলেন। তাঁর নামও রাখলেন 'আবদুল্লাহ'। অতঃপর আমার উদ্দেশে বললেন, اِذْهَبِىْ بِاَبِى الْخُلَفَآءِ অর্থাৎ ''খলীফাদের পিতাকে নিয়ে যান!''

হযরত উম্মুল ফদ্বল বললেন, এ কথা শুনে আমি খুব আশ্চর্যান্বিত হলাম। এ কথা আমার স্বামী হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে বললাম। অতঃপর তিনি নিজে হুযূর নবী করীমের দরবারে এসে আরয করলেন, এয়া রসূলাল্লাহ্! আপনি কি আমার সন্তান সম্পর্কে এমনি এরশাদ করেছেন? তখন হুযূর করীম এরশাদ করলেন, 'হাঁ, আমি তেমনি বলেছি-

هُوَاَبُوْالْخُلَفَآءِ حَتّٰى يَكُوْنَ مِنْهُمُ السَّفَّاحُ حَتّٰى يَكُوْنَ مِنْهُمُ الْمَهْدِىُّ حَتّٰى يَكُوْنَ مِنْهُمْ مَنْ يُّصَلِّىْ بِعِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ–

অর্থাৎঃ আপনার এ সন্তান বাস্তবিকপক্ষে খলীফাগণের পিতা। তাঁরই ঔরশ থেকে 'সাফ্ফাহ্' (আবুল আব্বাস সাফ্ফাহ্)ও জন্মগ্রহণ করবে, তার সন্তানদের মধ্যে 'মাহদী'ও হবে। এমনকি তার সন্তানদের কিছু লোক হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম আলায়হিস্ সালাম-এর সাথে নামায পড়বে। [তারীখুল খোলাফা : পৃষ্ঠা ১৫]

সুতরাং বুঝা গেলো যে, হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত উম্মুল ফদ্বলের গর্ভে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণের সংবাদ দিয়ে ভবিষ্যতে তার ঔরশজাত সন্তানদের সম্পর্কে বাস্তব এবং নিশ্চিত সংবাদটুকুও দিয়েছেন। এভাবে আরো বহু প্রমাণ এ প্রসঙ্গে রয়েছে।

আগামীকাল কী করবে?

আল্লাহ্ তা'আলা আপন হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে কাল কে কি করবে সে সম্পর্কেও জ্ঞান দিয়েছেন। খায়বারের যুদ্ধের এক পর্যায়ে হুযূর সরকার-ই দু'জাহান ঘোষণা করলেন-

لَاُعْطِيَنَّ هٰذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلاً يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلٰى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ [مشكوة-باب مناقب على]

অর্থাৎঃ আগামীকাল আমি এ ঝাণ্ডা ওই পুরুষকে দেবো, যার হাতে আল্লাহ্ তা'আলা খায়বার-বিজয় দান করবেন। আর সে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসে। [মিশ্কাত : হযরত আলীর প্রশংসা শীর্ষক অধ্যায়]

সুতরাং হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পরদিন হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর হাতে ঝাণ্ডা দিলেন এবং তিনি খায়বার জয় করলেন। এতে কি কথা প্রমাণিত হয় না যে, হুযূর আগামীকাল কে কি করবে সে সম্পর্কেও জানেন? অবশ্যই। আল্লাহ তা'আলাই তাঁকে এ অদৃশ্য জ্ঞান দান করেছেন।

কে কোথায় মৃত্যুবরণ করবে?

এ প্রসঙ্গে ওই হাদীস শরীফ সম্পর্কে প্রায় সবার জানা আছে- হুযূর করীম বদরের যুদ্ধের একদিন পূর্বে একটি লাঠি দিয়ে যুদ্ধের ময়দানে রেখা টানলেন আর বললেন, এখানে আমুক কাফির মরবে, এটা অমুক কাফিরের নিহত হবার স্থান।

সুতরাং এ হাদীস শরীফ বর্ণনাকারী বলেছেন-

فَمَامَاتَ اَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضَعِ يَدِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [مسلم- ج- ২- باب غزوة بدر]

অর্থাৎ কাফিরদের মধ্যে যারা নিহত হয়েছিল তাদের কেউই হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর বরকতময় হাতে অঙ্কিত স্থান থেকে এক বিন্দু পরিমাণও এদিক সেদিক হয়নি। [মুসলিম : ২য় খণ্ড, বদরের যুদ্ধ শীর্ষক অধ্যায়] যেখানে যে লোকটি নিহত হবে বলে হুযূর করীম জায়গা চিহ্নিত করেছিলেন ঠিক সেখানেই তার লাশ পাওয়া গিয়েছিলো।

সাহাবা-ই কেরামও বারবার হুযূর-ই আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাকে এ ধরনের গায়বের বিষয়াদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন আর হুযূর করীমও সেগুলোর জবাব দিতেন। হাদীস শরীফের প্রসিদ্ধ কিতাবাদিতে 'কিতাবুল ফিতান' 'কিতাবুর রক্বাক্ব' ইত্যাদির বহু হাদীস এমনই রয়েছে, যেগুলোতে হুযূর করীম সাহাবা-ই কেরামকে গায়বের খবরাদি দিয়েছেন। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, এমন সব প্রশ্ন করার সময় না হুযূর একথা বলেছেন যে, এগুলোতো গায়বের বিষয়, আমি কিভাবে জবাব দিই? না সাহাবা-ই কেরাম এভাবে আরয করেছেন, আপনি গায়বের খবরগুলো কিভাবে দিচ্ছেন? 'গায়ব' তো আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না!''

সুতরাং পবিত্র ক্বোরআন, সুন্নাহ্ ও সাহাবা-ই কেরামের আক্বীদা ও আমল,

ইজমা ও ক্বিয়াস ইত্যাদি দ্বারা একথাই সাব্যস্ত যে, 'পাঁচ বিষয়'র জ্ঞানসহ গায়বের বিষয়াদি সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দান করেছেন, যা দ্বারা হুযূরের অনন্য শান মধ্যাহ্ন সূর্য অপেক্ষাও বেশী স্পষ্ট হয়।

হুযূর করীম প্রসিদ্ধ প্রশংসাকারী শায়ের হযরত হাস্সান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র রচিত কয়েকটি পংক্তি দ্বারা এ নিবন্ধের ইতি টানছি। তিনি বলেন-

ذَبِىٌّ يَرٰى مَالاَ يَرَى النَّاسُ حَوْلَهٗ وَيَكْتُلُوْ كِتَابَ اللّٰهِ فِى كُلِّ مَشْهَدٍ

فَاِنْ قَالَ فِىْ يَوْمٍ مَقَالَةَ غَائِبٍ فَتَصْدِيْقُهَا فِىْ ضَحْوَةِ الْيَوْمِ اَوْغَدٍ

অর্থাৎ ঃ নবী আপন আশপাশে ও সামনে ওইসব কিছু দেখতে পান, যেগুলোকে অন্যসব মানুষ দেখতে পায় না। নবী সর্বত্র আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করেন। যদি নবী অদৃশ্যের কোন কথা কোনদিন বলেন,তবে আজ কিংবা কালকের দিবালোকে সেটা সত্যায়ন হয়ে যায়।

আল্লাহ পাকের শোকর, তিনি আমাদেরকে অদৃশ্যজ্ঞানী নবী-ই আকরামের উম্মত করেছেন।

অদৃশ্যের সংবাদদাতা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন ক্বিয়ামতপূর্ব অনেক আলামত

ক্বিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়া একটি অতি নিশ্চিত বিষয়। এর অনুষ্ঠানের সাল ও দিন-তারিখ সৃষ্টির নিকট থেকে গোপন রাখা হলেও এর পূর্বে প্রকাশ পাওয়া অনেক আলামত আমাদের আক্বা ও মাওলা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিশ্ববাসীর সামনে প্রকাশ করে দিয়েছেন, যাতে ওই আলামতগুলো দেখে তারা সতর্ক হতে পারে। প্রাসঙ্গিকভাবে বলতে হয় যে, ক্বিয়ামত সম্পর্কিত জ্ঞান ও আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দিয়েছেন, বস্তুত কোন কিছুর আলামত বা সে সম্পর্কে পূর্বাভাস তিনিই দিতে পারেন। যিনি সে সম্পর্কে জানেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ক্বিয়ামত সম্পর্কে যেসব আলমত বলে গেছেন সেগুলো সম্পর্কে আলোচনার প্রয়াস পাচ্ছি।

ক্বিয়ামতের আলামতগুলো দু'প্রকার: ১. আলামত-ই ই সুগ্‌রা (ছোট আলামতসমূহ ও ২. আলা-মাত-ই কুব্‌রা (বড় আলামতসমূহ)। আলামত-ই সুগ্‌রা (ছোট আলামতগুলো)'র বেশীর ভাগ এ পর্যন্ত প্রকাশ পেয়ে গেছে। আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুস্তফা মুরাদ তাঁর লিখিত 'বিশ্বনবীর হাজার-মু'জিযা' (মু'জিযাতুর রসূল: আল্‌ফু মু'জিযাতিম্ মিম্ মু'জিযাতির রসূল) গ্রন্থে লিখেছেন- ক্বিয়ামতের ছোটতর আলামতগুলোর মধ্যে প্রায় ৯৯% ভাগই এ পর্যন্ত প্রকাশ পেয়ে গেছে। আর এ আলামতগুলোর প্রকাশ পাওয়া আরম্ভ হয়েছে হুযূর-ই আক্‌রামের নুবূয়ত প্রকাশের সময় থেকে। আর এ পরম্পরা চলতে থাকবে ক্বিয়ামতের পূর্বে আগুন প্রকাশ পাওয়া পর্যন্ত। বিশুদ্ধ বর্ণনাদিতে এসেছে যে, ক্বিয়ামতের অব্যাহতি পূর্বে ওই আগুন ইয়ামন থেকে বের হবে এবং সমস্ত মানুষকে তাড়িয়ে হাশরের ময়দান পর্যন্ত নিয়ে যাবে।

ক্বিয়ামতপূর্ব ছোট আলামতগুলো আবার তিন প্রকার

১. কিছু সংখ্যক আলামত এ পর্যন্ত দেখা দিয়েছে এবং সুদৃঢ় বা স্থায়ী রয়েছে। এগুলোর সংখ্যা শতকরা ৯৯ ভাগ। ২. কিছু আলামত দেখা গেছে, কিন্তু স্থায়ী হয়নি, এগুলোর সংখ্যা নেহায়েত কম আর ৩. কিছুসংখ্যক আলামত এখনও প্রকাশিত হয়নি। এগুলোর সংখ্যা পূর্বোল্লিখিত আলামতগুলোর তুলনায়ও কম।

এখন দেখুন, যেগুলো এ পর্যন্ত প্রকাশ পেয়েছে সেগুলোর কতেক আলমতঃ

এক. নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নুবুয়ত প্রকাশ।

যেহেতু নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'খাতামুন্নাবিয়্যীন' (শেষ নবী), সেহেতু সমগ্র বিশ্বের হিদায়তের জন্য বিশ্বনবী প্রেরিত হওয়া একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, ক্বিয়ামত নিকটবর্তী হয়ে এসেছে। খোদ্ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামও এরশাদ করেছেন-

بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَاَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى

অর্থাৎ আমি প্রেরিত হয়েছি এভাবে...। তখন তিনি তাঁর বরকতময় শাহাদত আঙ্গুল ও মধ্যমাকে মিলিত করে ইঙ্গিত করেছেন (দেখিয়েছেন)। [বোখারী ও মুসলিম]

দুই. ওফাতুন্নবী (নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাত শরীফ।

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, হে 'আওফ, ক্বিয়ামতের পূর্ববর্তী ছয়টি সময় কিংবা ঘটনা স্মরণ রাখবে-১. আমার ওফাত, ২. অতঃপর বায়তুল মুক্বাদ্দাস বিজয়, ৩. তারপর এমন একটি রোগের সংক্রমণ (ছড়িয়ে পড়া), যাতে তোমাদের সন্তানগণ ও তোমাদের আপনজনদের প্রাণ চলে যাবে। তবে এর মাধ্যমে তোমাদের মাল-দৌলতগুলো পরিচ্ছন্ন হবে। অতঃপর অঢেল ধন-সম্পদ তোমাদের হাতে আসবে, এমনকি একেকজন লোক একশ' দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) দান করবে। ৪. তবুও সে অসন্তুষ্ট হবে, ৫. আর একটি বড় ফিৎনা তোমাদের মধ্যে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়বে যে, তা প্রত্যেক মুসলমানের ঘরে প্রবেশ করবে। ৬. অতঃপর তোমাদের ও বনী আসফার (খ্রিস্টানগণ) -এর মধ্যে সন্ধি হবে, তারপর তারা বিশ্বাসঘাতকতা করবে তারপর তারা তোমাদের দিকে ধাবিত হবে...। [ইবনে মাজাহ্, হাকিম]

তিন. হিজাযে আগুন বের হবে

ক্বিয়ামতের যেসব আলামত প্রকাশ পেয়েছে তন্মধ্যে একটি হলো হিজায ভূমিতে এক মহা আগুন প্রকাশ পাবে, যার আলোয় সিরিয়ার বুস্‌রা শহরের উটের গর্দানগুলো আলোকিত হবে। যেমন, হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

لاَتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَخْرُجَ نَارٌ مِّنْ اَرْضِ الْحِجَازِ تُضِئُ اَعْنَاقُ الْاِبِلِ بِبُصْرٰى

অর্থাৎ ক্বিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে না যতক্ষণ না হিজাযভূমি থেকে এমন এক আগুন প্রকাশ পাবে, যাতে (সিরিয়ার) বুস্‌রা শহরের উটের গর্দানগুলো উদ্ভাসিত হবে। (বোখারী, কিতাবুল ফিতান, বাবু খুরূজিন্ নার) উল্লেখ্য, ৬৫৪ হিজরীতে এ আগুন প্রকাশ পেয়েছে।

চার. মানুষের উপর এমন প্রতিটি যুগ আসবে, যার পরবর্তী যুগ সেটা অপেক্ষা মন্দ হবে

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

لَا يَأْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ اِلَّا وَالَّذِىْ بَعْدَهٗ شَرٌّ مِنْهُ

অর্থাৎ মানুষের উপর যে যুগই আসবে, তার পরবর্তী যুগ তদপেক্ষা মন্দতর হবে। [প্রাগুক্ত]

পাঁচ. বায়তুল মুক্বাদ্দাস বিজয়

হযরত ওমর ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর হাতে ১৫শ হিজরীতে বায়তুল মুক্বাদ্দাস বিজিত হয়েছিলো।

ছয়. পৃথিবীতে হত্যাযজ্ঞ অধিক পরিমাণে সংঘটিত হবে

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَكْثُرَ الْهَرَجُ قَالُوْا وَمَا الْهَرَجُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ اَلْقَتْلُ اَلْقَتْلُ

অর্থাৎ ক্বিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ না 'হারাজ' বৃদ্ধি পাবে। সাহাবা-ই কেরাম বললেন, ''হারাজ কি হে আল্লাহর রসূল?'' তিনি এরশাদ করলেন, ''হত্যাকাণ্ড হত্যাকাণ্ড'' [প্রাগুক্ত]

সহীহ্ হাদীস শরীফে আরো বর্ণিত হয়েছে-

اِذَا اِلْتَقَا الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفِهِمَا' فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِى النَّارِ

অর্থাৎ যখন দু'জন মুসলমান তরবারি হাতে মুখোমুখি হয়, তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ে দোযখে যাবে। [প্রাগুক্ত]

অপর বর্ণনায় আছে-

اِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفِهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِى النَّارِ ـ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُوْلِ؟ قَالَ اِنَّهٗ اَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهٖ

অর্থাৎ যখন দু'জন মুসলমান তরবারি নিয়ে মুখোমুখি হয়, তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ে দোযখী। আরয করা হলো, হে আল্লাহর রসূল, এতো হত্যাকারীই, নিহতের অবস্থা কি? হুযূর-ই আক্রাম এরশাদ করলেন, সেও তো তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করার ইচ্ছা করেছিলো। [মুসলিম শরীফ, কিতাবুল ফিতান]

সাত. হত্যাকারী জানবে না সে কেন হত্যা করলো, আর নিহত ব্যক্তিও জানবেনা সে কেন নিহত হলো

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتّٰى يَأْتِىَ عَلَى النَّاسِ يَوْمٌ لَا يَدْرِى الْقَاتِلُ فِيْمَا قَتَلَ وَلَا الْمَقْتُوْلُ فِيْمَا قُتِلَ ـ فَقِيْلَ كَيْفَ يَكُوْنُ ذٰلِكَ ـ قَالَ اَلْهَرَجُ اَلْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِى النَّارِ

অর্থাৎ শপথ ওই মহান সত্তার, যার কুদরতের মুঠোয় আমার প্রাণ, দুনিয়া (শেষ হয়ে) যাবেনা যতক্ষণ না মানুষের উপর এমন একটি দিন আসবে, যেদিন

হত্যাকারী জানবে না সে কেন হত্যা করলো, আর নিহত ব্যক্তিও জানবে না কেন সে নিহত হলো। আরয করা হলো, তা কীভাবে হবে? এরশাদ করলেন, (তা হলো জঘন্য) হত্যাকাণ্ড। হত্যাকারী ও নিহত উভয়ে দোযখে যাবে। [মুসলিম শরীফ]

আট. শাসনভার (নেতৃত্ব) অনুপযুক্ত লোকের হাতে যাবে

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

اِذَا وُسِّدَ الْاَمْرُ اِلٰى غَيْرِ اَهْلِهٖ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

অর্থাৎ ''যখন সরদারী/নেতৃত্বভার অনুপযুক্ত লোকের হাতে ন্যস্ত হয়, তখন থেকে ক্বিয়ামতের জন্য অপেক্ষা করো।'' অর্থাৎ সম্প্রদায় বা জাতির প্রধান হবে তাদের মধ্যে নিকৃষ্ট লোকটি আর (প্রধান হবে) তাদের মধ্যে ফাসিক্ব বা পাপাচারী ব্যক্তিটি।

নয়. অশ্লীল কথাবার্তা ও কাজ, আত্মীয়তা ছিন্নকরা, আমানতের খিয়ানত ও অবিশ্বস্ত লোকের হাতে মাল গচ্ছিত রাখা হবে

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করবেন,

مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَلْفُحْشُ وَالتَّفَحُّشُ وَقَطِيْعَةُ الرَّحِمِ وَتَخْوِيْنُ الْاُمِيْنِ وَائْتِمَانُ الْخَائِنِ

অর্থাৎ ক্বিয়ামতের আলামতগুলোর মধ্যে রয়েছে- অশ্লীল কথাবার্তা ও কাজ সম্পন্ন হবে, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা হবে, আমানতের খিয়ানত হবে, অবিশ্বস্ত লোককে আমানতদার করা হবে। [আহমদ, যায্যায]

দশ. দো'আয় সীমালঙ্ঘন

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

سَيَكُوْنُ قَوْمٌ يَعْتَدُوْنَ فِى الدُّعَآءِ

অর্থাৎ ''অবিলম্বে এমন এক সম্প্রদায় হবে, যারা দো'আয় সীমালঙ্ঘন করবে।'' অর্থাৎ এমন কিছু প্রার্থনা করবে, যার অধিকার বা যোগ্যতা তাদের নেই; যেমন নবীগণের মর্যাদা চাইবে ইত্যাদি, আর দো'আকে দীর্ঘায়িত করতে থাকবে। এটাও দো'আয় সীমালঙ্ঘন যে, দো'আকে সীমাতীত দীর্ঘ করবে; যেমনটি কোথাও কোথাও আজকাল দেখা যাচ্ছে।

এগার. পাপীদের দ্বারা দ্বীনের সাহায্য হওয়া

আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছু সংখ্যক খ্রিস্টান ও মুশরিক ইয়াতীমদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব নিচ্ছে। এমনকি মসজিদ বানানোর জন্য তাদের সাহায্য চাওয়া হচ্ছে

কিংবা তারাও তাতে অংশ গ্রহণ করতে চাচ্ছে। কোথাও কোথাও জাতিসংঘ গরীব মুসলমানদের সাহায্য করার পরিকল্পনা গ্রহণ করছে।
অনেক জায়গায় জঘন্য বাতিল মতবাদীরা ধর্মীয় কাজের নামে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। রসূল-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

سَيَشَدَّدُ هٰذَا الدِّيْنُ بِرِجَالٍ لَيْسَ لَهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ خَلَاقٌ

অর্থাৎ অবিলম্বে এ দ্বীন-ই ইসলাম মজবুত হবে এমনসব লোকের মাধ্যমে, আল্লাহর দরবারে যাদের কোন অংশ নেই।

বার. মসজিদগুলোতে শোরগোল হবে

মসজিদে দুনিয়াবী কথাবার্তা অবৈধ ও গুনাহ্; কিন্তু এখন আমরা দেখতে পাই যে, মসসিদগুলোতে উঁচু আওয়াজে অশালীন ভাষায় কথাবার্তা শোরগোল, ঝগড়া ও বাক-বিতণ্ডা হচ্ছে। অনেকে দক্ষ, হক্কানী- রাববানী ওলামা ও ওয়া 'ইযদের ওয়ায-বক্তব্যের মাঝখানে এবং মসজিদের অভ্যন্তরে নানাভাবে দুঃসাহস দেখাচ্ছে।

অদৃশ্যের সংবাদদাতা হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন ক্বিয়ামতপূর্ব অনেক আলামত

তের. কিছু সংখ্যক লোককে তাদের অনিষ্টের ভয়ে সম্মান করা হবে

ক্বিয়ামতের পূর্বে এমন এক যুগ আসবে যখন লোকেরা যালিম ও পাপী লোকদের ঘৃণা করার পরিবর্তে তাদের সম্মান করবে। এ সম্মানও করা হবে আন্তরিকতার সাথে নয়, বরং তাদের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য। যেমন, নিরাপদ অবস্থায় এবং আন্তরিকতার প্রশ্নে বলা হয়- লোকটি যালিম, অপরাধী, পাপী, তবে সরকারি চাকুরি করে কিংবা তার আত্মীয় পুলিশের লোক, অথবা সরকারের মন্ত্রী তার বন্ধু। সুতরাং তাকে সম্মান করা হয়, কাঁধের উপর তুলে নেয়া হয়। পক্ষান্তরে সম্মানের উপযোগী হক্কানী-রব্বানী আলিম-ওলামার মানহানি করা হবে, আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীদেরকে গালি পর্যন্ত দেওয়া হবে। (অবশ্য বাতিলপন্থী ও আলিমবেশী ভণ্ড লোকেরা কখনো সম্মানের উপযোগী নয়।)

চৌদ্দ. শিক্ষাদান ও শিক্ষার্জন করা হবে নিছক দুনিয়া উপার্জনের জন্য

স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষাদান ও গ্রহণের মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে পার্থিব জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া; এখানে দ্বীনের সেবা করার উদ্দেশ্য খুবই বিরল ব্যাপার। আর মাদরাসাগুলোর শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য থাকা চাই দ্বীনের সেবা। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের কলেমা বা বাণীকে প্রতিষ্ঠা করা ও ধর্মের মহিমাকে বুলন্দ করা। ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে এটাই এ শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে। পবিত্র ক্বোরআন ও হাদীসে এর বহু ফযীলতও বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে নিছক দুনিয়া-তালাশের জন্য দ্বীনী শিক্ষার্জনের বিপক্ষে হাদীস শরীফে এর অশুভ

পরিণতির কথা এরশাদ হয়েছে। কিন্তু ক্বিয়ামতের পূর্বে মাদরাসার শিক্ষার্থীরাও শিক্ষার্জন করবে শুধু দুনিয়া তালাশের জন্য; শরীয়তের বিষয়াদির শিক্ষা অর্জন করা এবং দ্বীন-ইসলামের প্রসার ঘটানোর উদ্দেশ্য তাদের মধ্যে থাকবে না।

পনের. প্রকাশ্যে অশ্লীলতা, নাচগান, সিনেমা-প্রদর্শনী ও মদ্যপান ইত্যাদি চলতে থাকবে

বলাবাহুল্য, এসব অপকর্ম এখন প্রকাশ্যে চলছে। এগুলো করতে গিয়ে লজ্জাবোধও; সংকোচবোধতো লোপ পেয়েছে, বরং স্থান বিশেষ এগুলোকে সংস্কৃতি বলে চালানোর অপপ্রয়াস চালানো হচ্ছে।

ষোল. ফিৎনার বহিঃপ্রকাশ

হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে- وَأَنْ تَظْهَرَ الْفِتَنُ (এবং ফিৎনাসমূহ প্রকাশ পাবে)। সহীহ্ বোখারী শরীফে 'পূর্বাঞ্চলে ফিৎনাসমূহ প্রকাশ পাবার বর্ণনা সম্বলিত অধ্যায়'- এ এবং এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'ফাত্হুল বারী'তে বর্ণিত হয়েছে, হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছেন, তখন তিনি পূর্বমুখী ছিলেন, اَلَا اِنَّ الْفِتَنَ هٰهُنَا (সাবধান, ফিৎনাসমূহ এ দিকে)। مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ (ওখান থেকে শয়তানের শিং তথা শয়তানের দল) বের হবে। মুহাদ্দিসগণ বলেছেন- এ পূর্বাঞ্চল বলতে 'নজদ'ও হতে পারে। আর 'শয়তানের শিং' (বা দল) মানে 'মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাবের ওহাবী মতবাদ ও এর অন্ধ অনুসারীরা।' বস্তুত তারা আজ পবিত্র হেজাযভূমির প্রচুর সম্পদ আয়ত্ব করে এক নতুন ধর্ম প্রচার করছে, যাতে মনগড়াভাবে বিশ্বের মুসলমানদেরকে বিদ্'আতী, এমনকি 'মুশরিক' ফাত্ওয়া দিয়ে নানা ফিৎনার জন্ম দিচ্ছে। তাদেরই মদদ পেয়ে বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোতে জঙ্গীবাদীরা, কওমী, হেফাজতী-ওহাবীরা আশ্কারা পাচ্ছে। তাছাড়া, মসীহ্-ই দাজ্জাল এবং ইয়াজুজ-মাজূজ ও পূর্বাঞ্চল (যথাক্রমে ইসফাহান ও জর্জিয়া) থেকে বের হবার প্রমাণও পাওয়া যায়। [সূত্র. মু'জিযাতুল রসূল, কৃত. ড. মোস্তফা মুরাদ, মিশর]

সতের. লোকেরা দামী দামী গাড়িতে চড়ে মসজিদে আসবে, কিন্তু তাদের নারীরা থাকবে বেপর্দা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নবূয়তের প্রমাণাদির একটি তাঁর এ ভবিষ্যদ্বাণীও যে, তিনি এরশাদ করেন, শেষ যমানায় আমার উম্মতের মধ্যে কিছু লোক এমনও হবে যে, তারা বড় বড় গাড়িতে চড়ে আসবে আর মসজিদগুলোর দরজায় নামবে; অথচ তাদের নারীরা কাপড় পরবে সত্য; কিন্তু থাকবে নগ্নপ্রায়। [তিরমিযী শরীফ]

আঠার. সময় দ্রুত অতিবাহিত হবে

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ক্বিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে না যতক্ষণ না সময় পরস্পর কাছাকাছি হবে। (অর্থাৎ দ্রুত অতিবাহিত হয়ে যাবে।) এ কাছাকাছি হওয়া দু'প্রকার: ১. সময়ের বরকত চলে যাবে। এটা প্রত্যেক বিবেকবানই বুঝতে পারবে। সুতরাং তুমি যেসব কাজ দশবছর যাবৎ একদিনে সম্পন্ন করতে, তা এখন সম্পন্ন করতে তদপেক্ষা বেশিদিন লেগে যায়। ২. বাস্তবেও এ সময় দ্রুত অতিবাহিত হবে। সুতরাং এক বছর হবে এক মাসের মতো, মাস হবে সপ্তাহর মতো, আর ঘন্টা হবে আগুনের স্ফুলিঙ্গের মতো। দ্বিতীয়টা অবশ্য এখনো সংঘটিত হয়নি।

ঊনিশ. খারেজী সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশ

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "শেষ যুগে এমন এক সম্প্রদায় আসবে, যারা হবে অল্প বয়স্ক, চিন্তা-ভাবনায় নির্বোধ, কথা বলবে সৃষ্টিকুল শ্রেষ্ঠ মহান ব্যক্তির ভাষায় (নবী করীমের হাদীস বলবে বেশী পরিমাণে), তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেমন ধনুক থেকে তীর বের হয়ে যায়। ঈমান তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। সুতরাং তাদেরকে কতল করে ফেলবে। কারণ, তাদেরকে কতল করলে ক্বিয়ামত দিবসে ওই কতলের সাওয়াব দেওয়া হবে।" এরা হলো খারেজী ফির্কা। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর খিলাফতকালে তাদের আত্মপ্রকাশ ঘটে গেছে।

বিশ. মানুষ মৃত্যু কামনা করবে

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন- ক্বিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ না এক লোক অন্য লোকের কবরের পাশ দিয়ে যাবে, অতঃপর বলবে, "আহা! আমি যদি তার (কবরস্থ ব্যক্তি) জায়গায় (কবরে) থাকতাম!" এটা কামনা করবে বিভিন্ন বালা-মুসিবতে আক্রান্ত হবার কারণে। উল্লেখ্য, এ আলামত সংঘটিত না হলে সহসা সংঘটিত হবে।

একুশ. নারীদের ঘর থেকে বের হয়ে পড়া

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- আমি দু' ধরনের দোযখী দেখেছি-১. এমন এক সম্প্রদায় (জনগোষ্ঠী), যাদের সাথে গাভীর লেজের মতো চাবুক থাকে, যেগুলো দ্বারা তারা মানুষকে প্রহার করে। ২. কতগুলো নারী, যারা কাপড় পরিহিতও, নগ্নও, অহংকারীর মতো চলাফেরাকারীনীও। তাদের মাথাগুলো হবে উটের উঁচু উঁচু পিঠের মতো। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এমনকি জান্নাতের খুশ্‌বুও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধি বহু দূর পর্যন্ত ছড়াবে।

উল্লেখ্য, 'কাপড় পরিহিতা ও উলঙ্গ নারী' মানে- তারা আল্লাহর নি'মাতরাজি

ভোগ করবে; কিন্তু আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না। অথবা কাপড়-চোপড় এমনভাবে পরবে যে, তাদের কতেক অঙ্গ ঢাকা থাকবে, আর কতেক অঙ্গ থাকবে খোলা। অথবা অর্থ এযে, বাহ্যিকভাবে পূর্ণ দেহে কাপড় পরবে, কিন্তু সেগুলো এত পাতলা ও স্বচ্ছ হবে যে, বাস্তবিকপক্ষে তাদের অঙ্গগুলো দেখা যাবে।

বাইশ. মসজিদে অহংকার করবে

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- "ক্বিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে না যতক্ষণ না লোকেরা মসজিদগুলোতে পরস্পর অহংকার করবে।" অর্থাৎ বলবে, 'আমাদের মসজিদ তোমাদের মসজিদ অপেক্ষা উত্তম-সাজ-সজ্জাও আকারে। এ অহংকার দ্বীনী ও জনহিতকর কর্মকাণ্ডে করা হবে না।

তেইশ. লোকেরা চুলে কালো রং লাগাবে

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, শেষ যামানায় এক জনগোষ্ঠী হবে, যারা চুলে কালো খেযাব (রং) লাগাবে। তারা বেহেশতের খুশ্‌বুও পাবে না। অর্থাৎ তারা তাদের চুলগুলোকে এবং তাদের বার্দ্ধক্যকে কালো খেযাব (রং) দ্বারা পরিবর্তিত করবে; যেমনটি বর্তমানযুগে করা হচ্ছে।

চব্বিশ. দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা জ্বলন্ত অঙ্গার হাতের মুঠোয় ধারণ করার মত হবে

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "মানুষের উপর এমন এক যুগ আসবে, যখন দ্বীনের উপর ধৈর্যধারণকারী হাতের মুঠোয় জ্বলন্ত অঙ্গার ধারণকারীর মতো হবে।" (অর্থাৎ এটা তার জন্য এতোই কষ্টকর হবে।)

পঁচিশ. নামাযের মধ্যে বিনয় ও একাগ্রতা চলে যাবে

তুমি মসজিদে প্রবেশ করা মাত্র দেখবে এমন মুসল্লীও সেখানে আছে, যারা নামাযের মধ্যে কাপড় নিয়ে অনর্থক কাজ করছে, অথবা হাত নাড়ছে, চেহারায় হাত বুলাচ্ছে, হাতের আস্তীন উপরের দিকে তুলছে। কেউ কেউ টাকা পয়সার হিসাব করছে। তাও নামাযের অভ্যন্তরে। এমনটি করছে তাদের দুনিয়ার প্রতি অতি আসক্তি ও আখিরাতকে ভুলে যাবার কারণে।

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, এ উম্মত থেকে সর্বপ্রথম তুলে নেয়া হবে একাগ্রতা। এমনকি নামাযে কোন একাগ্রচিত্ত ব্যক্তিকেই দেখতে পাবে না। আল্লাহ রক্ষা করুন! আমিন।

বিশ্বনবীর ইল্‌মে গায়ব

ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঘটনা। ইয়ামেন ও তায়েফের যুবকদের মধ্যে একটা প্রথা প্রচলিত ছিলো যে, তারা মানুষের চলাচলের পথ ও রাস্তাগুলোর ধারে বসে পূর্ববর্তী যুগের কিস্‌সা-কাহিনী আলোচনা করতো এবং পথচারীদের শোনাতো। একদিন তারা এ কাজে রত ছিলো। ইত্যবসরে অদৃশ্য থেকে বলা হলো-

''ওহে উদাসীন যুবকরা! লজ্জাবোধ করো। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছেন; অথচ তোমরা তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ করছো না!''

যুবকরা ভয় পেয়ে গেলো। তারা ওখান থেকে পালিয়ে তাদের বয়োবৃদ্ধ মুরব্বীদের নিকট গিয়ে ঘটনা ও আহ্বানের কথা জানালো। বড়রা বললেন, '' আহ্বানের বাস্তবতা খুঁজে বের করা দরকার।'' সুতরাং তাঁরা এক জ্ঞানী-ভাষাবিশারদকে আটটা উট ও বিভিন্ন ধরনের হাদিয়া-তোহফা সহকারে মক্কা মুকার্‌রামাহ্‌ পাঠালেন। আর বললেন, ''হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে খুব গভীরভাবে যাচাই করবে। তুমি যদি নিশ্চিত হও যে, তিনি নবী, তবে উটগুলো সহকারে এসব সামগ্রী তাঁর খিদমতে হাদিয়া হিসেবে পেশ করবে। আর যদি বাস্তবাবস্থা এর বিপরীত হয়, তবে মক্কায় এসব মাল-সামগ্রী বিক্রি করে ফিরে আসবে।''

এরপর লোকটা মক্কা মুকার্‌রামায় ওইভাবে প্রবেশ করলো। ঘটনাচক্রে সর্বাগ্রে আবূ জাহলের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়ে গেলো। সে আবূ জাহলকে বললো, ''মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে তোমার অভিমত কি?'' আবূ জাহল বললো, ''তিনি তো মিথ্যুক, কলাকৌশলবাজ।'' (না'ঊযুবিল্লাহি মিন যালিকা) এবার আবূ জাহল আগন্তুককে বললো, ''তুমি মক্কায় কি জন্য এসেছো?''আগন্তুক সম্পূর্ণ ঘটনা ও তার আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বললোঃ

''আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়ার জন্য আমাকে পাঠিয়েছে।'' আবূ জাহ্‌ল বললো, ''আমি তোমার সমস্ত সামগ্রী কিনে নিলাম। এর বিনিময়ে আমি তোমাকে চার হাজার দিনার দিচ্ছি। তবে শর্ত হচ্ছে তুমি এ মুহূর্তেই মক্কা ছেড়ে চলে যাবে। আমি আশংকা করছি যে, যদি তোমার সাক্ষাৎ

মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে হয়ে যায়, তবে তুমি তার জালে আটকা পড়ে তোমার মাল-সামগ্রী হারিয়ে বসবে।'' একথা বলে আবূ জাহল আগন্তুকের সমস্ত মাল-সামগ্রী নিয়ে নিলো।

আগন্তুক আবূ জাহলকে সমস্ত মাল-সামগ্রী দিলেও হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ তার মনে আরো বহুগুণ বেড়ে গেলো। সুতরাং সে এবার মক্কা মুকাররামায় প্রদক্ষিণ করতে লাগলো। ইত্যবসরে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সাথে তার সাক্ষাৎ হলো। আগন্তুক তাকে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, ''আমি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কী প্রশংসা করবো! তাঁর প্রশংসার যথাযথ ভাষা আমার জানা নেই। সংক্ষেপে এতটুকুই বলবো যে, তিনি হলেন আরবের সব চেয়ে বড় ভাষা বিশারদ ও গোটা সৃষ্টির জন্য গৌরবের পাত্র।'' হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আরো বললেন, ''তুমি কি তাঁর সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ পোষণ করছো?'' লোকটি বললো, ''আমি এজন্যই তো এসেছি।'' একথা শুনে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তার হাত ধরে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে নিয়ে গেলেন।

তাকে দেখা মাত্র হুযূর-ই আন্‌ওয়ার বললেন, ''তোমার রোয়েদাদ (অবস্থা) কি তুমি বলবে, না আমি বলবো?'' আল্লাহর নবীর ইল্‌মে গায়েবের ঝলক দেখার জন্য লোকটার মন ব্যাকুল হয়ে ওঠলো। সে বললো, ''আপনি বলুন, আর আমি তাতে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাসের অমূল্য সম্পদ নিয়ে যাবো।'' তার একথা শুনে হুযূর-ই আন্‌ওয়ার তার পূর্ণ ঘটনা শুরু থেকে এ পর্যন্ত বলে দিলেন। ইতোপূর্বে তাঁকে এ সম্পর্কে অবহিত করা হয়নি অথচ কোন রূপ কমবেশী ছাড়াই তিনি পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করেছেন- এটা শুনে লোকটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে ওঠলো- ''লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লা-হ্‌''

এরপর হুযূর-ই আকরাম বললেন, ''আমার সাথে চলো। আবূ জাহলের নিকট থেকে তোমার মাল-সামগ্রীগুলো ফেরৎ নেয়ার ব্যবস্থা করি।'' সুতরাং তিনি সাহাবা-ই কেরামকে সাথে নিয়ে আবূ জাহলের ঘরের দিকে গেলেন। ঘরের নিকটে পৌঁছলে আবূ জাহল তার ঘরের জানালা দিয়ে তাঁদের দেখে ফেললো আর তাৎক্ষণিকভাবে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলো। ওদিকে তার ঘরের অঙ্গিনায় একটা বড় পাথর ছিলো। আবূ জাহল তার ক্রীতদাসকে বললো, ''আমার সাথে মিলে এ পাথরটা তোলো।'' তার উদ্দেশ্য ছিলো, ঘরের ছাদের উপর পাথরটা তুলে নেবে এবং সুযোগ বুঝে হুযূর-ই আনওয়ারের শির মুবারকের উপর পাথরটা ফেলে দেবে। কিন্তু আল্লাহ্‌ পাকের নিকট তার

এ নাপাক ইচ্ছা পছন্দই হলো না। সুতরাং ঘটনা ঘটে গেলো তার বিপরীতটা। তোলার সময় ক্রীতদাসের হাত থেকে পাথরটা ফসকে আবূ জাহলের হাতের উপরই পড়লো। আবূ জাহলের হাত থেতলে গেলো। এবার ব্যাথার চোটে সে আর্ত চিৎকার আরম্ভ করলো। আর ফরিয়াদীর সুরে বললো, ''মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)! আমার হাতটা ঠিক করে দিন! তাহলে আমি আপনাদের সমস্ত মাল-সামগ্রী ফেরত দেবো।''

হুযূর-ই আকরামের ইচ্ছায় আল্লাহ্ তা'আলা তাৎক্ষণিকভাবে আবূ জাহলের হাত সুস্থ করে দিলেন। তারপর সে দরজা খুললো। কিন্তু আগন্তুকের মালগুলো ফেরত দেয়ার ব্যাপারে তার উদ্দেশ্যের ব্যত্যয় ঘটলো। সে গড়িমসি করতে লাগলো। তখন সে হঠাৎ একজন ভয়ানক হাবশী লোক তার সামনে দেখতে পেলো। ওই হাবশী তাকে বললো, ''ওহে অভিশপ্ত ! প্রাণে বাঁচতে চাইলে সমস্ত মাল-সামগ্রী ফেরত দাও! অন্যথায় এক্ষুণি তোর মাথা ঘাড় থেকে পৃথক করে ফেলবো।'' আবূ জাহল ভয়ে কাঁপতে লাগলো আর সমস্ত মাল ফিরিয়ে দিলো। হুযূর ফিরে তাশরীফ নিয়ে গেলেন।

এদিকে আবূ জাহলকে তার দলের লোকেরা বললো, ''বোকা! তুমি মালগুলো ফেরত দিলে কেন?'' আবূ জাহল বললো, ''যাকিছু তোমাদের চোখের অন্তরালে আমি দেখেছি, তা যদি তোমারাও দেখতে, তবে তোমরা আমাকে এ প্রশ্নটা করতে না।'' আবূ জাহল একথা বলে, সে যাকিছু দেখেছে সবটুকু তার দলের লোকদের বললো। ওদিকে যুবকটি খুশী মনে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট গিয়ে ইসলামের মহিমা প্রচার করলো আলহামদুলিল্লাহ্! [সূত্র জামে'উল মু'জিযাত]

দয়া যখন হয়ে যায়!

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুবারক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেছেন। এক বছর তিনি হজ্জ করার জন্য মক্কা মুকার্‌রামায় পৌঁছলেন। তিনি বলেন, হাতীম শরীফে এক পর্যায়ে আমাকে নিদ্রা পেয়ে গেলো। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। আমার সৌভাগ্য জাগ্রত হলো। ঘুমে আমি আমার আক্বা ও মাওলা রূসূল-ই আকরাম সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাক্ষাৎ লাভ করে ধন্য হলাম। হুযূর-ই আকরাম আমাকে স্বপ্নে বললেন, ''আবদুল্লাহ্! বাগদাদে ফিরে গেলে অমুক মহল্লায় গিয়ে বাহরাম অগ্নিজূজারীকে তালাশ করে তাকে আমার সালাম বলবে আর বলবে, ''আল্লাহ্ তা'আলা তোমার উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন।''

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুবারক বললেন, ''আমি জাগ্রত হতেই 'লা-হাওলা' পড়ে নিলাম। আর ভাবলাম এটা শয়তানের কোন প্ররোচনা কিনা। কারণ,

কোথায় রসূলে আকরাম, আর কোথায় এক আস্ত অগ্নিপূজারী? হুযূর অগ্নিপূজারীকে কীভাবে সালাম বলতে পারেন? আরো ভাবলাম, 'শয়তানতো হুযূর-ই আকরামের আকৃতি গ্রহণ করে ধোঁকা দিতে পারে না? সুতরাং আমি ওযূ করলাম। নামায পড়লাম এবং কা'বা মু'আয্যামার চতুর্পাশে কয়েকবার প্রদক্ষিণ (তাওয়াফ) করলাম। আবার আমার চোখে ঘুম আসলো। আমিও ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নে পুনারয় হুযূর-ই আকরামের সাক্ষাৎ লাভ করে ধন্য হলাম। তিনি তিন বার একই নির্দেশ দিলেন।

সুতরাং আমি হজ্জ সমাপন করে বাগদাদ ফিরে গেলাম। আর ওই মহল্লা ও ঘর তালাশ করলাম এবং উক্ত ঠিকানায় পৌঁছে গেলাম। উক্ত ঘরে এক বৃদ্ধলোককে দেখলাম। এবার কথোপথন আরম্ভ করলাম-

: বাহরাম অগ্নিপূজারী কি আপনি?

: জ্বী- হাঁ! বলুন, কী বলতে চান!

: হে বাহরাম! বলুনতো আপনি কি এমন কোন কাজ করেছেন, যা আপনার মতে নিশ্চিতভাবে নেক্ কাজ?

: জ্বী-হাঁ! আমি এমন একটি কাজ করেছি।

: তাহলে বলুন তো কাজ কি ছিলো?

: শুনুন, আমার ঔরশে চারটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। আর চারজন পুত্র সন্তানও জন্ম লাভ করেছে। আমি এ চার পুত্রের সাথে আমার চার কন্যার বিবাহ দিয়েছি। এটা আমার মতে আমার বড় নেক্ কাজ।

: এটা কি কোন নেক্ কাজ হলো? আপনি কেমন পিতা! আপন পুত্রদের সাথে তাদের সহোদর (বোন)দের বিবাহ দিয়েছেন? আচ্ছা, এটা ছাড়ুন। বলুন এটা ব্যতীত অন্য কোন নেক্ কাজ আপনার মতে করেছেন কিনা? করে থাকলে বলুন!

: তাহলে শুনুন, আরেকটা নেক্ কাজ! আমার আরেকটা কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলো, যে এতো সুন্দরী যে, চাঁদ-সূর্য তার সৌন্দর্যের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। তার সাথে মানায় এমন কোন পাত্র না পেয়ে আমি নিজেই তাকে বিয়ে করে ফেলেছি।(না'ঊযুবিল্লাহ্)

: লা-হাওলা ওয়ালা-ক্বুওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম।'' এতো সীমালংঘনের উপর সীমালংঘন!

: (হে আবদুল্লাহ্!) শুনুন তো! এখানে কথা শেষ হয়নি। আমার কন্যার সাথে বিয়ে করে আমি সাথে সাথে ওলীমা'র আয়োজন করেছি। তাতে এক হাজারেরও বেশী অগ্নিপূজারী অংশগ্রহণ করেছে।

: আরেকটু চিন্তা করে বলুন! (এ গুলোর তো একটাও নেক কাজ নয়) অন্য কোন কাজ নেকী হিসেবে করেছেন কিনা!

: (বাহরাম বললেন,) তাহলে শুনুন! আমি আমার কন্যাকে বিবাহ করে তার সাথে বাসর রাত অতিবাহিত করেছিলাম। আমার এক প্রতিবেশী মুসলিম রমণী চেরাগ জ্বালানোর জন্য আমার ঘরে আসলো। আমি তাকে চেরাগ জ্বালিয়ে দিলাম। কিছুক্ষণ অতিবাহিত হতে না হতে মহিলাটা আবার নিভে যাওয়া চেরাগ নিয়ে তা জ্বালানোর জন্য আসলো। আমি এবারও তা জ্বালিয়ে দিলাম। কিছুক্ষণ যেতে না যেতে সে আবারও নিভে যাওয়া চেরাগ নিয়ে আসলো। আমি ভাবলাম মহিলাটা হয়তো চোরের দলের চর হিসেবে বারংবার আমার ঘরে এ অজুহাতে আসছে, নতুবা অন্য কোন কারণে এর মধ্যে কাল ক্ষেপন করছে।' সুতরাং আমি এবার তার চেরাগটা জ্বালিয়ে দিয়ে তাকে বিদায় করলাম এবং নিঃশব্দে তার অজান্তে তার পেছনে পেছনে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম, এবার সে তার ঘরে ঢুকেছে। তাকে দেখে তার ছোট ছোট সন্তানরা কাঁদতে লাগলো আর বলতে লাগলো, ''মা, খাবার জন্য কিছু এনেছো কিনা; ক্ষুধার যন্ত্রণা তো আর সহ্য হচ্ছে না।''

মহিলাটা বললো, ''বৎসরা আমার! গিয়েছিলাম তো কিছু খাবারের তালাশে। কিন্তু ভিক্ষার হাত প্রসার করতে ও মুখে বলতে লজ্জার অন্তরাল ছিঁড়তে পারিনি। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের কাছে কিভাবে চাইতাম, তাও বাহরামের মতো অগ্নিপূজারীর নিকট? সে তো আল্লাহ্র জঘন্য শত্রু।''

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুবারক বাহরামের কথা মনযোগ সহকারে শুনছিলেন। বাহরামও তার বিবরণ অব্যাহত রাখলেন। বাহরাম বললেন, ''মুসলিম মহিলা ও তার ক্ষুধার্ত সন্তানদের কথোপকথন আমি চুপিসারে শুনেছিলাম। তারপর আমি আমার ঘরে ফিরে এলাম এবং এক থালা খাদ্য ও কিছু পানীয় নিয়ে মহিলাটার ঘরে ফিরে এলাম এবং নিজ হাতে তার ক্ষুধার্ত সন্তানদের পানাহার করালাম।''

বাহরাম এ ঘটনা শেষ করতেই হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুবারক তাঁর স্বপ্নের কথা শুনিয়ে বললেন, ''নিঃসন্দেহে এ শেষোক্ত কাজটা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট একটি নেক কাজ। বাহরাম, আপনি ধন্য। আল্লাহ্রই মহানতম প্রতিনিধি বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপনাকে সালাম পাঠিয়েছেন। আর সুসংবাদ দিয়েছেন আল্লাহ্ আপনার উপর সন্তুষ্ঠ হয়েছেন।

বাহরাম একথা শুনে হতবাক! আনন্দে আত্মহারা! আর বলে উঠলেন, ''কোথায় আমি, কোথায় বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সালাম! আল্লাহু আকবার!''

একথা বলে বাহরাম বেঁহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। হুঁশ ফিরে আসলে তার মুখ থেকে কলেমা-ই শাহাদত উচ্চারিত হলো। এর পরবর্তী মুহূর্তেই তার রূহ তার দেহ থেকে বের হয়ে গেলো।

উল্লেখ্য, ঈমান আনার সাথে সাথে জীবনের সমস্ত বড়-ছোট গুনাহ্ ক্ষমা হয়ে গেলো। তার আমল নামায় আর কোন গুনাহ থাকে না। আর সাথে সাথে মৃত্যু হয়ে যাওয়ার কারণে তার উপর অন্য কোন অনুশাসন (শরীয়তের বিধান)ও তার উপর বর্তায়। সুতরাং বাহরামও নিঃসন্দেহে বেহেশতী হয়ে গেলো।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুবারক বলেন, ''আমি নিজে বাহরামকে গোসল দিয়েছি, কাফন পরিয়েছি, জানাযার নামায পড়িয়েছি এবং দাফন করেছি। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুবারক প্রায়শ বলতেন, ''দান করতে থাকো! দানশীলতা আল্লাহ্র দুশমনকেও তাঁর প্রিয় পাত্রের মর্যাদায় উন্নীত করে দে।

[জামেউল মু'জিযাত]

সরকার-ই দু'আলমের হিজরতের সময়কার কতিপয় মু'জিযা

সরকার-ই দু'আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নুবূয়ত ঘোষণার ত্রয়োদশ সালে মক্কা মুকাররামাহ্ থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করার সিদ্ধান্ত হয়। মাহে রবিউল আউয়াল শরীফের ৫ম তারিখ, বুধবার হুযূর করীম মক্কা মুকাররামার হুজরা শরীফ থেকে বের হলেন আর সওর পর্বতের গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিলেন। এরপর সোমবার গূহা থেকে রওনা দিয়েছিলেন।

হাফেয ইবনে হাজর আস্কালানী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির বর্ণনা মতে, হুযূর করীমের হিজরতের এ যাত্রার কথা হযরত আবূ বকর ও হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা ব্যতীত অন্য কেউ জানতো না। হযরত আবূ বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু পাঁচ হাজার দিরহাম সাথে নিলেন। 'ক্বাস্ওয়া' অথবা 'জাদ'আ' নামের উটনী প্রস্তুত রাখা হলো। আবদুল্লাহ্ ইবনে উরায়ক্বিত্ব নামের এক ব্যক্তিকে পারিশ্রমিকের উপর মদীনা মুনাওয়ারার পথ দেখানোর খিদমতের জন্য নিয়োগ করলেন। লোকটি পথ দেখানো ও রহস্যের গোপনীয়তা রক্ষায় প্রসিদ্ধ ছিলো।

বর্ণনাদিতে রয়েছে যে, হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম আসলেন আর আল্লাহর হুকুম শুনালেন- اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكَ بِالْهِجْرَةِ (নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আপনাকে হিজরতের নির্দেশ দিচ্ছেন।) হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পরদিন ভোরে হিজরত আরম্ভ করবেন। সুতরাং তিনি হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে নির্দেশ দিলেন, ''রাতে আমার বিছানার উপর শয়ন করবে, যাতে মুশরিকগণ সন্দেহে পড়ে থাকে এবং বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে জানতে না পারে। তদুপরি, মক্কার মুশরিকরা হুযূর-ই আকরামকে 'আল-আমীন' (আমানতদার, বিশ্বাসী) বলে বিশ্বাস করতো এবং তাঁর নিকট তাই তাদের অনেকে তাদের সম্পদ আমানত রেখেছিলো। পরদিন হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাদের আমানতগুলো আমানতকারীদেরকে ফের দিয়ে যেতে পারবেন। ফলে তাদের ওই বিশ্বাস অটুট থাকবে। সুতরাং হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুও তাই করলেন। তিনি ওই চাদর শরীফ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন, যা খোদ হুযূর-ই আকরাম গায়ে দিয়ে শয়ন করতেন। এটা এ কথার প্রমাণবহ যে, হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুই সর্বপ্রথম হুযূর-ই আকরামের ভালোবাসায় নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন, হুযূর-ই আকরাম ও হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজ্হাহুল করীমকে বলেছিলেন, ''নিজের হৃদয়কে শক্ত

রাখো! কারণ, কাফিরগণ তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।''

গভীর রাতে যথাসময়ে হুযূর-ই আকরাম আপন শির মুবারকে চাদর শরীফ মুড়ি দিয়ে ঘরের বাইরে তাশরীফ আন্লেন, তখন আল্লাহ তা'আলা বাইরে অবরোধকারী মুশরিকের চোখগুলো অন্ধ করে দিয়েছিলেন। তা এভাবে যে, হুযূর আকরাম তখন একমুষ্ঠি (পাথরময়) মাটি নিয়ে মুশরিকদের দিকে নিক্ষেপ করলেন, তখন তাদের প্রত্যেকের মাথায় ও চোখে গিয়ে ওই মাটির কণাগুলো পড়েছিলো। প্রসঙ্গত ইমাম হাকিম বর্ণনা করেন যে, এ মাটি কণা শুধু সেদিন প্রতিটি মুশরিককে ব্যর্থ করে নি বরং তাদের প্রত্যেকে বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে নিহতও হয়েছিলো।

এমনও বর্ণিত আছে, হুযূর-ই আকরাম ঘরের বাইরে তাশরীফ আনলেন আর দেখলেন আবূ জাহ্ল হুযূর করীমের একটি নূরানী বাণী নিয়ে অবরোধকারী লোকদের মধ্যে ঠাট্টাবিদ্রূপ করছে। তখন হুযূর করীম একমুষ্ঠি মাটি নিয়ে তাদের দিকে নিক্ষেপ করেছিলেন। ওই মাটির কণাগুলো তাদের প্রত্যেকের চোখে ও মাথায় গিয়ে পড়ে। ফলে তারা সেটার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়লো। তাদেরই সামনে দিয়ে আমাদের আক্বা ও মাওলা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে গেলেন। তখন তাদের নিকট একজন লোক এসে বললো, ''তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি করছো?'' তারা বললো, ''ভোর হবার জন্য অপেক্ষা করছি, (হযরত) মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে কতল করবো।'' সে বললো, ''আফ্সোস্ তোমাদের জন্য! তিনি কি (হযরত) মুহাম্মদ ছিলেন না, যিনি তোমাদের সামনে দিয়ে বের হয়ে গেছেন?'' তখন আবূ জাহ্ল ও তার সাথীরা দারুণভাবে লজ্জিত হলো।

হুযূর করীম প্রথমে হযরত আবূ বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর ঘরে তাশরীফ আন্লেন। তিনি অনেক আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন। কারণ, প্রায় দু'মাস আগে হুযূর করীম তাঁকে জানিয়েছিলেন, ''হিজরতের সময় ঘনিয়ে এসেছে, তোমাকে আমার সফরসঙ্গী হিসেবে পেতে চাই।'' ওইদিন থেকে সিদ্দীক্ব-ই আকবর প্রতিদিন রাতে হুযূর করীমের আহবানের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি সহকারে অপেক্ষামান থাকতেন। সুতরাং তাঁর ঘরের পেছনের জানালা দিয়ে উভয়ে বের হয়ে পড়লেন। ওই ঘর, ওই জানালা মুবারকসহ দীর্ঘদিন স্মৃতি হিসেবে সংরক্ষিত হয়েছিলো।

রাত ছিলো ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন। অন্ধকার ভেদ করে তাঁরা সওর পর্বতের দিকে রওনা হলেন। এ সুউচ্চ পাহাড়ের প্রায় চূড়ায় ছিলো একটি ঐতিহাসিক গূহা। সেখানেই যাত্রা বিরতি করার সিদ্ধান্ত ছিলো। রাতের আধাঁরে এমন দুর্গম পথ অতিক্রম করে তাঁরা পাহাড়ের পাদদেশে তাশরীফ নিলেন। মুহাক্কিক্ব দেহলভী লিখেছেন, পথিমধ্যে হুযূর-ই করীমের পা মুবারকে জখমও লেগেছিলো। হযরত সিদ্দীক্ব-ই আকবার আপন কাঁধে করে হুযূর করীমকে ওই পাহাড়ে উঠিয়েছিলেন

এবং গুহার মুখে গিয়ে পৌঁছলেন। প্রথমে হযরত আবূ বকর গূহায় প্রবেশ করলেন। গুহার ভিতর কোন কষ্টদায়ক প্রাণী (সাপ-বিচ্ছু) আছে কিনা দেখতে। দেখলেন তাতে প্রচুর ছোটছোট সুড়ঙ্গ। তিনি তাঁর চাদর ছিঁড়ে প্রায় সব সুড়ঙ্গের মুখ বন্ধ করলেন। কিন্তু একটা সুড়ঙ্গের মুখে দেয়ার জন্য কাপড় অবশিষ্ট নেই। তখন তিনি সেটার মুখে নিজের পায়ের মুড়ি মজবুতভাবে স্থাপন করে গূহার ভিতর বসে গেলেন আর হুযূর-ই আকরামকে ভিতরে তাশরীফ নিয়ে যাবার জন্য আরয করলেন। হুযূর ভিতরে গিয়ে হযরত সিদ্দীক্ব-ই আকবরের রানের উপর মাথা মুবারক রেখে শুয়ে পড়লেন। এ দিকে হযরত আবূ বকরকে সাপ দংশনই করে যাচ্ছিলো; কিন্তু সিদ্দীক্ব-ই আকবার অনড় রইলেন, যাতে হুযূর করীমের ঘুমের ব্যাঘাত না হয়। তথাপি তাঁর অজান্তে চোখের পানি হুযূর করীমের নূরানী চেহারার উপর পড়লে হুযূর জাগ্রত হলেন। আর এ অবস্থার প্রতিকার করে এরশাদ করলেন, ''আবূ বকর! লা-তাহযান। ইন্নাল্লাহা মা'আনা'' (হে আবূ বকর! চিন্তা করো না। আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন)। সাথে সাথে হযরত আবূ বকরের হৃদয়ে প্রশান্তি নেমে আসলো। সাপ-বিচ্ছুর ওই দংশনেরও কোন প্রভাব আর থাকে নি।

এ দিকে ভোরে মুশরিকগণ হুযূর করীমের বিছানা মুবারকে বাস্তবে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে দেখতে পেয়ে হুযূরের সন্ধানে অবিলম্বে বের হয়ে পড়লো। 'ক্বিয়াফাহ্ সেনাস' (যাঁর মাটির উপর পদচিহ্ন দেখে পদচারণাকারীদের সম্পর্কে সংবাদ দিতে পারে) বললো, হুযূর করীম সওর পর্বতের দিকে গেছেন। সুতরাং তারা ওই গূহার দিকে দ্রুত রওনা হলো। ইত্যবসরে, আল্লাহ তা'আলা গুহার মুখের একটি পাহাড়ি গাছ জন্মিয়ে দিলেন। একজোড়া জঙ্গলী কবুতরকে নির্দেশ দিলেন-গূহার মুখে তাৎক্ষণিকভাবে বাসা তৈরি করে তাতে ডিম পেড়ে ডিমে তা দিতে থাকতে। আর মাকড়সা নির্দেশ পেয়ে গূহার মুখ জুড়ে তার জাল (বাসা) বুনে ফেললো। সুতরাং শত্রুরা গুহার মুখে এসে এগুলো দেখে ঘোষণা করলো, গূহার ভিতর কেউ নেই। কারণ, গূহার মুখের গাছটি ছিলো অক্ষত। তদুপরি, গাছটি মনে হচ্ছিলো হুযূর করীম দুনিয়ার আবির্ভূত হবারও পূর্বের। এক বর্ণনামতে হুযূরের পিতারও আগে জন্মেছিলো। মাকড়সার জাল এবং কবুতরের বাসা ও ডিম ছিলো একেবারে অক্ষত। হযরত সিদ্দীক্বে আকবর বলেন, 'মুশরিকরা যদি এসব নিয়ে চিন্তা-ভাবনায় ব্যস্ত না হয়ে তাদের পায়ের দিকেও দেখতো তবে তাঁরা আমাদেরকে দেখে ফেলতো।'' কিন্তু হুযূর আকরাম তখন সিদ্দীক্বে আকবরের উদ্দেশ্যে বললেন, ''তারা দেখবে কি করে, আমরা উভয়ে তো আল্লাহরই কৃপাদৃষ্টিতে রয়েছি।'' উল্লেখ্য, হুযূরের দো'আয় এ কবুতর বংশ পরম্পরায় হেরমে পাকে স্থান পেয়েছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত শিকারীর হাত থেকে রক্ষা পাবে। তাছাড়া, ওই মাকড়সার পূর্বপুরুষরা হযরত দাঊদ আলায়হিস্

সালামের জন্যও এ ধরনের জাল বুনে তাঁর খিদমত আঞ্জাম দিয়েছিলো, যখন যালিম বাদশাহ জালূত তাঁকে তালাশ করেছিলো।

লক্ষ্যণীয় যে, হুযূরের জন্য গূহার মুখে এসব আয়োজনের কারণে তা থেকে বের হওয়া অনেকটা দুষ্কর ছিলো। কিন্তু যখন হুযূরের তা থেকে বের হবার সময় আসলো, তখন হযরত জিব্রাঈল এসে আপন পাখা মেরেছিলেন। ফলে গূহার মুখে প্রশস্ত দরজা হয়ে গেলো। এটাতো হুযূর করীমের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ছিলো। পরবর্তীতেও গুহার ছোট মুখ দিয়ে যেকোনো মোটা কিংবা চিকন স্বাস্থ্যের লোকও তাতে 'বিস্‌মিল্লাহ্' পড়ে ঢুকে পড়তে পারতো। বর্তমানে গুহার মুখে প্রশস্ত দরজা রয়েছে। সম্ভবত লোকেরা সেটাকে নিজেদের সুবিধার জন্য প্রশস্ত করে নিয়েছে। [মাদারিজ]

মোটকথা, সওর পর্বতের গুহায় তিনদিন, কারো কারো মতে বার দিন অবস্থান করার পর হুযূর করীম সিদ্দীক্ব-ই আকবর সহকারে মদীনা মুনাওয়ার দিকে রওনা হলেন। পথ দেখানোর খিদমত আঞ্জাম দেয়ার জন্য আবদুল্লাহ ইবনে উরায়ক্বিত্ব তো ছিলোই। পথিমধ্যে হুযূর করীমের মদীনা মুনাওয়ারা পৌঁছানো পর্যন্ত বহু মু'জিযা প্রকাশ পেয়েছিলো। তন্মধ্যে কয়েকটা সংক্ষেপে পেশ করা হলো-

এক. উম্মে মা'বাদের বৃদ্ধা ছাগী হল দুধেল

পথিমধ্যে 'ফরীদ' নামকস্থানে উম্মে মা'বাদ আতিক্বাহ্ বিনতে খালেদ খোযা'ইয়্যাহ্ নামক এক জ্ঞানী ও বিবেকবান মহিলার তাঁবু ছিলো। তিনি পথচারী ও মুসাফিরদের আতিথ্য করতেন। হুযূর করীম তার তাঁবুতে তাশরিফ নিয়ে গেলেন। হুযূর তার নিকট খেজুর, দুধ ও গোশ্ত তলব করলেন। কিন্তু তখন তার নিকট দুর্ভিক্ষের কারণে কিছুই ছিলো না। হুযূর তার তাঁবুর এক কোণায় একটি অতি দুর্বল ও বৃদ্ধা ছাগী দেখতে পান। জিজ্ঞাসা করলে তারা বললো, সেটা বার্ধক্য ও দুর্বলতার কারণে ছাগলের পালের সাথে চরতেও যেতে পারে নি। তখন হুযূর এরশাদ করলেন, ''তোমার অনুমতি পেলে আমি সেটা থেকে দুধ দোহন করবো।'' মহিলাটা আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললো, ''আমার মাতাপিতা আপনার উপর উৎসর্গ হোন! আপনি তাই করুন!'' হুযূর ধরাশায়ী ছাগীটার এক পা অপর পায়ের উপর চড়িয়ে দিলেন। আর আপন হাত মুবারক সেটার স্তনের উপর রাখলেন। আর আল্লাহ তা'আলার নাম নিয়ে দো'আ করলেন- **اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهَا فِىْ شَاتِهَا** (হে আল্লাহ! তার জন্য তার ছাগীর মধ্যে বরকত দাও!) সাথে সাথে ছাগীর স্তন দুধে ভর্তি হয়ে গেলো। সেটার পা দু'টি পরস্পর পৃথক হয়ে গেলো। হুযূর পাত্র তলব করলেন। সবাইকে দুধ পান করিয়ে তৃপ্ত করলেন। নিজেও পান করলেন। তারপর ছাগীও প্রচুর দুধ রেখে সেখান থেকে রওনা হলেন।

উল্লেখ্য, এর পর উম্মে মা'বাদের স্বামী আবূ মা'বাদ এসে এ অবস্থা দেখে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। উম্মে মা'বাদ হুযূর করীমের গড়ন মুবারক এবং ওই মু'জিযার বর্ণনা দিলেন। এ কথা শুনে আবূ মা'বাদ তাৎক্ষণিকভাবে হুযূরের সাথে মিলিত হবার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। অবশ্য, পরবর্তীতে তাঁরা মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করে ঈমান এনেছিলেন এবং সেখানে অবস্থান করতে থাকেন।

দুই. সুরাক্বাহ্ ইবনে মালিক ইবনে জু'শুমের ভাবান্তর

ক্বোরাইশগণ এদিকে ঘোষণা করলো- যে ব্যক্তি (হযরত) মুহাম্মদ (মোস্তফা) ও তাঁর সাথীকে হত্যা করবে কিংবা বন্দি করে তাদের নিকট নিয়ে আসবে তাকে একশত ওট পুরস্কার দেয়া হবে। তাছাড়া, একাজের জন্য সুরাক্বাহ্ ইবনে মালিককেও নিয়োগ করলো। সুরাক্বাহও পুরস্কারের লোভে তার ঘোড়া হাঁকিয়ে হুযূরের তালাশে বের হয়ে পড়লো। সে হুযূরের একেবারে নিকট গিয়ে পৌঁছলো। হুযূর পেছনে ফিরে সুরাক্বাহ্কে দেখলেন আর দো'আ করলেন, اَللّٰهُمَّ اكْفِنَا شَرَّهٗ بِمَا شِئْتَ (হে আল্লাহ! তোমার ইচ্ছানুসারে আমাদেরকে তার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করো!) সাথে সাথে সুরাক্বাহ্র ঘোড়ার চারটি পা হাঁটু পর্যন্ত মাটির ভিতর গেড়ে গেলো। শত চেষ্টা করেও ঘোড়া পাগুলো তুলে আনতে পারলো না। তখন সুরাক্বাহ্ আরয করলো, ''হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)! আপনি দো'আ করুন যেন আমার ঘোড়ার পাগুলো বেরিয়ে আসে। আমিতো আপনার প্রতি কোন ঔদ্ধ্যতা কবেবো না, আর যে কেউ আপনার পেছনে আপনার তালাশে আসবে তাকে আমি অন্য দিকে ফিরিয়ে দেবো।'' হুযূর করীম দো'আ করলেন, اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ صَادِقًا فَاَطْلِقْ فَرَسَهٗ (হে আল্লাহ! সে যদি এ কথার সত্যবাদী হয়, তবে তার ঘোড়াকে ছেড়ে দাও!) সাথে সাথে তার ঘোড়ার পাগুলোকে মাটি ছেড়ে দিলো। তারপর সুরাক্বাহ্ তার নিকট যেসব অর্থ-সম্পদ ছিলো সবটুকু হুযূরের খিদমতে পেশ করলো। কিন্তু হুযূর তা গ্রহণ করলেন না, বরং বললেন, ''আমার এসবের কিছুর দরকার নেই। তুমি শুধু আমার এ যাত্রার খবরটি গোপন রাখবে।'' উল্লেখ্য যে, তখন সুরাক্বাহর ইসলাম গ্রহণের সময় হয়নি। সে তার গোত্রের একদল লোকসহ পরবর্তীতে, অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের পর হুযূরের দরবারে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। কারণ, সুরাক্বাহ তখনই বুঝতে পেরেছিলো যে, তিনিই সত্য নবী এবং তিনিই জয়ী হবেন-যখন হুযূরের দো'আর পরপর তার ঘোড়ার পাগুলো মাটিতে গেড়ে গিয়েছিলো।

তিন. বুরায়দাহ্ আসলামীর ইসলাম গ্রহণ

আবূ সুলায়মান খাত্তাবী বর্ণনা করেছেন- হিজরতের সময় হুযূর -ই আকরাম যখন মদীনা মুনাওয়ার নিকট পৌঁছে গেলেন, তখন আসলাম গোত্রের নেতা বুরায়দাহ্ আসলামী মক্কার ক্বোরাইশ্দের ঘোষিত পুরস্কারের আশায় এবং তাদের ইঙ্গিতে ৭০ জন লোক নিয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে অগ্রসর হলো। সে নিকটে এসে পৌঁছলে হুযূর করীম জিজ্ঞাসা করলেন-তোমার নাম কি? সে বললো- ''বুরায়দাহ্''। হুযূর আপন সুন্দরতম নিয়মানুসারে ওই নাম থেকে 'ফাল' (ভাল অর্থ) বের করে বললেন- ''আমাদের এ বিপ্লব সহসা সাফল্য পাবে। অর্থাৎ আমাদের কাজে সন্ধি তথা খুশী ও শীতলতার পথ বেরিয়ে আসবে।'' শেষ পর্যন্ত তাই হয়েছে। কারণ, 'বুরায়দাহ্' শব্দটি 'বরূদত' (শীতলতা) থেকে উদ্ভূত। এ থেকে হুযূর করীম শুভ অর্থ ও পরিণতির সংবাদ বের করেছেন। হুযূর তারপর বললেন, ''তুমি কোন্ গোত্রের?'' সে বললো, ''বনী আসলাম-এর'' তখন হুযূর বললেন, سَلِمْنَا (অর্থাৎ আমরা কল্যাণ ও শান্তি পেয়ে গেছি)। কারণ, 'আসলাম' শব্দের মূলে রয়েছে 'সালামত' বা শান্তি। তারপর হুযূর বললেন, তুমি বনী আস্সালামের কোন্ শাখা থেকে?'' সে বললো, ''বনী সাহম থেকে।'' হুযূর বললেন اَصَبْتَ سَهْمَكَ (তুমি তোমার হিস্সা পেয়ে গেছো। অর্থাৎ ইসলামে তোমার যে অংশ রয়েছে তা তুমি পেয়ে গেছো)

অতঃপর বুরায়দাহ্ হুযূরের খিদমতে আরয করলো, ''আপনি কে? হুযূর বললেন, ''আমি মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ, রসূলুল্লাহ।'' হযরত বুরদাহ হুযূরের শুধু নাম শুনেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা তাঁর খাস বান্দা ও রসূল। এমনকি তাঁর সাথে যাঁরা ছিলেন তাঁরাও ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হলেন।

বলাবাহুল্য, হযরত বুরায়দাহ্ তাঁর দলবলসহ নিজের মাথার পাগড়ি দ্বারা একটি শানদার পতাকা তেরি করে সাড়ম্বরে হুযূরের সাথে মদীনা মুনাওয়ারায় প্রবেশ করলেন। সুবহানাল্লাহ! [সূত্র : মাদারিজুন্নুবূয়ত]

হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র আপাদমস্তক শরীফ মু'জিযা

পবিত্র ক্বোরআনের ঘোষণানুসারে আল্লাহ্ তা'আলা জিন্ ও মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন শুধু তাঁরই ইবাদতের জন্য। সুতরাং জিন্ ও মানুষের জীবনাতিপাতের পথে আল্লাহ্র ইবাদত হওয়া চাই মুখ্য, আর বাকী সব কাজ হওয়া চাই গৌণ। কিন্তু মানুষ তার চিরশত্রু ইবলীসের প্ররোচনা এবং তাঁরই চারণ ক্ষেত্র ষড়রিপুর তাড়নায় বারংবার তার মুখ্য উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হতে থাকে। সৌভাগ্যক্রমে,

আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিটি যুগে সৃষ্টির হিদায়তের জন্য প্রেরণ করেছেন অসংখ্য নবী ও রসূল আলায়হিমুস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম থেকে পৃথিবীতে প্রেরণের পর থেকে ক্বিয়ামত অবধি হিদায়তের পরম্পরা মূলত সম্মানিত নবী ও রসূলগণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত। বলাবাহুল্য, এ পরম্পরার পূর্ণতাও ক্বিয়ামত পর্যন্ত স্থায়িত্ব লাভ করেছে ও করবে আমাদের আক্বা ও মাওলা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র ও নূরানী হাতে।

এ পরম সম্মানিত নবী ও রসূলগণের সত্যতা প্রমাণের, অন্যকথায় সত্যনবী ও ভন্ডনবীর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের প্রধানতম উপায় হচ্ছে মু'জিযা। সত্য নবীর মাধ্যমে যেই অলৌকিক ও অস্বাভাবিক কর্ম সম্পন্ন হয় তা-ই মু'জিযা। এতে সন্দেহ নেই যে, মু'জিযা হচ্ছে সত্য নবীর সত্যতার অকাট্য প্রমাণ। পক্ষান্তরে, কোন মিথ্যুক ও ভণ্ডলোক যদি নুবূয়তেরও দাবিদার হয়ে যায়, তবুও তার মাধ্যমে মু'জিযা সংঘটিত হতে পারে না। উল্লেখ্য, তার মাধ্যমে দু'/একটি অস্বাভাবিক ঘটনা প্রকাশ পেয়ে গেলেও তা হয় 'ইস্তিদ্‌রাজ'; কোন মু'জিযার মাধ্যমে সে কখনো তার দাবির সত্যতা প্রমাণ করতে পারে না। এ পর্যন্ত এটাই প্রমাণিত হয়েছে, ক্বিয়ামত পর্যন্তও প্রমাণিত হতে থাকবে।

সুতরাং যখনই কোন নবী-ই পাক (সত্য নবী) থেকে মু'জিযা সংঘটিত হয়েছে, তখন ওই মু'জিযা আল্লাহ্ জাল্লা মাজদুহূ'র এ কথার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে- 'আন্‌তা রসূলী' (তুমি আমার প্রেরিত)। [আল্ ইয়াওয়াক্বীত ওয়াল জাওয়াহীর: ১ম খণ্ড : ১৫৮ পৃষ্ঠা]

প্রত্যেক রসূল ও নবী থেকে কোন না কোন মু'জিযা সংঘটিত হয়েছে। তবে কারো হাতে মু'জিযা ছিলো; যেমন হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম, কারো আসা (লাঠি)তে মু'জিযা ছিলো, যেমন সাইয়্যেদুনা হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম; কিন্তু আমাদের আক্বা ও মাওলা হযরত আহমদ মুজতাবা মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র গোটা সত্তা মুবারকই মু'জিযা। এ কারণে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমান-

يَآ اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا

হে মানবকুল! নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসেছে এবং আমি তোমাদের প্রতি উজ্জ্বল আলো (নূর) অবতীর্ণ করেছি।[৪:১৭৫; তরজমা: কানযুল ঈমান]

আলোচ্য আয়াত শরীফে যে 'বোরহান' (সুস্পষ্ট প্রমাণ) আগমনের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে ওই অকাট্য প্রমাণ হচ্ছেন আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্রতম সত্তা।

[তাফসীর-ই জালালাঈন শরীফ: ৯৩ পৃষ্ঠা]

'বোরহান' (بُرْهَانٌ)-এর আভিধানিক অর্থ 'দলীল'। 'দলীল' ও 'মু'জিযা' সমার্থক। সুতরাং হুযূর মুস্তফার সত্তা মুবারক আপন রবের 'দলীল' এবং তাঁরই

পক্ষ থেকে মু'জিযা। হুযূরের অন্যান্য মু'জিযার কথা উল্লেখ না করলেও এ কথা নিশ্চিতভাবে বলতে হয় যে, হুযূর-ই আক্বদাস স্বয়ং মু'জিযা। এ কারণে অমুসলিমও সরকার-ই আ'যম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র চেহারা-ই আন্‌ওয়ার দেখেই মুসলমান হয়ে যেতো। হযরত সাইয়্যেদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন-

যখন রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মদীনা-ই মুনাওয়ারায় তাশরীফ আনলেন তখন আমি হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র দরবারে আসলাম, যাতে হুযূরকে দেখি।

فَلَمَّا تَبَيَّنْتُ وَجْهَهٗ عَرَفْتُ اَنَّ وَجْهَهٗ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ فَكَانَ اَوَّلُ مَاقَالَ يَآ اَيُّهَا النَّاسُ اَفْشُوا السَّلَامَ وَاَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْاَرْحَامَ وَصَلُّوْا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ ـ

(رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاِبْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِىُّ : مِشْكٰوة صـ١٦٨)

(সুতরাং যখন আমি হুযূরের চেহারা-ই আক্বদাস দেখলাম তখনই আমি বুঝতে পারলাম যে, তাঁর চেহারা-ই আত্বহার কোন মিথ্যবাদীর চেহারা হতে পারে না। তিনি সর্বপ্রথম এরশাদ করেছেন- হে লোকেরা! সালামকে খুব করে প্রসারিত করো, (অভাবীদের) আহার করাও, আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখো, রাতের বেলায় তখন নামায পড়ো, যখন লোকেরা নিদ্রারত থাকে। তাহলে তুমি জান্নাতে প্রবেশ করবে।) [তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্ ও দারেমীর বরাতে মিশকাত: ১৬৮ পৃষ্ঠা]

অনুরূপ, সাইয়্যেদুনা হযরত আবূ রামাসাহ্ তাইমী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দেখা মাত্রই তাৎক্ষণিকভাবে হুযূরের নুবূয়ত সত্য বলে মেনে নিয়ে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, ''আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র দরবারে হাযির হলাম। আমার সাথে আমার এক পুত্রও ছিলো। فَلَمَّا رَأَيْتُهٗ قُلْتُ هٰذَا نَبِىُّ اللّٰهِ
(আমি যখন তাঁকে দেখলাম, তখনই বলে ফেললাম, 'ইনি আল্লাহ্‌র নবী'।)

[শেফা শরীফ : ১ম খণ্ড ১৫৮পৃ., জাওয়াহিরুল বিহার : ১ম খণ্ড ৫৫পৃ]

দেখুন, হযরত আবূ রামাসাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তখনো না হুযূরের কোন মু'জিযা দেখেছেন, না ক্বোরআন- হাদীসের কোন বাণী শুনেছেন। কেবল হুযূরকে দেখেছেন। আর দেখা মাত্রই বলে উঠেছেন, ''ইনি অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলার সত্য নবী।'' এটা হচ্ছে হুযূর করীমের পবিত্র সত্তারই মু'জিযা।

অনুরূপ, হযরত জামি' ইবনে শাদ্দাদ বলেন, আমাকে তারিক্ব নামের একজন লোক বললো, আমি মদীনা ত্বাইয়্যেবায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম। তখন আমি হুযূরকে চিনতাম না। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, هَلْ مَعَكُمْ شَىْءٌ تَبِيْعُوْنَهٗ (তোমাদের নিকট বিক্রি করার কিছু আছে

কি?) আমরা বললাম, ''আমরা উট বিক্রি করতে চাই।'' তিনি দাম জানতে চাইলেন। আমরা বললাম, ''এত ওয়াসাক্ব খেজুর নেবো।'' তিনি ওই মূল্য মঞ্জুর করলেন এবং উটের লাগাম ধরলেন এবং সেটা নিয়ে চলে গেলেন। যেহেতু আমরা হুযূরকে চিনতাম না, সেহেতু পরস্পর বলাবলি করছিলাম, ''আমরা এমন একজন লোকের নিকট আমাদের উট বিক্রি করলাম, যাঁর সাথে আমাদের জানাশোনা নেই।'' আমাদের সাথে এক বৃদ্ধাও ছিলো। বৃদ্ধা বললো, ''তোমরা কোন চিন্তা করোনা। উটের মূল্যের আমিই জামিন রয়েছি। কারণ رَأَيْتُ وَجْهَ رَجُلٍ مِّثْلَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ (আমি এমন এক পুরুষের চেহারা দেখেছি, যা পূর্ণিমারাতের চাঁদের মতো চমকাচ্ছিলো। তিনি কখনো তোমাদের সাথে ধোঁকাবাজি করতে পারেন না।)

যখন সকাল হলো তখন ঠিকই তিনি খেজুর নিয়ে আমাদের কাছে আসলেন। আর খেজুরগুলো দিয়ে এরশাদ করলেন, ''আমি তোমাদের প্রতি মহামহিম আল্লাহ্‌র সত্য রসূল। আমি নির্দেশ দিচ্ছি এ খেজুরগুলো ওজন করে তোমাদের প্রাপ্য পূর্ণ করে নাও।'' অতঃপর আমরা খেজুরগুলো মেপে দেখলাম আর সঠিক ওজনের পেলাম। [শেফা শরীফ: ১৫৯পৃষ্ঠা, জাওয়াহিরুল বেহার: ১ম খন্ড: ৫৫ পৃষ্ঠা]

এ থেকে মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় সুস্পষ্ট হলো যে, হুযূর আক্বদাসের চেহারা-ই আন্‌ওয়ার সর্বোচ্চ মু'জিযা।

অনুরূপ, জালন্দী শাহে ওমান বর্ণনা করেছেন, আমি শাহে কওন ও মাকান সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সত্য নবী হিসেবে এভাবে চিনতে পারলাম যে, তিনি যেই সৎকর্মের নির্দেশ দেন, ওই সৎ কর্ম নিজেই সর্বপ্রথম করেন। আর যে কাজ নিষেধ করতেন, ওই কাজ থেকে সর্বপ্রথম নিজেই বিরত থাকতেন। যখন (যুদ্ধে) বিজয়ী হতেন তখন অযথা গর্ব করতেন না, আর বিপর্যস্ত হলে দুঃখ ও দুশ্চিন্তায় ভুগতেন না। আর প্রতিশ্রুতি পূরণ করতেন। সুতরাং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার সত্য নবী। [শেফা শরীফ : ১ম খন্ড, ১৫৯ পৃষ্ঠা]

আল্লাহু আকবার! কতোই নিষ্কলুষ ও ত্রুটিমুক্ত হযরত মুহাম্মদ মুস্তফার মহান সত্তা! যার কর্মের সৌন্দর্য দেখে আরবের বড় বড় সর্দার ইসলামের কলেমা পড়তে বাধ্য হয়েছেন। সর্বোপরি পবিত্র ক্বোরআনে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ (সেটার তেল আলোকদীপ্ত হবার উপক্রম হয়েছে, যদিও সেটাকে আগুন স্পর্শ করে নি।)

এখানে মহামহিম আল্লাহ্ আপন হাবীবের উপমা বর্ণনা করেছেন, যার মর্মার্থ হচ্ছে- মাহবূবে খোদা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র সত্তাই তাঁর নুবূয়তের প্রমাণবহ, যদিও তিনি ক্বোরআন মজীদ পাঠ না করেন, অন্য কোন মু'জিযাও প্রকাশ না পায়। ইবনে রাওয়াহাহ্ বলেছেন-

لَوْ لَمْ تَكُنْ فِيْهِ اٰيَاتٌ مُّبَيِّنَةٌ لَكَانَ مَنْظَرُهُ يُنَبِّئُكَ بِالْخَبَرِ

অর্থাৎ: যদি হাবীবে খোদার মধ্যে অন্য কোন নিদর্শন (মু'জিযা) নাও থাকে, তবুও তাঁর চেহারা-ই আন্‌ওয়ারই তোমাকে বলে দেবে যে, তিনিই সত্য নবী।

[জাওয়াহিরু বেহার : ১ম খন্ড : পৃষ্ঠা-৫৫]

হুযূরের হাত মুবারকের মু'জিযা: আঙ্গুল মুবারকের ইশারায় চন্দ্র দ্বিখন্ডিত

বস্তুত আল্লাহ্‌র হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপাদমস্তক শরীফই মু'জিযা। হুযূরের রসনা মুবারক, চোখ মুবারক, নাক মুবারক, থুথু মুবারক, চুল মুবারক, কদম মুবারক -সবই মু'জিযার আধার। হুযূরের হাত মুবারকের অগণিত মু'জিযার মধ্যে একটি মু'জিযা দেখুন! হুযূরের আঙ্গুল মুবারকের ইঙ্গিতে আকাশের চাঁদ দ্বিখন্ডিত হয়েছিলো, হুযূরের ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র তা আবার মিলিতও হয়ে গিয়েছিলো। হুযূরের এ মু'জিযার দিকে ক্বোর্‌আন মজীদই ইঙ্গিত দিচ্ছে-

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (ক্বিয়ামত নিকটবর্তী হয়ে গেছে এবং চাঁদ দ্বিখন্ডিত হয়েছে।) [সূরা ক্বমর : আয়াত-১]

এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ হচ্ছে-

মক্কার কাফিরদের নেতা আবূ জাহ্‌ল ইয়েমেনের শাসক হাবীব ইবনে মালিককে খবর পাঠালো- 'তোমার ধর্ম (পৌত্তলিকতা) নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে! শীঘ্রই মক্কা এসো!' এ পয়গাম পেতেই হাবীব মক্কায় এসে হাযির। আবূ জাহ্‌ল তাঁর সামনে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কয়েকটা ভুল কথা বর্ণনা করলো। এতে আবূ জাহ্‌লের ইচ্ছা ছিলো- যেহেতু মক্কাবাসীদের উপর হাবীব ইয়ামেনীর যথেষ্ট আস্থা রয়েছে, সেহেতু হাবীব তাদেরকে বুঝিয়ে বলে দেবেন, যেন তারা ইসলাম গ্রহণ না করে।

কিন্তু হাবীব ইবনে মালিক ইয়ামেনী বললেন, ''যতক্ষণ পর্যন্ত উভয় পক্ষ মুখোমুখি হবেন না, ততক্ষণ পর্যন্ত তো কোন মীমাংসা শোনানো সম্ভবপর নয়। আমি চাচ্ছি (হযরত) মুহাম্মদ (মুস্তফা)র কথাও শুনে নিই।'' সুতরাং তিনি হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র দরবারে এ বলে পয়গাম পাঠালেন, ''আমি সুদূর ইয়ামেন থেকে এসেছি। আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে একান্ত আগ্রহী।'' ফখরে কা-ইনাত হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সিদ্দীক্ব-ই আকবর হযরত আবূ বক্‌র রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে সাথে নিয়ে তাঁর নিকট তাশরীফ আনলেন। হুযূর তাশরীফ আনার সাথে সাথে গোটা মজলিসের উপর ভক্তিপ্রযুক্ত ভয় ছেয়ে গেলো। কেউ টু-শব্দটুকুও করার সাহস পেলো না। শেষ পর্যন্ত হুযূর শাহানশাহে দু'আলম এরশাদ করলেন, ''তোমরা কি জিজ্ঞেস করতে চাও? করতে পারো।'' হাবীব ইবনে মালিক আরয করলেন, ''হুযূর! আপনি নুবূয়ত দাবি করছেন। নুবূয়তের জন্য তো মু'জিযা

দরকার।'' হুযূর এরশাদ করলেন, ''তোমরা যে মু'জিযাই চাও দেখানো হবে।'' হাবীব ইবনে মালিক আরয করলেন, ''হুযূর আমি তো আসমানের মু'জিযা চাই। (কারণ, জ্ঞানী হাবীব জানতেন যে, আসমানে কোন যাদু চলে না। আবূ জাহ্লের কথা মতো যদি তিনি না'ঊযু বিল্লাহ্! যাদুকর হন, তাহলে আসমানে কোন অলৌকিক ক্ষমতা দেখাতে পারবেন না। সুতরাং আসমানে যেই অলৌকিক ঘটনা দেখাবেন সেটাই মু'জিযা হবে। আর প্রমাণিত হবে, তিনি সত্য নবী।) আর আমি জানতে চাই আমার মনে কোন আরজু বিরাজ করছে? (কারণ, হাবীব এটাও জানতেন যে, মনের কথা জানাও হুযূরের মু'জিযা হবে) হুযূর এরশাদ করলেন, ''সাফা পাহাড়ের উপর চলো।'' হুযূর সেখানে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ আলোকিত ছিলো। হুযূর আপন হাত মুবারকের দ্বারা ইশারা করলেন। ইঙ্গিত পাওয়া মাত্রই চাঁদ দ্বিখন্ডিত হয়ে গেলো আর দু'টুকরোই আকাশে পাহাড়ের দু'দিকে ঢলে পড়লো। কবি বলেন-

تیری مرضی پا گیا سورج پھیرا اُلٹے قدم

تیری اُنگلی اُٹھ گئی مہ کا کلیجہ چر گیا

(হে আল্লাহ্র রসূল! আপন মর্জি সম্পর্কে জানতে পেরে ডুবন্ত সূর্য পুনরায় ফিরে এলো। আপনার আঙ্গুলের ইঙ্গিত আকাশের দিকে উঠার সাথে সাথে চাঁদের কলিজা চিরে দ্বিখন্ডিত হয়ে গেলো।) উল্লেখ্য, হুযূরের ইঙ্গিত পেয়ে চাঁদ আবার মিলিত হয়ে আপন অবয়বে এসে গিয়েছিলো। অতঃপর হুযূর এরশাদ করলেন, ''হে হাবীব ইবনে মালিক! তোমার মনের অব্যক্ত আরজুটিও শুনে নাও! তোমার একটি কন্যা সন্তান আছে, যার হাত পা অকেজো। তুমি চাচ্ছো সে সুস্থ হয়ে যাক। যাও সেও সুস্থ ও সুঠাম হয়ে গেছে।'' এ কথা শুনতেই হাবীব ইবনে মালিকের মুখে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই কলেমা শরীফ উচ্চারিত হয়ে গেলো। হাবীব যখন ইয়ামেনে ফিরে এসে ঘরে গেলেন, তখন রাত ছিলো। দরজায় আওয়াজ দিলেন। তখন ওই শয্যাশায়ী প্রতিবন্ধী কন্যা পায়ে হেঁটে এসে দরজা খুলে দিলো আর পিতাকে দেখা মাত্রই পড়তে লাগলো ''লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মাদুর রসূ-লুল্লা-হ্''। হাবীব বললেন, ''বেটী! তুমি এ কলেমা কোত্থেকে শুনলে?'' তখন সে বলতে লাগলো, ''আমি স্বপ্নে একটি চাঁদের মতো ব্যক্তিকে দেখলাম। তিনি বলছিলেন, ''বেটী! তোমার পিতাতো মক্কা মুকাররামায় কলেমা পড়ে নিয়েছে, তুমি এখানে পড়ে নাও। তাহলে তুমি এক্ষুনি সুস্থ হয়ে যাবে।'' আমি পরদিন ভোরে উঠলাম তখন কলেমা আমার মুখে জারী ছিলো। আর আমার হাত-পাও সুস্থ ছিলো।'' [শরহে ক্বসীদাহ্-ই বুরদাহ্ : আল্লামা খরপূতী : ১৩৪পৃষ্ঠা]

'মুহাম্মদ' নামের বরকত ও ফযীলত

হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র বৈশিষ্ট্যাদির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে- তাঁর নামে নাম রাখাও অতি বরকতময়। দ্বীন ও দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রে উপকারী। হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন, আল্লাহ্র মহান দরবারে দু'জন লোককে দন্ডায়মান করানো হবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বেহেশ্তে প্রবেশ করার নির্দেশ দেবেন। আর আল্লাহ্র ওই দু'বান্দা আরয করবে, ''হে আল্লাহ্! আমরা কোন্ জিনিসটির বিনিময়ে জান্নাতের উপযোগী হয়েছি? আমরাতো এমন কাজ করিনি, যার পরিণাম হিসেবে আমাদেরকে জান্নাত দান করছেন!'' তখন আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করবেন, ''তোমরা বেহেশ্তে প্রবেশ করো। কেননা, আমি শপথ করেছি এবং আমার সত্তার উপর অপরিহার্য করে নিয়েছি যে, আমি ওই বান্দাকে দোযখে নিক্ষেপ করবো না, যার নাম 'মুহাম্মদ' কিংবা 'আহমদ' হবে।

অন্য বর্ণনায় আছে- আল্লাহ্ তা'আলা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বলেছেন, ''আমি আমার সত্তা ও মহত্বের শপথ করছি! আমি এমন কোন ব্যক্তিকে শাস্তি দেবো না, যার নাম আপনার নামে রাখা হবে।''

হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, কোন দস্তরখানা এমন নেই, যাতে কোন 'মুহাম্মদ' কিংবা 'আহমদ' নামের ব্যক্তি হাযির হবে আর ওই দস্তরখানা বিশিষ্ট ঘরকে আল্লাহ্ তা'আলা দৈনিক দু'বার পবিত্র করেন না। এটা আবূ মানসূর দায়লামী বর্ণনা করেছেন।

এটাও বর্ণিত আছে যে, যে ঘরে 'মুহাম্মদ' নামের কেউ থাকে, তাকে আল্লাহ্ তা'আলা বরকত (কল্যাণ) দান করেন। আরো বর্ণিত আছে যে, যে জনগোষ্ঠী কোন বিষয়ে পরামর্শের জন্য সমবেত হবে, আর তাদের মধ্যে এমন কোন লোকও থাকে, যার নাম 'মুহাম্মদ', নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা ওই নামে বরকত দান করবেন। হাদীস শরীফে এটাও এসেছে যে, যে ব্যক্তির নাম 'মুহাম্মদ', হুযূর তার জন্য সুপারিশ করবেন এবং তাকে বেহেশ্তে প্রবেশ করাবেন। আল্লামা বূ-সীরী এ প্রসেঙ্গ কতোই সুন্দর বলেছেন,

فَاِنَّ لِیْ ذِمَّةً مِّنْهُ بِتَسْمِیَتِیْ مُحَمَّدًوَهُوَاَوْفَی الْخَلْقِ بِالذِّمَمِ

অর্থাৎ: নিশ্চয় আমি আমার 'মুহাম্মদ' নামের কারণে তাঁর যিম্মায় এসে গেছি। বস্তুতঃ তিনি হলেন সৃষ্টিজগতের সর্বাপেক্ষা যিম্মাদারী পূরণকারী।

হযরত শায়খ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিস দেহলভী বলেন, ''আমি একবার হযরত গাউসুস্ সাক্বালাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে স্বপ্নে দেখেছি, আমি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে গেলাম। তখন হাযেরানে মজলিস আরয করলেন, ''মুহাম্মদ

আবদুল হক্ব হুযূরের দরবারে সালাম আরয করছেন।'' হুযূর গাউসুস সাক্বালাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দাঁড়িয়ে গেলেন। আর আমার সাথে আলিঙ্গন করে বললেন, তোমার উপর দোযখের আগুন হারাম।'' প্রকাশ থাকে যে এ সুসংবাদ আমার 'মুহাম্মদ' নামের কারণেই। সুবহানাল্লাহ!

[মাদারিজুন্ নুবূয়ত (অনূদিত): ১ম খণ্ড : পৃ.-২২৯]

উল্লেখ্য, সৌভাগ্যক্রমে, এসব হাদীস ও দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে আমাদের দেশের প্রায় সব মুসলমানের নাম 'মুহাম্মদ' রাখা হয়েছে। আমাদের দেশের মুসলমানদের এ নামের আধিক্য দেখে বর্তমানের আরবীয় মুসলমানরাও আশ্চর্য বোধ করেন ও ধন্যবাদ জানান। তাই, প্রত্যেক মুসলমানের নিকট এ নামটি যেমন বরকতময়, তেমনি গৌরবময়। সুতরাং যেসব লোক এ নাম মুবারক নিয়ে ব্যাঙ্গ করার দুঃসাহস দেখায় (যেমন সম্প্রতি তথাকথিত 'প্রথম আলো'র আলপিন ম্যাগাজিন-এ এবং সাপ্তাহিক ২০০০-এর ঈদ সংখ্যায় মুসলমান নামধারী বে-ঈমান লেখক ও পত্রিকদ্বয়ের সম্পাদক ও কর্তৃপক্ষ করেছে) তারা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত হতভাগা, দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত ও দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

আশাকরি, তারা মুসলমানদের চাপের মুখে তজ্জন্য যে অনুশোচনা প্রকাশ করলেও তাদের তাওবা-অনুশোচনা গ্রহণযোগ্য নয়। শরীয়তের বিধানানুসারে ক্বতলের উপযোগী; তাদের ক্ষমা নেই। কারণ নবী করীমের প্রতি বেআদবী তাওবা ও ক্ষমার উপযোগী নয়; কোন 'ওবাইদুল হক্ব'র এ অধিকার নেই যে, তাকে ক্ষমা করবে।

হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র হাত মুবারকের মু'জিযা

সাইয়্যেদুনা হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত (তিনি বলেন), আমার পিতা উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়ে যান। তিনি বিরাট অঙ্কের কর্জ রেখে যান। যখন খেজুরের মৌসুম আসলো, তখন আমি রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র দরবারে আরয করলাম, ''হুযূর! অনুগ্রহ করে আমার বাগানে তাশরীফ আনুন (সেখানে কর্জদাতারা জড়ো হয়েছে কর্জ উসূল করার জন্য)। আপনাকে দেখে কর্জদাতারা আমার প্রতি সদয় হবেন।''

হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন **اِذْهَبْ فَبَيْدِرْ كُلَّ تَمَرٍ عَلٰى نَاحِيَةٍ** (সব ধরনের খেজুরের স্তুপ করে নাও)। আমি নির্দেশ পালন করলাম। তারপর সেখানে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে তাশরীফ আনার জন্য আবেদন জানালাম। তিনি বড় স্তূপটির চতুর্পাশে তিনবার প্রদক্ষিণ করলেন। তারপর সেটার পাশে বসে গেলেন। আর এরশাদ করলেন, ''(হে জাবির!) তোমার কর্জদাতাদের ডাকো! তারপর তিনি

আপন হাত মুবারকে মেপে মেপে প্রত্যেককে খেজুর দিতে আরম্ভ করলেন। **حَتّٰى اَدَّى اللّٰهُ عَنْ وَالِدِىْ اَمَانَتَهٗ** (শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা আমার পিতার কর্জ পরিশোধ করে দিয়েছেন)। আমিও চাচ্ছিলাম যেন আমার পিতার কর্জটা পরিশোধ হয়ে যাক, যদিও আমার ঘরের জন্য একটা খেজুরও অবশিষ্ট না থাকুক।

এখানে, হুযূরের এ বদান্যতাকে আল্লাহ্র বদান্যতা বলা হয়েছে। আরো লক্ষ্যণীয়, হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন **فَسَلَّمَ اللّٰهُ الْبَيَادِرَ كُلَّهَا** (এরপরও আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেকটি স্তূপকে অবিকলই রেখে দিয়েছেন)। এমনকি আমি যখন ওই স্তূপটির দিকে দেখলাম, যেটার পাশে হুযূর তাশরীফ রাখছিলেন (এবং আপন হাত মুবারকে তা থেকে প্রচুর খেজুর মেপে মেপে কর্জদাতাদেরকে দিচ্ছিলেন) তখন দেখতে পেলাম **كَاَنَّهَا لَمْ تَنْقُصْ تَمَرَةٌ وَّاحِدَةٌ** (যেনো তা থেকে একটি খেজুরও কমেনি)। [সুবহানাল্লাহ!]

-বোখারী শরীফের বরাতে মিশকাত শরীফ : পৃষ্ঠা-৫৩৭

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি এ মু'জিযাকে এভাবে বর্ণনা করেছেন-

نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذی شان گیا- ساتھ ہی منشیٔ رحمت کا قلمدان گیا

অর্থাৎ ওই মহা মর্যাদাবান নবী-ই রহমত ও মাহবূব-ই রব যেদিকেই নি'মাতরাজি বন্টনের জন্য তাশরীফ নিয়ে গেছেন, তখন তাঁর দয়া ও কৃপাসমূহ লিপিবদ্ধকারীও আপন দোয়াত- কলম নিয়ে তাঁর সাথেই গেছেন। -হাদাইক্বে বখশিশ

হাত মুবারকের মাটি শত্রুদের পরাজিত করেছে

সাইয়্যেদুনা হযরত সালমাহ্ ইবনে আক্ওয়া' রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, হুনায়নের যুদ্ধে আমরা সাইয়্যেদুল আলামীন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সাথে ছিলাম। যখন সাহাবা-ই কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম'র উপর সাময়িক বিপর্যয় নেমে আসলো, তখন কাফিররা সুযোগ পেয়ে সরকার-ই মদীনা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেললো। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম খচ্চরের উপর থেকে নামলেন- **وَقَبَضَ قَبْضَةً مِّنْ تُرَابِ مِّنَ الْاَرْضِ** (এবং যমীন থেকে এক মুষ্ঠি মাটি নিলেন) আর এ বলে কাফিরদের দিকে নিক্ষেপ করলেন- **شَاهَتِ الْوُجُوْهُ** (তাদের মুখমণ্ডল খারাপ হয়ে যাক!)

فَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْهُمْ اِنْسَانًا اِلَّا مَلَأَ عَيْنَيْهِ تُرَابًا بِتِلْكَ الْقَبْضَةِ

অর্থাৎ ''কাফিরদের মধ্যে এমন কোন লোক ছিলো না, যার চোখ ওই মাটি দ্বারা ভর্তি হয়ে যায়নি।'' **فَوَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ** (ফলে তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালিয়ে গেলো)।

-মুসলিম শরীফের বরাতে মিশকাত শরীফ : পৃষ্ঠা-৫৩৪

কবি বলেন-

میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھیں وہ
جن سے اتنے کافروں کا دفعۃً منہ پھر گیا

অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌র হাবীব! আপনার হাতের বরকতে ওই কঙ্করগুলোতে এ কেমন বৈশিষ্ট্য এসে গেলো! যেগুলো দ্বারা এতগুলো কাফিরের মুখ ফিরে গেলো (পালাতে বাধ্য হলো)।

হাত মুবারকের পরশে উম্মাদনা দূরীভূত হলো

সাইয়্যেদুনা ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বর্ণনা করেছেন, এক মহিলা তার ছেলেকে নিয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র মহান দরবারে হাযির হলো। আর আরয করলো, ''হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার এ সন্তানের মধ্যে উম্মাদনা রয়েছে, সকাল ও সন্ধ্যায় খাওয়ার সময় হলে তাকে এ (উম্মাদনা) স্পর্শ করে।

فَمَسَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَدْرَهٗ فَثَعَّ ثَعَّةً وَّخَرَجَ
مِنْ جَوْفِهٖ مِثْلُ الْجِرْوِ الْاَسْوَدِ لِيَسْعٰى

অর্থাৎ তিনি আপন হাত মুবারক ওই শিশুর বুকের উপর বুলিয়ে দিলেন। (আর দো'আ করলেন) অতঃপর শিশুটি বমি করলো, এবং তার পেট থেকে কুকুরের কালো ছানার মতো কোন বস্তু বের হয়ে দৌঁড়ে পালিয়ে গেলো। (আর ছেলেটি সুস্থ হয়ে গেলা) -দারেমী শরীফের বরাতে মিশকাত শরীফ : পৃষ্ঠা-৫৪১

হুযূরের হাত মুবারকের বরকতে এক পেয়ালা 'মালীদাহ্' শত-সহস্র মানুষকে তৃপ্ত করলো

সাইয়্যেদুনা হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেছেন, তাজদারে 'আলামীন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত যায়নাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে শাদী করলেন, তখন আমার মাতা খেজুর, ঘি ও পনীরের মালিদাহ্ (প্রসিদ্ধ সুস্বাদু খাবার) তৈরি করলেন। তা একটা পেয়ালায় নিয়ে তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন যেন তা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র দরবারে নিয়ে যাই, আর এ আরয করি, ''হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার আম্মা এ সামান্য খাবার তৈরি করে আপনার জন্য পাঠিয়েছেন।''

অতঃপর আমি ওই খাবারটুকু নিয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র দরবারে হাযির হলাম এবং আমার আম্মার সালাম ও পয়গাম আরয করলাম। হুযূর-ই আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমালেন, ''সেটা রাখো! অমুক অমুককে ডাকো। তদুপরি তুমি যাকে পাও সবাইকে দাওয়াতের পয়গাম পৌঁছাও।'' আমি ওই সব হযরতকে, যাঁদের নাম

হুযূর নিয়েছেন এবং ওইসব লোককে, যাদেরকে পথিমধ্যে পেয়েছি দাওয়াতের পয়গাম দিলাম। আমি যখন ফিরে এলাম দেখলাম হুজরা শরীফ লোকে ভর্তি।

কেউ সাইয়্যেদুনা হযরত আনাসকে বললেন, ''আপনি কতজনকে দা'ওয়াত দিয়েছেন? তিনি বললেন, ''তিনশ' জনকে।'' তিনি বলেন, ''আমি রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম, তিনি আপন বরকতময় হাত ওই মালীদার উপর রাখলেন। আর আল্লাহ্ যতটুকু চেয়েছেন ততটুকু পড়েছেন। অতঃপর তিনি দশজন করে আহারের জন্য ডাকতে লাগলেন। আর এরশাদ করলেন, ''বিসমিল্লাহ্ শরীফ পড়ে প্রত্যেকে নিজ নিজ সামনে থেকে খেতে থাকো।'' সাইয়্যেদুনা হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, ''দশজনের দল তৃপ্তি সহকারে আহার করে চলে গেলেন এবং পরবর্তী দশজন আসলেন। এভাবে শেষ পর্যন্ত সবাই আহার করে চলে গেলেন। অতঃপর হুযূর এরশাদ করলেন, ''হে আনাস! পেয়ালাটা তুলে আনো!'' (আমি তাই করলাম)-

فَرَفَعْتُ فَمَا اَدْرِىْ حِيْنَ وَضَعْتُ كَانَ اَكْثَرَ اَمْ حِيْنَ رَفَعْتُ

''অতঃপর আমি পেয়ালাটা তুলে নিলাম। আমি জানিনা যখন রেখেছিলাম (মালীদাহ্) তখন বেশি ছিলো? না যখন তুলে আনলাম তখন?

-বোখারী ও মুসলিম শরীফের বরাতে মিশকাত : পৃষ্ঠা-৫৩৮

হুযূরের বরকতময় আঙ্গুলগুলো থেকে পানির ফোয়ারা প্রবাহিত হয়েছে

সাইয়্যেদুনা হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হুদায়বিয়ায় পানি না পেয়ে সাহাবা-ই কেরাম পিপাসার্ত হয়ে পড়লেন। তখন সাইয়্যেদুল আকরামীন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সামনে এক লোটা (মৃৎপাত্র) পানি ছিলো। তিনি তা দিয়ে ওযূ করলেন। হুযূরের সামনে বহু খাদিম হাযির হলেন। আর আরয করলেন, ''হুযূর! আমাদের নিকট না ওযূ করার পানি আছে, না পান করার? শুধু এ এক পাত্র পানিই আছে, যা আপনার সামনে রাখা হয়েছে।'' হুযূর করীম রঊফুর রহীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন হাত মুবারক ওই পাত্রে রাখলেন।

فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُوْرُ مِنْ بَيْنِ اَصَابِعِهٖ كَاَمْثَالِ الْعُيُوْنِ

''অতঃপর হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র আঙ্গুল শরীফগুলো থেকে পানি সজোরে উৎসরিত হতে লাগলো যেনো পানির ফোয়ারা প্রবাহিত হচ্ছিলো।''

বর্ণনাকারী বললেন, ''তারপর আমরা তা থেকে পানও করলাম, ওযূও করলাম।'' হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে বলা হলো, ''আপনারা কতজন ছিলেন?'' তিনি বললেন, ''তখন আমরা পনেরশ' জন ছিলাম। যদি আমরা এক

লক্ষজনও থাকতাম তবুও ওই পানি যথেষ্ট হতো।''

-বোখারী ও মুসলিম শরীফের বরাতে মিশকাত শরীফ : পৃষ্ঠা-৫৩২

সুবহা-নাল্লা-হ্ !!

আমি দেখি যা তোমরা দেখোনা তা
আমি শুনি যা তোমরা শোনোনা তা।

সাইয়্যেদুল মুরসালীন হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কান মুবারকও মু'জিযা। তিনি আসমানসমূহ ও যমীনের প্রতিটি শব্দ শুনতে পান, দূরের শব্দ সেভাবে শুনেন যেভাবে কাছের শব্দ শুনেন। হুজূর আকরম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর এ মু'জিযা আযীমুল বরকত আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি লিখেছেন এভাবে-

دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان
کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام

অর্থাৎ ''দূর ও নিকট থেকে শুনেন ওই কান মুবারক; এমন কান মুবারকের মুক্তারূপী কারামতের প্রতি লাখো সালাম।''

ইমাম আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ সাইয়্যেদুনা হযরত আবূ যার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, শাহে কাওন্ ও মকান সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন-

اِنِّیْ اَرٰی مَالَاتَرَوْنَ وَاَسْمَعُ مَالَاتَسْمَعُوْنَ

অর্থাৎ: ''নিশ্চয় আমি দেখি যা তোমরা দেখোনা এবং আমি শুনি যা তোমরা শোনো না।''

হুযূর এরশাদ করেন- اَطَّتِ السَّمَآءُ وَحُقَّ لَهَااَنْ تَسْبِطَّ

অর্থাৎ: ''আসমানে চড়চড় শব্দ করে। বস্তুত চড়চড় শব্দ করা আসমানের জন্য শোভা পায়।'' হুযূর আরো সংবাদ দিয়েছেন-

وَالَّذِیْ نَفْسِیْ بِیَدِہٖ مَافِیْهَا مَوْضِعُ اَرْبَعِ اَصَابِعَ
اِلَّا وَمَلَکٌ وَّاضِعٌ جَبْهَتَهٗ سَاجِدًا لِلّٰهِ

অর্থাৎ: ''ওই মহান সত্তার শপথ! যাঁর কুদরতের হাতে আমার প্রাণ, আসমানে চার আঙ্গুল পরিমাণ জায়গাও এমন নেই যে, যেখানে ফিরিশ্তা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য সাজদাহ্রত নয়।''

আল্লাহ্র প্রিয় রসূল আরো এরশাদ করেন-

وَاللّٰهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَآ أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا وَّلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا

অর্থাৎ: ''আল্লাহ্রই শপথ! যদি তোমরা ওইসব বিষয়ে জানতে, যা আমি জানি,

তাহলে তোমরা কম হাসতে বেশি পরিমাণে কাঁদতে, তোমরা বিছানাগুলোর উপর আপন স্ত্রীদের থেকে তৃপ্তি পেতে না, আল্লাহ্ তা'আলার দিকে কান্নারত অবস্থায় জঙ্গল-মরুভূমির দিকে বেরিয়ে যেতে।'' -মিশকাত শরীফ : ৪৫৭ পৃষ্ঠা

আল্লাহু আকবার! শাহে কাওন্ ও মকান সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর এ কেমন শান! তাঁর কান মুবারকের এ কেমন শ্রবণশক্তি! তিনি তাশরীফ রাখছিলেন যমীনে, অথচ আসমানগুলোর শব্দাবলী শুনতে পাচ্ছেন অনায়াসে। আযাব হবার কারণে এক ইহুদী কবরে কাঁদছিলো। আর সরকারে কাওনাঈন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওই আর্তচিৎকার শুনে সাহাবা-ই কেরামকে বলেছেন- এটা ইহুদির কবর, তার আযাব চলছে। আমি তা শুনতে পাচ্ছি। -বোখারী ও মুসলিম শরীফের সূত্রে মিশকাত শরীফ : ৫৩৬ পৃষ্ঠা

এ থেকে প্রমাণিত, হুযূরের কান মুবারকের শ্রবণশক্তি এত বেশি যে, আসমানসমূহের উঁচু উঁচু স্থানগুলো এবং যমীনের স্তরসমূহের গভীরতম স্থানগুলো থেকে আগত প্রতিটি শব্দ তিনি অতি উত্তমরূপে শুনতে পান। সুতরাং গভীরভাবে চিন্তা করুন! কোন উম্মত যদি আমাদের এ উপমহাদেশ থেকে আপন এ আক্বাকে আহ্বান করে, তবে কি তিনি তা শুনতে পাবেন না? অবশ্যই অবশ্যই শুনতে পাবেন। আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি এ বাস্তব সত্য কথাটি এভাবে বলেছেন-

فریاد امتی جو کرے حال زار میں
ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو

অর্থাৎ: উম্মত তার মুসীবতে ফরিয়াদ করবে, হযরত খায়রুল বশর (মানবজাতির শ্রেষ্ঠতম আক্বা) সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তা শুনবেন না -এ সম্ভবই না।

হযরত আবূ হুরায়রার খেজুরে বরকত

ইমাম তিরমিযী সাইয়্যেদুনা হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি সামান্য খেজুর নিয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র দরবারে হাযির হয়ে আরয করলাম-

يَارَسُوْلَ اللّٰهُ اُدْعُ اللّٰهَ فِيْهِنَّ بِالْبَرَكَةِ

(হে আল্লাহ তা'আলার রসূল! আমার খেজুরগুলোর জন্য আল্লাহর দরবারে বরকতের দো'আ করুন!) তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বরকতের দো'আ করলেন আর এরশাদ করলেন,

خُذْهُنَّ فَاجْعَلْهُنَّ فِیْ مِزْوَدِکَ

(এগুলো নিয়ে তোমার তোষদান খাদ্যবাহী পাত্রে রেখে দাও!) আরো এরশাদ

করেছেন-যতটুকু ইচ্ছা হয়, তা থেকে নিয়ে খেতে থাকো! ইন্‌শা-আল্লাহ! তা কখনো হ্রাস পাবে না। (কমবে না)।
সুতরাং হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ওই খেজুর থেকে ইচ্ছামতো আহার করেছেন, আল্লাহর পথে দানও করেছেন, আপন বন্ধু-বান্ধবদেরকেও আহার করিয়েছেন। কিন্তু তা বিন্দু মাত্র হ্রাস পায়নি। দীর্ঘ তিন বছর যাবৎ তা থেকে এভাবে আহার করতে ও করাতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত সাইয়্যেদুনা হযরত ওসমান যিননূরাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর শাহাদাতের দিন সাইয়্যেদুনা হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর ওই তোষদানটি হারিয়ে গিয়েছিলো। [মিশকাত শরীফ : পৃষ্ঠা : ৫৪২]
ওই দিন হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দু'টি অসহনীয় দুঃখে দুঃখিত হন- হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর শাহাদাত ও তাঁর ওই খেজুরের থলেটা হারিয়ে যাওয়া। [আশি'আতুল্ লুম'আত ৪র্থ খন্ড : পৃষ্ঠা : ৫৮৮]
এ অসহনীয় দুঃখ তিনি নিম্নলিখিত দু'টি চয়নে ব্যক্ত করেছেন-

لِلنَّاسِ هَمٌّ وَلِیْ فِی الْیَوْمِ هَمَّانِ فَقَدُ الْجِرَابِ وَقَتْلُ الشَّیْخِ عُثْمَانِ

[সবার আজি দুঃখ এক, আমি দ্বিগুণ পেরেশান,
শহীদ হলেন যুন্-নূরাঈন, আমার গেলো তোশ্‌দান] [মিরকাত]

ফিরে এলো সূর্য

ইমাম ত্বাহাভী আলায়হির রাহমাহ তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'শরহে মা'আনিল আসার'-এ সাইয়্যেদাহ্ হযরত আসমা বিনতে ওমায়স রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণনা করেন- ইমামুল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ওহী নাযিল হলো- যখন তিনি হযরত আলী মুরতাদ্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর কোলে শির মুবারক রেখে শয়নরত ছিলেন। এ কারণে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আসরের নামায সম্পন্ন করতে পারেন নি। এমনকি সূর্যও ডুবে গিয়েছিলো।
অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত আলীকে (বিচলিত দেখে) জিজ্ঞাসা করলেন- আসরের নামায পড়েছেন কিনা। তিনি আরয করলেন, ''হুযূর, আপনার আরামের খাতিরে (নিমিত্তে) আমি আসরের নামায পড়তে পারিনি।'' এটা শুনে হুযূরের রহমতের সাগরে ঢেউ খেয়ে গেলো। তিনি আল্লাহ জাল্লাশানুহুর মহান দরবারে দো'আ করলেন-

اَللّٰهُمَّ اِنَّهٗ فِیْ طَاعَتِکَ وَطَاعَةِ رَسُوْلِکَ فَارْدُدْ عَلَیْکَ الشَّمْسَ

(অর্থাৎ হে আল্লাহ! নিঃসন্দেহে সে (আলী) তোমার আনুগত্যে ও তোমার রসূলের আনুগত্য পালনরত রয়েছে। তার জন্য সূর্যকে ফিরিয়ে দাও!)
হযরত আসমা (বর্ণনাকারীণী) রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন, আমি স্বচক্ষে

দেখেছি ডুবে যাওয়া সূর্য ফিরে এসেছে। সেটার আলোর বিম্ব পর্বতমালা ও ভূ-পৃষ্ঠের সর্বত্র পড়তে লাগলো। [শেফা শরীফ : ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৮৫]
আ'লা হযরত এ মু'জিযা এভাবে বর্ণনা করেছেন-

سورج کو واپس لاتے یہ ہیں ٹکڑے قمر کے بناتے یہ ہیں

অর্থাৎ সূর্যকে পুনরায় উদিত করেন ইনি! চাঁদকে দ্বিখন্ডিত করেন ইনি! (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম]

কালো হাবশী ক্রীতদাস হয়ে গেল রূমীদের মতো ফর্সা

মসনভী শরীফে মাওলানা রূম রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বর্ণনা করেছেন- এক যুদ্ধে সাহাবা-ই কেরাম আরয করলেন, এয়া রাসূলাল্লাহ্! ইসলামী সেনা দলে পানি মোটেই নেই। হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম সাইয়্যেদুনা হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে নির্দেশ দিলেন- ওই সামনে যে পাহাড় দেখা যাচ্ছে, সেটার পাদদেশে এক কালো হাবশী (ক্রীতদাস) উট বোঝাই পানি নিয়ে যাচ্ছে। তাকে আমার নিকট নিয়ে এসো। নির্দেশ পেতেই হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু পাহাড়ের পেছনে সেটার পাদদেশে পৌঁছে গেলেন। দেখলেন হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর সংবাদ অনুসারে একটি উটের উপর হাবশী ক্রীতদাস দু'টি বড় বড় মশক ভর্তি পানি নিয়ে যাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন- পানি এখান থেকে কতদূরে? সে বললো, ''আমি গতকাল এ সময় পানি ভর্তি করে রওনা হয়েছি। আজ এখানে পৌঁছেছি।'' বললেন, ''পানি কোথায় নিয়ে যাচ্ছো?'' আরয করলো, ''আমি এক ব্যক্তির গোলাম (ক্রীতদাস)। সে আমাকে পানি সংগ্রহের কাজে নিয়োগ করেছে। আমি আগামীকাল এমনি সময়ে মুনিবের ঘরে পৌঁছবো। পানি ওখান থেকে দু'দিনের দুরত্বে পাওয়া যায়। তিনি বললেন, ''চল, তোকে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ডাকছেন।'' সে বললো, ''তিনি কে?'' তিনি বললেন, 'আয়, নিজের চোখে দেখে নে- তিনি কে? সে বললো, ''আমি যাবোনা!'' তিনি বললেন, ''তোকে যেতেই হবে।'' শেষ পর্যন্ত সে জেদ ধরলো। হযরত মাওলা আলীও হুযূর করীমের নির্দেশ পালন না করে ছাড়বেন না। তিনি শক্তি প্রয়োগ করে তার উটকে ওইদিকে চালনা করলেন। সে চিৎকার করতে লাগলো, ''কে আছো! ইনিতো আমার পানি জোর করে নিয়ে যাচ্ছেন।'' কিন্তু যার হাত হযরত আলী শেরে খোদা পাকড়াও করেছেন, তার হাত ছাড়াবার সেখানে কে আছে? সে চিৎকার করতে লাগলো, কিন্তু হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাকে নবী-ই করীমের পবিত্র দরবারে নিয়েই আসলেন। এখন ওই গোলাম নবী-ই আকরাম হুযূর-ই পুরনূরকে দেখলো, পবিত্র দরবার দেখলো। অমনি সে সবকিছু ভুলে গেলো। উট থেকে নেমে একপাশে থমকে দাঁড়িয়ে রইলো। হতবাক হয়ে গেলো এ ভেবে যে, সে কি ভূ-পৃষ্ঠে রয়েছে, না আসমানে। এ মহান দরবারে যাঁরা আছেন, তাঁরা কি মানব জাতির কেউ, না

কোন পবিত্র জগতের, আসমান থেকে নেমে এসেছেন।

آنکھوں آنکھوں میں اشارہ ہو گئے - تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے

অর্থাৎ চোখে চোখে ইশারায় কথা হয়ে গেছে

তুমি আমার হয়ে গেছো, আমি তোমার হয়ে গেছি।

সরকার-ই দোজাহানের হুকুম হলো-তাঁর মশকগুলো থেকে পানি নিয়ে ব্যবহার করতে থাকো! সাহাবা-ই কেরাম নির্দেশ পাওয়া মাত্র দৌড়ে গিয়ে ক্রীতদাসের মশক দু'টি থেকে আপন আপন মশকে পানি ভর্তি করে নিলো। পিপাসার্তরা পানি পান করে তৃপ্ত হলেন, উটগুলোকে পান করালেন। গোটা দলে যথেষ্ট পরিমাণে পানি সরবরাহ হয়ে গেলো; কিন্তু ওই ক্রীতদাসের মশক থেকে এক ফোঁটা পানিও হ্রাস পায়নি (কমে নি)। মাওলানা রূম আলায়হির রাহমাহ বলেন, ওইদিন হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম (ক্রীতদাসের) ওই মশকের সম্পর্ক হাউযে কাউসারের সাথে করে দিয়েছিলেন। ওখান থেকে পানি আসছিলো।

যখন সবাই পানি নিলেন, তখন হুযূর-ই আকরাম সাহাবা-ই কেরামের উদ্দেশে এরশাদ করলেন, ''তোমরা তার মশক থেকে পানি নিয়েছো! তোমরা তাকে রুটি দাও!'' তাঁরা আপন আপন তাঁবু থেকে রুটির টুকরা নিয়ে একত্রিত করলেন আর একটি থলে ভর্তি করে তাকে দিয়ে দিলেন। সুবহানাল্লাহ! ওটা কেমন মজার বিনিময় হলো, যাতে সিদ্দীক্ব ও ফারূক্বের প্রদত্ত টুকরোও ছিলো! অতঃপর বললেন, ''ওহে ক্রীতদাস! তুমি আপন মশক দু'টি দেখে নাও, এক ফোঁটাও হ্রাস পায়নি। আমরা আমাদের রবের অনুগ্রহ থেকে পানি নিয়েছি; আর তোমাকে এ রুটি দিচ্ছি! এগুলো নিয়ে চলে যাও!'' ক্রীতদাস বললো, এখন আমি তো এসব দেখে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি! যাবো কোথায়! আমাকে আপনারা ডেকে এনে এখন বের করে দিচ্ছেন? আমি তো শুনেছি- দাতা (দানশীল) আপন দরজায় কাউকে ডেকে এনে বের করে দেন না। আমি এখন এতোই প্রীত ও বিভোর হয়ে গেছি যে, আমি জানি না আমি কে? আমায় এ খবরও নেই যে, আমি কোথায় থাকি এবং কোত্থেকে এসেছি।''

সুতরাং হুযূর-ই আকরাম এরশাদ ফরমান, ''আচ্ছা! তুমি এখানে এসো!'' অতঃপর হুযূর-ই আকরাম তাকে আপন কম্বল শরীফে ঢেকে নিলেন। জানি না দাতা কি দিয়েছেন আর এ গ্রহীতা কি নিয়েছে! কিছুক্ষণ পর কম্বল শরীফ থেকে ওই ক্রীতদাসকে বের করে আনলেন। কী দেখা গেলো? ওই কালো কুৎসিৎ হাবশী গোলাম চাঁদের মত সুন্দর হয়ে গেলো। কবি ওই হাবশীর কথাটি নিজের ভাষায় লিখেছেন-

جمال ہمنشین در من اثر کرد - وگرنہ من چناں خاکم کہ ہستم

অর্থাৎ আমার মধ্যে আমি যার সাহচর্যে ছিলাম তাঁর প্রভাব পড়েছে, অন্যথায় আমি তো মাটিই ছিলাম।

অতঃপর হুযূর-ই আকরাম এরশাদ ফরমালেন, এখন তোমাকে আমি পাঠাচ্ছি।

যাও! সে বললো, ''আচ্ছা যাচ্ছি!'' সে উটে চড়ে বসলো এবং রওনা দিলো!

ওদিকে তার মুনিব চিন্তিত হয়ে পড়লো- ক্রীতদাসের ফিরতে বিলম্ব হচ্ছে কেন? ক্রীতদাসটি এদিক থেকে অবসর হয়ে যখন নিজ শহরে প্রবেশ করলো, তখন তার মুনিব ও মুনিবের লোকজন তাকে তালাশে বের হয়েছিলো। মুনিব দূর থেকে দেখলো আর ভাবলো উটতো আমার, মশকও আমার। কিন্তু উঠের পিঠে কুৎসিৎ হাবশী ক্রীতদাসতো নয়; এ'কে তো ফর্সা রূমী লোকের মতো দেখাচ্ছে। আর মনে করলো- হয়তো সে কোন চোর কিংবা ডাকু হবে। আমার ক্রীতদাসকে হত্যা করে আমার উটটি তার করায়ত্বে নিয়ে নিয়েছে। এটা ভেবে মুনিবের ইঙ্গিতে তার লোকেরা তাকে মারতে উদ্যত হলো। গোলাম আর্তচিৎকার করে উঠলো আর বললো, ''আপনারা আমাকে মারছেন কেন?'' তারা বললো, ''তুই আসলে কে?'' আমার ক্রীতদাস, যে এ উট ও মশক নিয়ে পানির জন্য গিয়েছিলো সে কোথায়? সে বললো, ''আমিই আপনার ক্রীতদাস। গত পরশু এখান থেকে পানির জন্য গিয়েছিলাম। আপনার সব অবস্থা সম্পর্কে আমাকে বলতে দিন! আপনার পরিবারের সবার নাম জিজ্ঞাসা করুন!'' সুতরাং সে মুনিবের যাবতীয় অবস্থা ও তার পরিবারের সদস্যদের নাম ইত্যাদি বললো। তখন মুনিব বললো, ''তুই তো কথাবার্তা আমার ক্রীতদাসের মতো বলছিস, কিন্তু তোর গায়ের রং ও আকৃতি তার সম্পূর্ণ বিপরীত। এটা কিভাবে হলো? তার রং ছিলো কালো, ওষ্ঠযুগল নীলাভ, দাঁত ছিলো বড় বড়, নাক ছিলো প্রসারিত। আর এখন তোমার রং যে একেবারে ফর্সা, নাক পাতলা, দাঁতও ছোট ছোট! আর ওষ্ঠযুগল অতি সুন্দর! তুমি রূমী, আর সে ছিলো হাবশী! এর কারণ কি?

ক্রীতদাস বললো, কথা হচ্ছে আমি ছিলাম তো হাবশী, কিন্তু যখন পানি নিয়ে আসছিলাম, তখন পথে সদরুল উলা, কাহফুল ওয়ারা, সাইয়্যেদুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য আমার হয়েছিলো। তাওহীদ ও রহমতের ওই সমুদ্র ছিলো তাঁর মহান দরবার। তাতে ডুব দিয়ে কেউ সিদ্দীক্ব হয়েছেন, কেউ ফারুক্ব হয়েছেন, কেউ হয়েছেন গণি, কেউ হয়েছেন কাররার। আমাকেও তিনি ওই সমুদ্রে চুবিয়ে তুলেছেন- আমায় হৃদয়ের রং হয়ে গেছে একেবারে ফর্সা (নূরানী), আর আমার দেহের রংও হয়ে গেছে একেবারে আগেকার বিপরীত।'' সুবহানাল্লাহ!

দেখুন! ক্রীতদাসের মধ্যে এতটুকু পরিবর্তন আসলো! সেছিলো একজন কুৎসিৎ ও অবহেলিত ক্রীতদাস! আর নবী-ই পাকের একটি মাত্র সাক্ষাতের ফলে সেই হলো- মু'মিন থেকে সাহাবী এবং যাহের ও বাতিনে হলো অপূর্ব সুন্দর ও উভয় জাহানে সৌভাগ্যবান! এ ঘটনা থেকে, প্রাসঙ্গিকভাবে, সাহাবা-ই কেরামের মর্যাদা ও নূরানিয়াতের অনুমান করা যায়; যাঁরা দীর্ঘসময় হুযূর-ই আকরামের সান্নিধ্যে লাভ করে ধন্য হয়েছেন। নূরনবীর এমন শান! আল্লাহ তা'আলা ওই ক্রীতদাসের ওসীলায় আমাদের মন্দ রংকেও বদলে দিন। আমীন!!

রসূল-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন

'মাদারিজুন্নুবূয়ত' ১ম খণ্ডে হযরত আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী লিখেছেন- হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম অবিলম্বে বসরা শহর আবাদ হবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর একজন সাহাবীকে সুসংবাদ দেন যে, তিনি সমুদ্রে যুদ্ধ করবেন, যেভাবে বাদশাহগণ সিংহাসনে উপবিষ্ঠ হন। বাস্তবে হযরত আমীর মু'আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর পরিচালনায় আমীরুল মু'মিনীন হযরত সাইয়্যেদুনা ওসমান যুন্নুরাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর খিলাফতকালে তা বাস্তবায়িত হয়েছে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম খবর দিয়েছেন যে, যদি দ্বীন সুরাইয়া নক্ষত্রের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় থেকে যায়, তবে পারস্যের লোকেরা সেটা উদ্ধার করে আনবে। কিছু সংখ্যক ইমাম বলেন, ওই পারস্যবাসী মানে- হযরত সালমান ফার্সী, আর কিছু সংখ্যক ইমাম বলেন- তাঁরা হলেন হযরত ইমাম-ই আ'যম আবূ হানীফা ও তাঁর শাগরিদগণ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুম। কারণ, তাঁরা পারস্যবাসীদের বংশীয় লোক। এক বর্ণনায় এসেছে- **رَجُلٌ مِّنْ فَارِس** অর্থাৎ পারস্যের একজন লোক। (আর তিনি হলেন আমাদের ইমামে আ'যম ইমাম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু।)

ইমাম যাউয্ক্বানী হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর হাদীস উল্লেখ করেছেন- হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- **يَكُوْنُ فِىْ اُمَّتِىْ رَجُلٌ يُقَالُ لَهٗ اَبُوْحَنِيْفَةَ هُوَ سِرَاجُ اُمَّتِىْ** অর্থাৎ আমার উম্মতের মধ্যে এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে, যাঁকে 'আবূ হানীফা' বলে স্মরণ করা হবে। সে আমার উম্মতের সূর্য। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মদীনা তাইয়্যেবার এমন একজন আলিমের খবর দিয়েছেন, যাঁর অনুসারী হবেন একদল বিজ্ঞ আলিম। ইমাম মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর শুভ জন্মের মাধ্যমে তা বাস্তবায়িত হয়। কেউ কেউ বলেছেন- পরবর্তীতে মদীনা তৈয়্যবার বিজ্ঞ ওলামা কেরামের অব্যাহত আগমন-আবির্ভাবের দিকেও এতে ইঙ্গিত রয়েছে।

অদৃশ্যের খবরদাতা আমাদের আক্বা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম একজন ক্বোরাঈশ বংশীয় বিজ্ঞ আলিমের আবির্ভাবের সুসংবাদ দিয়েছেন। এ

প্রসঙ্গে হযরত ইবনে মাস'ঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- **لَا تَسُبُّوْا قُرَيْشًا فَاِنَّ عَالِمَهَا يَمْلَأُ طِبَاقَ الْاَرْضِ عِلْمًا** অর্থাৎ "ক্বোরাঈশকে মন্দ বলোনা। কেননা, তাদের একজন আলিম গোটা বিশ্বকে জ্ঞানে ভরপুর করে দেবে।" ইমাম আহমদ প্রমূখের অভিমত হচ্ছে- এ হাদীসে পাকে ইমাম শাফে'ঈ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন- আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল সব সময় সত্যের উপর অটল থাকবে এ পর্যন্ত যে, আল্লাহ তা'আলার হুকুম অর্থাৎ ক্বিয়ামত এসে যাবে। হুযূর খবর দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক শতাব্দির প্রারম্ভে এমন এক মুজাদ্দিদ (সংস্কারক) পয়দা করবেন, যিনি দ্বীনের সংস্কার করবেন। এক যুদ্ধ চলকালে হুযূর খবর দিয়েছেন যে, এক বিষাক্ত হাওয়া মদীনা মুনাওয়ারায় প্রবাহিত হয়েছে। হুযূর এর কারণও উল্লেখ করেছেন যে, সেটা মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থানরত এক মুনাফিক্বের মৃত্যু ঘটানোর জন্যই প্রবাহিত হয়েছে। যুদ্ধ শেষে ফিরে আসার পর অনুরূপই দেখা গেছে। এক ব্যক্তি সম্পর্কে খবর দিয়েছেন যে, সে গনীমতের মাল থেকে এক ইহুদির এক বস্তু আত্মসাৎ করেছে। পরবর্তীতে সেটা তার বাসস্থান থেকে বের হয়েছে। অনুরূপ, একজন লোক সম্পর্কে বলেছেন যে, সে চাদর চুরি করেছে। পরক্ষণে তা তার সামগ্রী থেকে বের করা হয়েছে। একবার হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন হারিয়ে যাওয়া উট্নীর অবস্থান বলে দিয়েছিলেন- সেটা অমুক উপত্যকায় আছে। সেটার লাগাম সেখানে একটি গাছের সাথে আটকা পড়েছে। সুতরাং সেটা সেখানে সেভাবেই পাওয়া গেছে।

একদা হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম খবর দিলেন- এক নারী মক্কাবাসীদের প্রতি লিখিত একটি চিঠি নিয়ে যাচ্ছে। মহিলাটি এ ধরনের, অমুক উপত্যকা দিয়ে যাচ্ছে। তার নিকট থেকে চিঠিটা উদ্ধার করে নিয়ে এসো! সুতরাং হযরত আলী কার্‌রামাল্লাহু তা'আলা ওয়াজহাহু দু/একজনকে সাথে নিয়ে ওই মহিলার খোঁজে বের হয়ে পড়লেন। তাঁরা মহিলাকে ওই স্থানে পেয়েছেন যেখানে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন। এঘটনা হাদীস শরীফের কিতাবাদিতে রয়েছে। সূরা 'মুমতাহিনা'র শানে নুযূলও এ ঘটনাই।

হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র আপন চাচা হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে ওই অর্থ-সম্পদের কথা বলে দিয়েছিলেন, যা তিনি তাঁর স্ত্রী উম্মুল ফদ্বলকে অর্পণ করে গিয়েছিলেন। আর ওই সম্পদের খবর তিনি ও তাঁর স্ত্রী ছাড়া আর কেউ জানতো না। ইল্‌মে গায়বের এমন মহিমা দেখে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তখনই বলেছিলেন, যখন তিনি মুমূর্ষ অবস্থার মতো সংকটময় অবস্থায় পৌঁছে ছিলেন, ''এটা সম্ভব যে, তুমি এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাবে এবং জীবিত থাকবে এ পর্যন্ত যে, একটা জনগোষ্ঠী তোমার দ্বারা উপকৃত হবে, অর্থাৎ মুসলমানগণ, আর অপর সম্প্রদায় ক্ষতির সম্মুখীন হবে, অর্থাৎ কাফিরগণ।'' অর্থাৎ হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দীর্ঘায়ু হবার সুসংবাদ দিয়েছিলেন। বাস্তবেও তাই ঘটলো। 'আশরাহ্-ই মুবাশ্শারাহ' (বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবীর)'র মধ্যে তিনিই সব শেষে ইন্তিকাল করেছেন। তিনি ৫৫ কিংবা ৫৭ হিজরীতে, কারো কারো মতে ৫৮ হিজরীতে ওফাত পান। হুযূর খবর দিয়েছিলেন, ''উবাই ইবনে খালাফ আমার হাতে মারা যাবে।'' তিনি আরো ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, ওতবাহ্ ইবনে আবূ লাহাবকে আল্লাহর কোন কুকুরই খেয়ে ফেলবে। সুতরাং তাকে বাঘে খেয়েছিলো।

ঐতিহাসিক বদরের যুদ্ধের দিন (পূর্ববর্তী রাতে) কতিপয় কাফিরের নিহত হবার স্থানের উপর চিহ্ন অংকন করেই তাদের ধংসের সংবাদ দিয়েছিলেন। সুতরাং তারা ওই স্থানেই নিহত হয়ে পড়ে রয়েছিলেন, যেখানে হুযূর চিহ্ন অঙ্কিত করেছিলেন।

আমাদের আক্বা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইথিওপিয়ার বাদশাহ্ নাজাশীর ইন্তিকালের খবর মদীনা মুনাওয়ারায় ওইদিনই দিয়েছেন, যেদিন বাদশাহ্ নাজাশী হাবশায় (বর্তমান ইথিওপিয়া) ইন্তিকাল করেছিলেন। এমনকি জানাযা পড়ার স্থানে তাশরীফ নিয়ে গিয়ে চার তাকবীর সহকারে তাঁর জানাযার নামায ও সম্পন্ন করেছিলেন। ফিরোজ দায়লামীকে যখন তিনি 'কিস্‌রা' (ইরানের বাদশাহ)'র দূত হয়ে হুযূর করীমের দরবারে এসেছিলেন, ওইদিনই কিস্‌রা মারা যাবার সংবাদ দিয়েছিলেন, যেদিন কিস্‌রা মৃত্যুবরণ করেছিলো। ফিরোয দায়লামী যখন অনুসন্ধান করে সেটার বাস্তবতা খুঁজে পান তখনই ইসলাম গ্রহণ করেন।

হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু যার গিফারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুকে খবর দিয়েছিলেন যে, লোকেরা তাঁকে মদীনা মুনাওয়ারা থেকে বের করে দেবে। একদিন তিনি মসজিদ-ই নবভী শরীফে শয়ন করছিলেন। হুযূর এরশাদ করেছেন, '' হে আবু যার! তোমার ওই সময়ের অবস্থা কি হবে, যখন তোমাকে লোকেরা মসজিদ থেকে বের করে দেবে?'' তিনি আরয করলেন, ''আমি মসজিদে হারামে গিয়ে আশ্রয় নেবো।'' হুযূর এরশাদ করলেন, ''লোকেরা যখন তোমাকে সেখান থেকেও বের করে দেবে?'' (হাদীসের শেষ ভাগে আছে) হুযূর তাঁর উদ্দেশ্যে বলেছেন, ''তুমি

একাকী অবস্থায় দিনাতিপাত করবে, ওই অবস্থায়ই ওফাত বরণ করবে।'' এটাও হুবহু ঘটেছিলো। তিনি শেষ পর্যন্ত রাবাযায় গিয়ে একাকী অবস্থান গ্রহণ করেছেন এবং সেখানেই এমতাবস্থায় ওফাত বরণ করেছিলেন।

হুযূর পাহাড়কে বলেছেন, স্থির হয়ে যাও! তোমার উপর রয়েছেন- নবী, সিদ্দীক্ব ও শহীদ। হুযূর করীমের সাথে ছিলেন- হযরত আবূ বকর, হযরত ওমর ও হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুম। সুতরাং 'নবী' দ্বারা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, 'সিদ্দীক্ব' দ্বারা হযরত আবূ বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু বুঝায়। এটা তো সুস্পষ্টই। আর হযরত ওমর ফারুক্ব ও হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা যে শহীদ হবেন তা হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আগেভাগে বলে দিয়েছেন, যা হুবহু বাস্তবায়িত হয়েছে। এটাও প্রসিদ্ধ ঘটনা যে, হযরত সুরাক্বাকে হুযূর-ই-আকরাম বলেছিলেন- তখন তোমার কী অবস্থা হবে, যখন তুমি তোমার উভয় হাতে 'কিস্‌রা' (ইরানের বাদশাহ)'র কাঁকন পরিধান করবে? সুতরাং হযরত ফারূক্বে আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র খিলাফতকালে 'কিস্‌রা'র সামগ্রী এসেছে, আর তাতে তার ওই কাঁকনযুগলও ছিলো। হযরত ফারূক হযরত সুরাক্বার হাতে ওই কাঁকনযুগল পরিয়ে দিলেন। এরই মাধ্যমে হুযূর করীমের ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তব রূপ নিল। আর ফারূক্বে আ'যম বললেন, ''ওই খোদার প্রশংসা, যিনি 'কিস্‌রা'র হাত থেকে (তার কাঁকনগুলো) ছিনিয়ে নিয়ে সুরাক্বার হাতে পরিয়ে দিয়েছেন।

হুযূর করীম বাগদাদ শহর প্রতিষ্ঠার এবং ওলীদের কুর্কীতির সংবাদও দিয়েছিলেন। হুযূর করীম এরশাদ করেছেন- দাজলা ও দাজীলের মধ্যভাগে একটি শহর প্রতিষ্ঠিত হবে। বাগদাদ প্রতিষ্ঠিত হবার মাধ্যমে হুযূরের এ ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হয়েছে। হুযূর আরো এরশাদ করেছিলেন- এ উম্মতে এক ব্যক্তি সৃষ্টি হবে যাকে লোকেরা 'ওলীদ' বলে ডাকবে। সে এ উম্মতের নিকৃষ্টতম ব্যক্তি হবে। সে আপন সম্প্রদায়ের ফির'আউন হয়েছে এ ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হয়েছে।)

সিফ্ফীনের যুদ্ধ সম্পর্কে হুযূর ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। এরশাদ করেন- ততক্ষণ পর্যন্ত ক্বিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না দু'টি দল পরস্পর যুদ্ধ করবে আর উভয়ের দাবি এক হবে, অর্থাৎ উভয় দল মুসলমান হবে। বিজ্ঞ আলিমগণ বলেছেন- এ যুদ্ধ দ্বারা ঐতিহাসিক সিফ্ফীনের যুদ্ধ বুঝানো হয়েছে। ক্বাযী আবূ বকর ইবনুল আরাবী বলেন, এটা হচ্ছে প্রথম ঘটনা, যা ইসলামের ইতিহাসে হঠাৎ সংঘঠিত হয়েছে।

সুহায়ল ইবনে আমর ক্বোরাইশের অন্যতম সরদার ছিলেন এবং তাদের 'খতীব' (বক্তা/মুখপাত্র) ছিলেন। প্রাথমিক অবস্থায় তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা-ই কেরাম রিদ্‌ওয়ানুল্লাহি তা'আলা আলায়হিম

আজমা'ঈনকে গালমন্দ করতেন। বদরের যুদ্ধে যখন তিনি বন্দী হয়ে আসলেন তখন হযরত ফারূকে আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু আরয করলেন, ''হে আল্লাহর রসূল! আমাকে অনুমতি দিন- আমি তার দাঁতগুলো ভেঙ্গে দিই।'' হুযূর-ই আকরাম এরশাদ করলেন, ''হে ওমর! অবিলম্বে সে এমন এক স্থানে দণ্ডয়মান হবে যে, তুমি তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং তেমনি ঘটলো। তিনি মুসলমান হয়ে মক্কা মুকার্‌রামায় অবস্থান করতে লাগলেন। যখন হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাত শরীফ ও সাইয়্যেদুনা আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু খলীফা হয়েছেন মর্মে খবর আসলো, তখন তিনি খোৎবা দিলেন (বক্তব্য রাখলেন) এবং মুসলমানদের হৃদয়ে প্রশান্তি, স্থিরতা ও শক্তি যোগালেন। আর তাঁদের অর্ন্তদৃষ্টিকে জাগ্রত ও আলোকিত করলেন।

হযরত সাবিত ইবনে ক্বায়স ইবনে শাম্মাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর উদ্দেশে হুযূর এরশাদ ফরমান- এখন তোমার জীবন যাপন কতোই উত্তমরূপে হচ্ছে! মৃত্যুও পাবে শাহাদাতের। সুতরাং তিনি ইয়ামামায় মুসায়লামা কায্‌যাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন এবং সেখানে শাহাদাত বরণ করেন।

হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদকে খ্রিষ্টান বাদশাহ্ উকায়দারের বিরুদ্ধে (অভিযানে) পাঠানোর সময় বলে দিয়েছিলেন, ''তুমি তাকে নীল-গাভী (জঙ্গলী গাধা বিশেষ) শিকাররত অবস্থায় পাবে।'' সুতরাং তিনি তাকে ওই অবস্থায়ই পেয়েছিলেন।

মোটকথা, হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম অদৃশ্য রহস্যাদির প্রত্যেক দিক দিয়ে খবর দিয়েছেন, তাঁর নিকট মুনাফিক্বদের সমস্ত গোপন ভেদের কথা আর মুসলমানদের ওইসব ঘটনা, যেগুলো হুযূরের পবিত্র জীবদ্দশায়ও হুযূরের ওফাত শরীফের পর সংঘটিত হয়েছে, হচ্ছেও হবে- সবই সুস্পষ্ট ছিলো। তিনি ওইগুলো সম্পর্কে অবহিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওই যাদুর খবরও দিয়েছেন, যা লবীদ ইবনে আ'সাম নামক ইহুদী হুযূরের চিরুনী করার কারণে পৃথক হওয়া চুল মুবারকের উপর করেছিলো। হুযূর ওই চুক্তিনামাকে ওইপোকা খেয়ে ফেলেছে মর্মে সংবাদ দিয়েছেন। যা ক্বোরাইশের লোকেরা বনী হাশেমের বিরুদ্ধে লিখেছিলো। উল্লেখ্য, এ চুক্তিনামায় যেখানে আল্লাহর নাম লিপিবদ্ধ ছিলো সে স্থানটুকু ওইপোকা খায়নি। হুযূর বায়তুল মুক্বাদ্দাসের কাঠামোর বিবরণ তখনই দিয়েছিলেন, যখন ক্বোরাইশ শবে মি'রাজে মি'রাজ যাত্রার খবর অস্বীকার করছিলো।

হুযূর আরো খবর দিয়েছেন যে, শেষ যমানায় উম্মতের মধ্যে মন্দকার্যাদি প্রকাশ পাবে, আমানতদারী চলে যাবে, শয়তানের শিং বের হবে, খিয়ানত ছড়িয়ে

পড়বে, সমসাময়িকদের মধ্যে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ বিরাজ করবে, পুরুষদের সংখ্যা হ্রাস পাবে আর নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। অর্থসম্পদ কমে যাবে ফিৎনা-ফ্যাসাদ ছড়িয়ে পড়বে, আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকবে না, ভূমিকম্প হবে, হেজায থেকে আগুন বের হবে। এসব ক'টির বিস্তারিত বিবরণ মদীনা মুনাওয়ারার ইতিহাস-এর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি ক্বিয়ামতের পূর্বাভাসগুলো এতোই বিস্তারিতভাবে দিয়েছেন, যেগুলোর বিস্তারিত আলোচনার জন্য বৃহৎ কলেবরের প্রয়োজন হবে।

মোটকথা, এ ক্ষুদ্রপরিসরে অতি সংক্ষেপে ওইগুলো বর্ণনা করা হয়েছে, যেগুলো হুযূরের নুবূয়তের সত্যতা ও মু'জিযাদির প্রকাশের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ও সমুজ্জ্বল প্রমাণ বহন করে। আল্লাহ পাকের শোকর যে, তিনি আমাদেরকে এমন রসূলের উম্মত হবার সৌভাগ্য দান করেছেন।

আমাদের আক্বা ও মাওলা হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক যুগ। তখন কয়েকজন মাত্র সৌভাগ্যবান লোক ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে হযরত খাদীজা, হযরত আবূ বকর, হযরত আলী, হযরত যায়দ, হযরত ওসমান, হযরত ওবায়দাহ্, হযরত ত্বাল্‌হা, হযরত যোবায়ের ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাস্‌উদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম্ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁরা ইসলাম তো কবুল করেছেন; কিন্তু নিজেদের ইসলাম গ্রহণের বিষয়টা কাফিরদের থেকে তখনো গোপন করতেন। এক সময় এমন অবস্থা অবসান হলো। হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দরবারে এসে আরয করলেন, ''এয়া রসূলাল্লাহ্! আপনার উপর আল্লাহ্ তা'আলার সালাম। আমি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ নিয়ে এসেছি- ''লোকজনকে প্রকাশ্যে ইসলামের ব্যাপকভাবে দাওয়াত দিন!''

হুযূর-ই আক্‌রাম আবূ ক্বোবায়স পর্বতে আরোহণ করে ঘোষণা দিলেন, ''হে লোকেরা! 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (আল্লাহ্ ব্যতীত মা'বুদ নেই, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা আল্লাহর রসূল) বলে ঈমান নিয়ে এসো!''

কাফিরগণ হুযূর-ই আক্‌রামের আহবান শুনে 'দারুন্ নাদ্‌ওয়াহ্'(কমিটি ঘর)-এ সমবেত হলো। পরস্পর শলা-পরামর্শ করতে লাগলো। তারা বলতে লাগলো, ''মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আমাদের বোত্‌গুলোর মানহানি (?) করেছেন। পক্ষান্তরে তিনি আমাদেরকে এমন এক খোদার উপাসনা করার নির্দেশ দিচ্ছেন, যাঁকে আমরা জানি না, চিনি না। আমরা তিনশ' ষাটটি মূর্তি (উপাস্য) ছেড়ে এমন উপাস্যের উপাসনা কেন করবো, যাকে চোখে দেখা যায় না?'' মোটকথা, তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ ভাষায় হুযূর-ই আক্‌রাম সম্পর্কে অশোভন মন্তব্য করতে লাগলো। (না'উযু বিল্লাহ্!) এমন সব হতভাগার

মধ্যে শায়বাহ্ রবী'আহ্, ওয়ালীদ সাফ্ওয়ান্ ইবনে হারিস, সাখার ইবনে হারিস ও কিনানাহ্ ইবনে রাবী'আহ্ প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়। তাদের সবার কথা ছিলো, ''এমন মা'বূদের ইবাদতের প্রতি আহ্বান করার অধিকার হযরত মুহাম্মদ মোস্তফার নেই, যাঁকে আমরা দেখতে পাই না, যাঁকে আমরা চিনি না!'' (মা'আযাল্লাহ!)

তারপর তারা ওয়ালীদের দিকে মনোনিবেশ করলো। বললো, ''ওয়ালীদ! (হযরত) মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে তোমার ধারণা কি?'' ওয়ালীদ বললো, 'এখনতো কিছুই বলতে পারবো না, আমাকে তিন দিনের অবকাশ দাও!''

ওয়ালীদের দু'টি বোত্ (প্রতিমা) ছিলো। স্বর্ণ, রূপা ও অন্যান্য মূল্যবান ধাতব পদার্থ দ্বারা সে বোত দু'টি তৈরি করেছিলো। ওয়ালীদ ঘরে এসে ওই বোত্ দু'টিকে মূল্যবান কাপড় পরিয়ে, অপরূপ সাজে সজ্জিত করে চেয়ারের উপর বসালো আর তিনদিন যাবৎ সেগুলোর অনবরত উপাসনায় মগ্ন হলো। এ তিনদিন যাবৎ সে না পানাহার করেছে, না ঘর থেকে বের হয়েছে। বোত্ দু'টির সামনে অতি বিনয়ের সাথে উপাসনা করতে লাগলো। তৃতীয় দিন ওয়ালীদ বোত্দু'টির উদ্দেশে বললো, ''হে আমার উপাস্যদ্বয়! আমি আজ পর্যন্ত তোমাদের উপাসনা এভাবে কখনো করিনি। এ নিরেট! উপাসনার দোহাই দিচ্ছি! বলো, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) কি সত্য নবী, না তিনি তাঁর দাবিতে মিথ্যাবাদী?'' মূর্তির প্রতি অন্ধ বিশ্বাসী ওয়ালীদ আজ! কোন জবাব পেলে তা-ই সে সত্য বলে বিশ্বাস করবে। এ সুযোগে শয়তানও বসে নেই। 'মুস্ফির' নামের এক কাফির জিন-শয়তান ওয়ালীদের বোতের ভিতর প্রবেশ করলো। বোত্ দু'টিকে নাড়া দিলো। আর বোত্গুলোর মুখ থেকে বললো, ''মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) নবী নন। খবরদার তাঁর কথায় বিশ্বাস করবে না।'' (না'উযুবিল্লাহ্!) ওয়ালীদ খুশীতে আটকানা। সে সমস্ত কাফিরকে বলে পাঠালো। কাফিররা ওয়ালীদের ঘরে জমায়েত হতে লাগলো। সেও শয়তানের ওই কথা তাদেরকে শুনাতে লাগলো।

এদিকে এ খবর যখন হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট পৌঁছলো, তখন হুযূর দুঃখিত হলেন। হুযূর-ই আক্রামকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে সাথে সাথে হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম প্রেরিত হলেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি সান্ত্বনা বাণী শুনালেন। তিনি বললেন, ''যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অবধারিত ওই হতভাগার জন্য, যে এমন ভ্রান্ত কথা বলেছে।''

একথা শুনে ওয়ালীদ সর্বাপেক্ষা বড় বোত্ 'হুবল'-এর সামনে সব কাফিরকে ডেকে পাঠালো। এবার সে হুবলকে অপূর্ব সাজে সজ্জিত করলো। কাফিররা

হুব্লকে সাজদা করলো। ওদিকে হুযূর-ই আক্রামকেও সেখানে হাযির হবার জন্য আবেদন জানালো। তার উদ্দেশ্য ছিলো- হুযূর-ই আক্রামের সামনেই হুবলের মুখে তার মন্তব্য শোনাবে। হুযূর-ই আকরামও তাশরীফ আন্লেন। সাথে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুও ছিলেন।

ওয়ালিদ এবার হুবলের উদ্দেশে বলতে লাগলো, ''ওহে আমাদের উপাস্য! মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)- এরই সামনে তাঁর সম্পর্কে তোমার মন্তব্য শোনাও!'' ওই জিন্-শয়তান মুস্ফির আজও সুযোগ নিলো। সে হুবল্ বোতের ভিতর প্রবেশ করে হুযূর-ই আক্রাম সম্পর্কে অশোভন ও অবাস্তব কথা বলতে লাগলো।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস্'ঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হতভম্ব হয়ে গেলেন আর হুযূর-ই আক্রামের দরবারে আরয করলেন, ''হুযূর! এ কেমন অশালীন ও অবাস্তব ঘটনা!'' কিন্তু হুযূর নিশ্চিন্তে দীপ্তকণ্ঠে বললেন, ''আবদুল্লাহ্! ভয় নেই। এতে আল্লাহ তা'আলার এক মহা রহস্য রয়েছে। এক্ষুনি বাস্তব ঘটনা প্রকাশ পাবে।''

হুযূর-ই আক্রাম ওই সমাবেশ থেকে বের হয়ে গেলেন। পথিমধ্যে এক আরোহীর সাথে দেখা হলো। সবুজ পোশাক সজ্জিত অশ্বারোহী তার ঘোড়া থেকে নিচে নেমে পড়লো। হুযূরের দরবার মুবারকে সালাম আরয করলো। হুযূর এরশাদ করলেন, ''তুমি কে? তোমার পরিচয় দাও!'' আরোহী বললো, ''হুযূর! আমি একজন জিন্। আমি হযরত নূহ্ আলায়হিস্ সালাম-এর যুগে ঈমান এনেছি। আমার নাম মাহীন ইবনে 'আজ্হার। আমি 'তূর-ই সায়না' (প্রসিদ্ধ তূর পর্বতে)-এ থাকি। আমি আমার বাসস্থান থেকে একটু দূরে গিয়েছিলাম। ঘরে ফিরে দেখলাম আমার স্ত্রী দুঃখে ও ক্ষোভে কাঁদছে। এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বললো, 'শয়তান-জিন্ মুস্ফির মক্কায় ওয়ালীদের বোতের ভিতর প্রবেশ করে হুযূর-ই আক্রামের শানে অশালীন ও অবাস্তব কথাবার্তা বলেছে।'

খবরের বাস্তবতা জানতে পেরে আমি অমনি মুস্ফিরের পিছু ধাওয়া করলাম। আমি তাকে সাফা ও মারওয়ার মধ্যভাগে পেয়েছি ও কতল করে ফেলেছি। এই আমার তরবারি! তা থেকে তাঁরই রক্ত টপকে পড়ছে।'' হুযূর মাহীনের প্রতি খুশী হলেন ও তার জন্য দো'আ করলেন। আর মাহীন (জিন্) এবার আরয করলেন্, ''ইয়া রসূলাল্লাহ্! আপনার অনুমতি পেলে আমি বোতের ভিতর প্রবেশ করে আপনার প্রশংসা করবো এবং কাফিরদের সমালোচনা করবো।'' হুযূর-ই আক্রাম অনুমতি দিলেন।

পরদিন কাফিরগণ পুনরায় একত্রিত হলো। তারা হুযূরকেও হাযির হবার জন্য আহ্বান করলো। কাফিররা হুবল্ বোতের মাথার উপর মণিমুক্তা উৎসর্গ করলো। আর অতি বিনয় সহকারে সাজদা করে বললো, ''ওহে উপাস্য! আজও মুহাম্মদ

মোস্তফার বিপক্ষে তোমার মন্তব্য পেশ করো!''

আজ কিন্তু হুবলের মুখে অন্যদিনের বিপরীত মন্তব্য। আজ হুবল বোতের ভিতর থেকে উচ্চারিত হচ্ছে-

''হে মক্কাবাসীরা! জেনে রেখো যে, মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সত্য। তাঁর দ্বীন ও বাণী সত্য। পক্ষান্তরে তোমরা ও তোমাদের বোত্গুলো হচ্ছে মিথ্যা। তোমরা পথভ্রষ্ট। তোমরা যদি হযরত মুহাম্মদ মোস্তফার উপর ঈমান না আনো, তবে ক্বিয়ামত-দিবসে তোমাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। ওঠো, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সত্য বলে মেনে নাও। সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ।

সর্বাধিক বড় বোত্ হুবলের ভিতর থেকে সরকার-ই দু'আলমের প্রশংসা শুনে আবূ জাহ্ল ওঠলো আর সেটাকে তুলে মাটির উপর সজোরে ছুঁড়ে মারলো। বোত্টা টুক্রো টুক্রো হয়ে গেলো।

হুযূর-ই আকর্রাম ও সাহাবা-ই কেরাম খুশী মনে ওখান থেকে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। [সূত্রঃ জামে'উল মু'জিযাত]

জিন্দের রসূল

আমাদের আক্বা ও মাওলা হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক যুগ। তখন কয়েকজন মাত্র সৌভাগ্যবান লোক ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে হযরত খাদীজা, হযরত আবূ বকর, হযরত আলী, হযরত যায়দ, হযরত ওসমান, হযরত ওবায়দাহ্, হযরত ত্বাল্হা, হযরত যোবায়ের ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাস্উদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম্ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁরা ইসলাম তো কবুল করেছেন; কিন্তু নিজেদের ইসলাম গ্রহণের বিষয়টা কাফিরদের থেকে তখনো গোপন করতেন। এক সময় এমন অবস্থা অবসান হলো। হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দরবারে এসে আরয করলেন, ''এয়া রসূলাল্লাহ্! আপনার উপর আল্লাহ্ তা'আলার সালাম। আমি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ নিয়ে এসেছি- ''লোকজনকে প্রকাশ্যে ইসলামের ব্যাপকভাবে দাওয়াত দিন!''

হুযূর-ই আক্রাম আবূ ক্বোবায়স পর্বতে আরোহণ করে ঘোষণা দিলেন, ''হে লোকেরা! 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (আল্লাহ্ ব্যতীত মা'বুদ নেই, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা আল্লাহর রসূল) বলে ঈমান নিয়ে এসো!''

কাফিরগণ হুযূর-ই আক্রামের আহবান শুনে 'দারুন্ নাদ্ওয়াহ্'(কমিটি ঘর)-এ সমবেত হলো। পরস্পর শলা-পরামর্শ করতে লাগলো। তারা বলতে লাগলো, ''মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আমাদের বোত্গুলোর মানহানি (?) করেছেন। পক্ষান্তরে তিনি আমাদেরকে এমন এক খোদার উপাসনা করার নির্দেশ দিচ্ছেন, যাঁকে আমরা জানি না, চিনি না। আমরা তিনশ' ষাটটি মূর্তি (উপাস্য) ছেড়ে এমন উপাস্যের উপাসনা কেন করবো, যাকে চোখে দেখা যায় না?'' মোটকথা, তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ ভাষায় হুযূর-ই আক্রাম সম্পর্কে অশোভন মন্তব্য করতে লাগলো। (না'উযু বিল্লাহ্!) এমন সব হতভাগার মধ্যে শায়বাহ্ রবী'আহ্, ওয়ালীদ সাফ্ওয়ান্ ইবনে হারিস, সাখার ইবনে হারিস ও কিনানাহ্ ইবনে রাবী'আহ্ প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়। তাদের সবার কথা ছিলো, ''এমন মা'বূদের ইবাদতের প্রতি আহ্বান করার অধিকার হযরত মুহাম্মদ মোস্তফার নেই, যাঁকে আমরা দেখতে পাই না, যাঁকে আমরা চিনি না!'' (মা'আযাল্লাহ!)

তারপর তারা ওয়ালীদের দিকে মনোনিবেশ করলো। বললো, ''ওয়ালীদ!

(হযরত) মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে তোমার ধারণা কি?'' ওয়ালীদ বললো, 'এখনতো কিছুই বলতে পারবো না, আমাকে তিন দিনের অবকাশ দাও!''

ওয়ালীদের দু'টি বোত্ (প্রতিমা) ছিলো। স্বর্ণ, রূপা ও অন্যান্য মূল্যবান ধাতব পদার্থ দ্বারা সে বোত দু'টি তৈরি করেছিলো। ওয়ালীদ ঘরে এসে ওই বোত্ দু'টিকে মূল্যবান কাপড় পরিয়ে, অপরূপ সাজে সজ্জিত করে চেয়ারের উপর বসালো আর তিনদিন যাবৎ সেগুলোর অনবরত উপাসনায় মগ্ন হলো। এ তিনদিন যাবৎ সে না পানাহার করেছে, না ঘর থেকে বের হয়েছে। বোত্ দু'টির সামনে অতি বিনয়ের সাথে উপাসনা করতে লাগলো। তৃতীয় দিন ওয়ালীদ বোত্দু'টির উদ্দেশে বললো, ''হে আমার উপাস্যদ্বয়! আমি আজ পর্যন্ত তোমাদের উপাসনা এভাবে কখনো করিনি। এ নিরেট! উপাসনার দোহাই দিচ্ছি! বলো, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) কি সত্য নবী, না তিনি তাঁর দাবিতে মিথ্যাবাদী?'' মূর্তির প্রতি অন্ধ বিশ্বাসী ওয়ালীদ আজ! কোন জবাব পেলে তা-ই সে সত্য বলে বিশ্বাস করবে। এ সুযোগে শয়তানও বসে নেই। 'মুস্ফির' নামের এক কাফির জিন-শয়তান ওয়ালীদের বোতের ভিতর প্রবেশ করলো। বোত্ দু'টিকে নাড়া দিলো। আর বোত্গুলোর মুখ থেকে বললো, ''মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) নবী নন। খবরদার তাঁর কথায় বিশ্বাস করবে না।'' (না'উযুবিল্লাহ্!) ওয়ালীদ খুশীতে আটকানা। সে সমস্ত কাফিরকে বলে পাঠালো। কাফিররা ওয়ালীদের ঘরে জমায়েত হতে লাগলো। সেও শয়তানের ওই কথা তাদেরকে শুনাতে লাগলো।

এদিকে এ খবর যখন হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট পৌঁছলো, তখন হুযূর দুঃখিত হলেন। হুযূর-ই আক্রামকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে সাথে সাথে হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম প্রেরিত হলেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি সান্ত্বনা বাণী শুনালেন। তিনি বললেন, ''যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অবধারিত ওই হতভাগার জন্য, যে এমন ভ্রান্ত কথা বলেছে।''

একথা শুনে ওয়ালীদ সর্বাপেক্ষা বড় বোত্ 'হুবল'-এর সামনে সব কাফিরকে ডেকে পাঠালো। এবার সে হুবলকে অপূর্ব সাজে সজ্জিত করলো। কাফিররা হুব্লকে সাজদা করলো। ওদিকে হুযূর-ই আক্রামকেও সেখানে হাযির হবার জন্য আবেদন জানালো। তার উদ্দেশ্য ছিলো- হুযূর-ই আক্রামের সামনেই হুবলের মুখে তার মন্তব্য শোনাবে। হুযূর-ই আকরামও তাশরীফ আন্লেন। সাথে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুও ছিলেন।

ওয়ালিদ এবার হুবলের উদ্দেশে বলতে লাগলো, ''ওহে আমাদের উপাস্য! মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)- এরই সামনে তাঁর সম্পর্কে তোমার মন্তব্য শোনাও!'' ওই জিন্-শয়তান মুস্ফির আজও সুযোগ নিলো। সে হুবল্ বোতের ভিতর প্রবেশ করে হুযূর-ই আক্রাম সম্পর্কে অশোভন ও অবাস্তব কথা বলতে লাগলো।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস্'ঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হতভম্ব হয়ে গেলেন আর হুযূর-ই আক্রামের দরবারে আরয করলেন, ''হুযূর! এ কেমন অশালীন ও অবাস্তব ঘটনা!'' কিন্তু হুযূর নিশ্চিন্তে দীপ্তকণ্ঠে বললেন, ''আবদুল্লাহ্! ভয় নেই। এতে আল্লাহ তা'আলার এক মহা রহস্য রয়েছে। এক্ষুনি বাস্তব ঘটনা প্রকাশ পাবে।''

হুযূর-ই আক্রাম ওই সমাবেশ থেকে বের হয়ে গেলেন। পথিমধ্যে এক আরোহীর সাথে দেখা হলো। সবুজ পোশাক সজ্জিত অশ্বারোহী তার ঘোড়া থেকে নিচে নেমে পড়লো। হুযূরের দরবার মুবারকে সালাম আরয করলো। হুযূর এরশাদ করলেন, ''তুমি কে? তোমার পরিচয় দাও!'' আরোহী বললো, ''হুযূর! আমি একজন জিন্। আমি হযরত নূহ্ আলায়হিস্ সালাম-এর যুগে ঈমান এনেছি। আমার নাম মাহীন ইবনে 'আজ্হার। আমি 'তূর-ই সায়না' (প্রসিদ্ধ তূর পর্বতে)-এ থাকি। আমি আমার বাসস্থান থেকে একটু দূরে গিয়েছিলাম। ঘরে ফিরে দেখলাম আমার স্ত্রী দুঃখে ও ক্ষোভে কাঁদছে। এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বললো, 'শয়তান-জিন্ মুস্ফির মক্কায় ওয়ালীদের বোতের ভিতর প্রবেশ করে হুযূর-ই আক্রামের শানে অশালীন ও অবাস্তব কথাবার্তা বলেছে।'

খবরের বাস্তবতা জানতে পেরে আমি অমনি মুস্ফিরের পিছু ধাওয়া করলাম। আমি তাকে সাফা ও মারওয়ার মধ্যভাগে পেয়েছি ও কতল করে ফেলেছি। এই আমার তরবারি! তা থেকে তাঁরই রক্ত টপকে পড়ছে।'' হুযূর মাহীনের প্রতি খুশী হলেন ও তার জন্য দো'আ করলেন। আর মাহীন (জিন্) এবার আরয করলেন্, ''ইয়া রসূলাল্লাহ্! আপনার অনুমতি পেলে আমি বোতের ভিতর প্রবেশ করে আপনার প্রশংসা করবো এবং কাফিরদের সমালোচনা করবো।'' হুযূর-ই আক্রাম অনুমতি দিলেন।

পরদিন কাফিরগণ পুনরায় একত্রিত হলো। তারা হুযূরকেও হাযির হবার জন্য আহ্বান করলো। কাফিররা হুবল্ বোতের মাথার উপর মণিমুক্তা উৎসর্গ করলো। আর অতি বিনয় সহকারে সাজদা করে বললো, ''ওহে উপাস্য! আজও মুহাম্মদ মোস্তফার বিপক্ষে তোমার মন্তব্য পেশ করো!''

আজ কিন্তু হুবলের মুখে অন্যদিনের বিপরীত মন্তব্য। আজ হুবল বোতের ভিতর

থেকে উচ্চারিত হচ্ছে-
‘‘হে মক্কাবাসীরা! জেনে রেখো যে, মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সত্য। তাঁর দ্বীন ও বাণী সত্য। পক্ষান্তরে তোমরা ও তোমাদের বোত্গুলো হচ্ছে মিথ্যা। তোমরা পথভ্রষ্ট। তোমরা যদি হযরত মুহাম্মদ মোস্তফার উপর ঈমান না আনো, তবে ক্বিয়ামত-দিবসে তোমাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। ওঠো, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সত্য বলে মেনে নাও। সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ।

সর্বাধিক বড় বোত্ হুবলের ভিতর থেকে সরকার-ই দু’আলমের প্রশংসা শুনে আবূ জাহ্ল ওঠলো আর সেটাকে তুলে মাটির উপর সজোরে ছুঁড়ে মারলো। বোত্টা টুক্রো টুক্রো হয়ে গেলো।

হুযূর-ই আকর্‌রাম ও সাহাবা-ই কেরাম খুশী মনে ওখান থেকে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। [সূত্রঃ জামে‘উল মু’জিযাত]

হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর অতুলনীয় বীরত্ব

প্রথমে আলোচনা করা যাক ‘বীরত্ব’ কাকে বলে? প্রসিদ্ধ অভিধানগ্রন্থ ‘সুরাহ্’-এ বর্ণনা করা হয়েছে- ভীতিকর অবস্থায় বা স্থানে নির্ভীকতা ও দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন করার নাম বাহাদুরী বা বীরত্ব। ‘শেফা’ শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে- শক্তির প্রাচুর্য, সেটাকে বিবেকের অনুগত করার নাম ‘শুজা‘আত’ বা বীরত্ব। ‘ক্বামূস’-এ বলা হয়েছে- ভয়ভীতির সময় মনে সাহস সঞ্চার করা ও তাকে সুদৃঢ় রাখার নাম বীরত্ব। হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে এ গুণটা তাঁর অন্যান্য গুণের ন্যায়ই পরিপূর্ণভাবে ছিলো।

সুতরাং অনেক সময় দেখা গেছে যে, যেখানে কঠিন অবস্থায় বড় বড় নির্ভীক লোকেরা স্থির থাকতে পারেন না, সেখানে হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে অটল রয়েছেন। তিনি স্বস্থান থেকে একটুও বিচ্যুত হননি; দৃঢ়তার সাথে অধিকতর গতিতে সম্মুখে অগ্রসর হয়েছেন; বিন্দু মাত্র পিছপা হননি। এ ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক হুনায়নের যুদ্ধের ঘটনা প্রণিধানযোগ্য। ওই যুদ্ধে কাফিরদের পক্ষ থেকে বৃষ্টির ন্যায় তীর বর্ষিত হয়েছে। ফলে সাহাবা-ই কেরামের মধ্যে একপ্রকার উত্তেজনা, উদ্বেগ ও টলটলায়মান অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো। কিন্তু হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্বস্থান থেকে একটুও নড়াচড়া করেননি। তিনি ঘোড়ার উপর আরোহণ রত ছিলেন। তখন হযরত আবূ সুফিয়ান ইবনে হারিস ইবনে আবদুল মুত্তালিব ঘোড়ার লাগাম ধরে দণ্ডায়মান ছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পাল্টা হামলা করার মনস্থ করলেন। সুতরাং তিনি ঘোড়া থেকে নামলেন। আল্লাহ্ তা‘আলার দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। আর পবিত্র হাত মুবারকে এক মুষ্ঠি মাটি তুলে নিলেন এবং কাফিরদের দিকে ছুঁড়ে মারলেন। সেদিন হুনায়নের প্রান্তরে এমন একজন কাফিরও ছিলো না, যার চোখে-মুখে ওই ধুলিকণা পতিত হয়নি। অমনি তাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো এবং তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। এ যুদ্ধের এক পর্যায়ে হুযূর-ই আক্‌রামকে একাকী পেয়ে কাফিররা ঘিরে ফেলেছিলো। তখন হুযূর-ই আক্‌রাম বীরদর্পে বলেছিলেন-

اَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِب ـ اَنَا اِبْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِب

অর্থাৎ ‘‘আমি নবী। একথা সত্য; মিথ্যা নয়। আমি হলাম আবদুল মুত্তালিবের

সন্তান।'' হুযূর-ই আক্রামের এ দৃঢ়তাপূর্ণ ঘোষণা শুনে কাফিররা ভীত হয়ে পড়েছিলো। সেদিন হুনায়ন প্রান্তরে হুযূর-ই পাকের চেয়ে নির্ভীক, দুঃসাহসী ও বীরপুরুষ আর কাউকেও দেখা যায়নি।

বর্ণিত আছে যে, হুনায়নের যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে মুসলমানগণ পিছপা হয়েছিলেন; কিন্তু তখন হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং ময়দানে অবতীর্ণ হলেন এবং কাফিরদের হামলার জবাব দিলেন। আর আনসারদের এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান করা হয়েছিলো। এতে সাহাবা-ই কেরাম যুদ্ধক্ষেত্রে পুনরায় ফিরে আসেন এবং রসূলুল্লাহর পাশে এসে একে একে সমবেত হলেন। শেষ পর্যন্ত মুসলমানদেরই বিজয় হয়েছিলো।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাআহু তা'আলা আনহুমা বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর চেয়ে অধিক বীরপুরুষ, নির্ভীক, দানশীল এবং আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি সন্তুষ্ট আর কাউকে আমি দেখিনি। আমীরুল মু'মিনীন সাইয়্যেদুনা আলী মুর্তাদ্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন, যখন যুদ্ধের লেলিহান শিখা দাউ দাউ করে জ্বলতো আর ইসলামী যোদ্ধাদের বক্ষগুলো যখন রক্তিম বর্ণ ধারণ করতো, তখন আমরা হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর আশ্রয় তালাশ করতাম। এমতাবস্থায় হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম দুশ্মনদের সবচেয়ে নিকটে অবস্থান করতেন এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে তিনি কঠিনতম ব্যক্তিতে পরিণত হতেন।

সীরাত বা যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাসবেত্তাগণ বলেন, যেহেতু হুযূর-ই আক্রাম যুদ্ধের ময়দানে দুশমনদের বেশী নিকটে অবস্থান করতেন, সেহেতু দুশমনদের নিকটে অবস্থান অনুসারে যারা হুযূর-ই আক্রামের নিকটে থেকে যুদ্ধ করতেন, তাদেরকেই লোকেরা বাহাদুর হিসেবে গণ্য করতো। হযরত ইমরান ইবনে হোসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, বিশাল বাহিনীর হামলার জবাবে পাল্টা হামলা করার জন্যও হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সর্বাগ্রে এগিয়ে যেতেন।

একরাতে মদীনা মুনাওয়ারায় গুজব রটে গেলো এবং তাতে সবাই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। গুজবটি ছিলো- মদীনা শরীফে দুশমন ঢুকে পড়েছে। খবরটি শুনে নবী-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সকলের আগে বেরিয়ে পড়লেন। তিনি হাতে তরবারি নিয়ে হযরত আবূ তালহা থেকে তাঁর ঘোড়াটি ধার নিয়ে ওই ঘোড়ায় আরোহণ করলেন। তাঁর ঘোড়াটি তখন খুব তেজস্বী ও দ্রুতগামী ছিলো। ঘোড়ায় আরোহণ করে যেদিক থেকে আওয়াজ শোনা যাচ্ছিলো, হুযূর-ই আক্রাম সেদিকে চলে যাচ্ছিলেন। ওই স্থান অনুসন্ধান করে হুযূর-ই আক্রাম যখন ফিরে আসছিলেন, তখন রাস্তায় ওইসব লোকের

সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হলো যাঁরা তাঁর পরে ঘর থেকে বের হয়েছিলেন। তিনি তাঁদেরকে দেখে বললেন, ''চলো, এখানে কিছুই ঘটেনি।'' এখানে উল্লেখ্য, এ ঘটনায় একদিকে হুযূর-ই আক্রামের বীরত্ব ও নির্ভীকতা প্রকাশ পায়, অন্যদিকে একটি বিশেষ মু'জিযাও প্রকাশ পেয়েছে। তা হচ্ছে- হযরত আবূ তালহার ঘোড়াটি ইতোপূর্বে খুব ধীরগতি সম্পন্ন ছিলো। কিন্তু যখন হুযূর-ই আক্রাম সেটার পিঠে আরোহণ করলেন তখন থেকে ঘোড়াটি এতো বেশী দ্রুতগতি সম্পন্ন হয়ে গেলো যে, কারো ঘোড়াই সেটার সঙ্গে সমান গতিতে দৌড়াতে পারতো না। এটা হুযূর-ই আক্রামের বরকত ও মু'জিযা ছিলো।

দৈহিক শক্তি ও পেশীবলের দিক দিয়েও হুযূর-ই আক্রাম ছিলেন অতুলনীয়। বিশ্বখ্যাত কোন কুস্তিগীর পলোয়ানও তাঁর সামনে টিকতে পারতো না। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক্ব তাঁর কিতাবে এমন একটি ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। মক্কা নগরীতে রুকানা নামের এক পলোয়ান ছিলো। লোকটি কুস্তিতে খুব পারদর্শী ও শারীরিক শক্তিতে মক্কা নগরীতে ইতোপূর্বে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলো। দূরদূরান্তর থেকে বীর পুরুষরা তার সঙ্গে মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হবার জন্য আসতো। কিন্তু সে তাদেরকে অনায়সে ধরাশয়ী করে ছাড়তো। একদিন সে হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে পড়ে গেলো।

হুযূর-ই আক্রাম রুকানার উদ্দেশে বললেন, ''হে রুকানা, তুমি আল্লাহকে কেন ভয় করছো না এবং আমার দাওয়াতকে কেন কবুল করছো না?'' রুকানা বললো, ''আপনার নুবূয়তের সত্যতার পক্ষে কোন প্রমাণ পেশ করুন!'' হুযূর-ই আক্রাম বললেন, ''আমি যদি কুস্তিতে তোমাকে পরাজিত করতে পারি, তবে তুমি ঈমান আনবে কি?'' সে বললো, ''হাঁ।'' রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমালেন, ''তাহলে প্রস্তুত হও।'' এ কথা শুনে রুকানা কুস্তির জন্য প্রস্তুতি নিলো। কিন্তু হুযূর-ই পাক্ কোন বিশেষ প্রস্তুতি নিলেন না। তিনি তাঁর সাধারণ পোশাক-চাদর ও লুঙ্গি শরীফ পরিহিত অবস্থায় ছিলেন। প্রথম আক্রমণেই হুযূর-ই আক্রাম রুকানা পলোয়ানকে মাটিতে ফেলে দিলেন। রুকানার বিস্ময়ের অন্ত রইলোনা। হুযূর-ই পাক তাকে এমনভাবে ধরলেন যে, তার নড়াচড়া করারও উপায় ছিলো না, তার অনুরোধে হুযূর-ই করীম তাকে ছেড়ে দিলেন। এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার কুস্তি ধরা হলো। কিন্তু প্রতিবারেই রুকানা শোচনীয়ভাবে ধরাশয়ী হলো।

এতে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে রুকানা বললো, ''আপনার কী আজব শান! আপনি এতো শক্তির অধিকারী! এরপর সে (রুকানা) মুসলমান হয়েছে কিনা বর্ণনা পাওয়া যায়নি। আল্লাহ-ই সর্বাধিক জ্ঞাতা।

কুস্তিগীর ও পলোয়ান রুকানা ছাড়াও অন্যান্য কুস্তিগীরও হুযূর-ই আক্রামের সঙ্গে মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলো। হুযূর-ই আক্রাম সকলকেই পরাজিত

করেছিলেন। আবুল আসাদ জাহমী আরবে অতি শক্তিশালী লোক ছিলো। তার শারীরিক শক্তি এতো বেশী ছিলো যে, সে গরুর চামড়ার উপর দাঁড়িয়ে যেতো। লোকেরা তার চতুর্দিক থেকে নিজ নিজ শক্তি প্রয়োগ করে চামড়াটা টানাটানি করতো। টানের চোটে চামড়া ছিঁড়ে যেতো, কিন্তু তার পায়ের নিচ থেকে চামড়া সরিয়ে নিতে পারতো না। সে স্বস্থানে অটল থাকতো। একদিন সে হুযূর-ই পাককে বললো, ''আপনি যদি আমাকে ধরাশায়ী করতে পারেন, তাহলে আমি আপনার উপর ঈমান আনবো।'' সুতরাং হুযূর পাক তাকে ধরতেই যমীনের উপর ফেলে দিলেন। কিন্তু হতভাগা এরপরও ঈমান আনলো না।

আল্লাহ্ তা'আলা হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে শারীরিক শক্তিতেও অতুলনীয় করেছেন। হুযূর-ই আক্রামের মধ্যে চল্লিশজন বেহেশতী পুরুষের শক্তি ছিলো। ইমাম আহমদ, নাসাঈ ও হাকিমের মতে, হযরত যায়দ ইবনে আরকাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, একজন জান্নাতী পুরুষের মধ্যে একশ' জন পুরুষের সমান পানাহার ও স্ত্রী-সহবাসের সক্ষমতা থাকে। সুতরাং হুযূর-ই আক্রামের পবিত্র ও নূরানী সত্তার মধ্যে যে চল্লিশজন জান্নাতী পুরুষ তথা ৪০০০ (পার্থিব) পুরুষের শক্তি রয়েছে, তা সুস্পষ্ট হলো। [সূত্র. মাদারিজুন্নুবূয়ত: ১ম খণ্ড]

আগন্তুক ও গাছের সাক্ষ্য

হযরত ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু বলেছেন, একদিন আমি আমার পিতা হযরত আলী কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজ্‌হাহুকে বললাম, ''আব্বাজান, নবী-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কিছু ফযীলত বর্ণনা করুন!'' তখন হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন, ''হাসান, যদি উভয় জাহান নবী-ই আকরামের ফাযাইল (গুণাবলী) বর্ণনা করতে থাকে, তবে তারাও হুযূর-ই আকরামের গুণাবলী যথাযথভাবে বর্ণনা করতে পারবো না। তবুও তোমাকে শুধু একটি ফযীলত শুনাচ্ছি-

(হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন) ''আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাবূকের যুদ্ধের নির্দেশ দিলেন, তখন হুযূর-ই আকরামের মোকাবেলায় অসংখ্য কাফির সমবেত হয়ে গেলো। আল্লাহ্ তা'আলা আপন মাহবূবের উপর দয়া করলেন। শত্রুরা লাঞ্ছিত-অপমানিত হলো। ওই দিনগুলোতে হুযূর-ই আকরামের দরবারে এক দীর্ঘকায় লোক আসলো। এতো লম্বা-চওড়া মানুষ আমি জীবনে কখনো দেখিনি।''

হুযূর-ই আকরাম ওই আগন্তুকের উদ্দেশে বললেন, ''তুমি কে?'' সে বললো, ''হুযূর আমি হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর ওই সম্প্রদায়ের একজন লোক, যাদের সম্পর্কে ক্বোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে-

يَا مُوْسٰى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ

[হে মূসা, তাতে রয়েছে 'জাব্বারীন' সম্প্রদায়]

হুযূর-ই আকরাম বললেন, ''তোমার এতো দীর্ঘ জীবন?'' সে বললো, ''জ্বী-হাঁ! আমি দু'হাজার একশ' পঞ্চাশ বছর যাবৎ আল্লাহর ইবাদত করেছি।''

হুযূর এরশাদ করলেন, ''এতো দীর্ঘ জীবনের রহস্য কি?'' সে বললো, 'এয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার ও আপনার উম্মতের প্রতি আমার ভালবাসার কারণে আমি এতদীর্ঘ জীবন লাভ করেছি।''

আগুন্তক আরো বললো ''যখন হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর ওফাত হলো, তখন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইয়ূশা' আলায়হিস্ সালামকে প্রকাশ করলেন। আমি তাঁর সেনাবাহিনীতে ছিলাম। তাঁর সেনাবাহিনীতে চারশ' এমন পতাকা ছিলো, যেগুলোর প্রত্যেকটির উপর লিখা ছিলো-

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

[লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মদু রাসূ-লুল্লা-হ্]

হযরত ইয়ূশ' আলায়হিস্ সালাম দো'আ করলেন, ''হে আল্লাহ, হযরত মুহাম্মদ ও হযরত মুহাম্মদ মোস্তফার উম্মতের ওসীলায় আমাদেরকে বিজয় দান করো!'' [সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম]

দো'আ করার পর তিনি পতাকাগুলো শহরের চতুর্দিকে গেড়ে ছিলেন। তীব্র বেগে বাতাস চলছিলো। বাতাসে পতাকাগুলো পত্‌পত্ করে উড়তে লাগলো। শুধু তা নয়, পতাকাগুলো থেকে দুরূদ শরীফের আওয়াজ আসতে লাগলো। ফলে আমাদের মনে দারুন সাহসের সঞ্চার হলো। আমাদের জানা হয়ে গেলো যে, এটা তো হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নামেরই বরকত। কাঙ্ক্ষিত শহরের দরজা খুলে গেলো। হযরত ইয়ূশ' আলায়হিস্ সালাম তাঁর সৈন্যদল সহকারে শহরে ঢুকে পড়লেন। শহর জয় হয়ে গেলো। কাফিরগণ পরাজিত ও লাঞ্ছিত হলো।

অতঃপর হযরত ইয়ূশা' ওই শহর থেকে বের হয়ে গেলেন। আমিও তাঁর সাথে ছিলাম। আমি, হে আল্লাহর রাসূল, তখনই মনেপ্রাণে আপনার উপর ঈমান নিয়ে এসেছিলাম। আর সব সময় আপনার সাক্ষাতের আরজু করছিলাম। আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দো'আ করছিলাম যেন আমার এ আরজু পূরণ হয়। আল্লাহ্ আমার দো'আ কবূল করলেন। আমাকে দীর্ঘজীবন দান করেছেন। ফলে আমি আজ আপনার কদম শরীফে হাযির হতে পেরেছি। আল্-হামদুলিল্লাহ্!''

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু বলেন, আমরা বিভোর চিত্তে লোকটির কথা শুন্‌ছিলাম। এরপর আগন্তুক আরেক আশ্চর্যজনক কথা শোনালো। তা নিম্নরূপ-

"হে আল্লাহর রাসূল, এক জায়গায় এক বৃক্ষ ছিলো। আমি অনেকবার সেটার নিচে শয়ন করেছি। ওই বৃক্ষ একাধিক পয়গাম্বরের সালাম আপনার দরবারে পৌঁছিয়েছিলো। সেটার পাতাগুলোর উপর আপনার সমস্ত উম্মতের নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে।" আগন্তুক এ কথাগুলো বলছিলো; ইত্যবসরে হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম হাযির হলেন আর আরয করলেন, 'এয়া রসূলাল্লাহ্! লোকটি সত্য বলছে।"

হুযূর-ই আক্রাম হযরত জিব্রাঈলকে বললেন, "আমি ওই বৃক্ষটি দেখতে চাই। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা হযরত জিব্রাঈলকে বললেন, "আমার মাহবূবকে বলো, অমুক পাহাড়ের উপর গিয়ে বৃক্ষটিকে ডেকে বলতে। সেটা তাঁর সামনে এসে হাযির হয়ে যাবে।"

হযরত আলী বললেন, হুযূর পাহাড়ের উপর তাশরীফ নিয়ে গেলেন। হুযূরের সাথে ছিলেন হযরত আবূ বকর, হযরত ওমর, হযরত ওসমান আর আমি ও হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুম। হুযূর গাছটিকে ডাকলেন। অমনি সেটা ওই পাহাড়ের উপর আত্মপ্রকাশ করলো।

আল্লামা বূসীরী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হিও তাঁর কসীদা-ই বোর্দাহ্ শরীফে বলেছেন-

جَآءَ تْ لِدَعْوَتِهِ الْاَشْجَارُ سَاجِدَةً تَمْشِىْ اِلَيْهِ عَلٰى سَاقٍ بِلاَ قَدَمٍ

অর্থাৎ তিনি (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) গাছগুলোকে ডেকেছেন। সেগুলোতো আপন আপন শাখা-প্রশাখাগুলোকে ঝুঁকিয়ে দিয়ে সাজদাকারীদের মতো এমতাবস্থায় এসেছে যে, সেগুলো আপন আপন কাণ্ডের উপর ভর করে কোন পা ছাড়াই চলছিলো। [ক্বাসীদা-ই বোর্দাহ্ শরীফ]

হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবার গাছটির উদ্দেশে বললেন, "তুমি কিভাবে সৃষ্টি হয়েছো বলো।" গাছটি থেকে আওয়াজ আসলো। সেটা স্পষ্ট ভাষায় বলছিলো-

'এয়া রসূলাল্লাহ্! হযরত আদম আলায়হিস্ সালামকে জান্নাত থেকে বাইরে এনে যমীনের উপর নামিয়ে দিলেন। তখন তিনি খুব কান্নাকাটি করেছেন। তাঁর প্রথম অশ্রু-ফোঁটা যখন যমীনের উপর পড়লো, তখন তা থেকে আমি জন্মে মাটির আত্মপ্রকাশ করেছিলাম। তখন আমি অতিমাত্রায় ক্ষীণ ও শক্তিহীন ছিলাম।"

বৃক্ষটি থেকে এ আওয়াজও আসলো- "এয়া রসূলাল্লাহ্ আমার পাতাগুলো ও শাখা-প্রশাখার দিকে দেখুন!" হুযূর তাকালেন। দেখলেন সেগুলোর উপর লিপিবদ্ধ ছিলো-

"মুবারক হোক ওই ব্যক্তি, যে আল্লাহ্ ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ঈমান এনেছে। মুবারক হোক ওই ব্যক্তি, যে ফরযগুলো সম্পন্ন করেছে। হুযূর মুহাম্মদ মোস্তফার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি রজব, শা'বান

ও রমযান মাসে রোযা পালন করে সে ধন্য হোক!"

গাছটি আরো আরয করলো-

'এয়া রসূলাল্লাহ্, হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম থেকে আপনি পর্যন্ত প্রত্যেক নবী আমার ছায়ায় ইবাদত করেছেন। প্রত্যেক নবী আমাকে একথাই বলেছেন, "হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে আমার সালাম পৌঁছিয়ে দিও! তাঁর পবিত্র দরবারে আরয করিও যেন তিনি আমাদের জন্য দো'আ করেন!"

গাছের এসব কথা শুনে হুযূর আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তা'আলার শোক্র আদায় করলেন। তারপর হুযূর গাছকে বললেন, "তুমি আপন জায়গায় চলে যাও!" [জামে'উল মু'জিযাত]

সুতরাং সেটা চোখের আড়াল হয়ে গেলো।

'তাব্ তাব্' ও 'মায্ মায্' সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা বলেছেন, একদিন হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দরবারে এমন রূপে হাযির হলেন যে, তাঁর চব্বিশটা পাখা ছিলো, পায়ের গোছাযুগল যা'ফরানী (রং)-এর ছিলো। জিব্রাঈল এসে সালাম আরয করলেন। হুযূর-ই আক্রাম সালামের জবাব দিয়ে বললেন, "জিব্রাঈল, আজ তুমি এ কোন্ আকৃতিতে আস্লে?" তিনি জবাব দিলেন, "লায়লাতুল ক্বদর ও ইয়াউমুল আরফাহ্ (যথাক্রমে, ক্বদরের রাত ও আরফাহ্ দিবস)-এ ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমি এ রূপেই এসে থাকি। আজ 'আরফাহ্ দিবস'। তাই এমন রূপে এসেছি।" তিনি পুনরায় হুযূর-ই আকরামকে বললেন, "যমীনবাসীদের দিকে আপনাকে আল্লাহ্ তা'আলা দ্বীন প্রচারের জন্য প্রেরণ করেছেন। সুতরাং এখান থেকে অদূরে তায়েফ নামীয় শহর। ওখানে ৫০০ বোত্ প্রতিমা স্থাপন করা হয়েছে। শহরবাসীরা আল্লাহর পরিবর্তে ওই বোত্গুলোর পূজা করছে। আপনি তাদের হিদায়তের জন্য তাশরীফ নিয়ে যান!" হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন, হুযূর তাৎক্ষণিকভাবেই তায়েফ অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন।

হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাহাবা-ই কেরামের এক বিরাট দল ছিলো। তাঁরা যখন মক্কা মুকার্রমাহ্ ও তায়েফের মধ্যভাগে এক উপত্যকায় পৌঁছলেন, তখন তাঁরা এক বৃদ্ধের দেখা পেলো। লোকটি লাঠির উপর ভর করে দাঁড়িয়ে ছিলো। সে ছিলো তায়েফবাসীদের গুপ্তচর। সে যখন দেখলো যে, সাহাবা-ই কেরামের মধ্যে বায়ো:প্রাপ্ত ও যুবক, বড় ও ছোট সবাই হুযূরের প্রতি অস্বাভাবিক সম্মান ও আনুগত্য প্রদর্শন করছেন- যেন চাকররা

তাদের মালিককে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে থাকে, তখন সে আশ্চর্যান্বিত হলো। আর তাঁদের উদ্দেশে বললো, ''ওহে আগত সম্প্রদায়! তোমরা সবাই এক যুবককে খুব সম্মান করছো! মনে হচ্ছে উনি তিহামাহ্ ভূ-খণ্ডের ওই পথভ্রষ্ট, যিনি বলেন, আমি হলাম মুহাম্মদ, আল্লাহর রাসূল।'' বৃদ্ধের এ অশালীন কথা হুযূরও শুনে ফেলেছেন। তিনি মুচকি হাসলেন আর বললেন, ''আমি মোটেই পথভ্রষ্ট নই। আমি তো আল্লাহ্র রাসূল। আমার উপর ক্বোরআন নাযিল হয়েছে। তায়েফবাসীদেরকে আল্লাহ্র একত্ববাদের প্রতি দাওয়াত দেয়ার জন্য যাচ্ছি।''

বৃদ্ধ উন্মাদের মতো অট্টহাসি দিয়ে শহরের দিকে দৌঁড়ে পালাতে লাগলো। সে কানে হাত রেখে চিৎকার করে বলছিলো, ''ওহে শায়বাহ্ ও রবী'আহ্'র বংশধরা! হুশিয়ার থাকো! তোমাদের শত্রু আসছে। ওই পথহারা, যাঁর নাম মুহাম্মদ, তিনি তোমাদেরকে তোমাদের বাপদাদার ধর্ম থেকে ফেরানোর জন্য আসছেন।'' তার সতর্কবাণী (!) শুনতেই তায়েফের লোকেরা আপন আপন ঘরে ঢুকে পড়লো। অস্ত্রসজ্জিত হয়ে তারা শহরের মূল ফটক বন্ধ করে দিলো।

সাহাবীদের নিয়ে হুযূর-ই আক্রাম তায়েফে পৌঁছলেন। কিন্তু শহরের মূল ফটক বন্ধ ছিলো। কড়া নাড়লেন। কিন্তু তারা ফটক খুললো না। সাহাবীগণ হুযূর-ই আকরামের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বললেন, ''ওহে শহরবাসীরা! তোমরা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ' (কলেমা) পড়ো। তারা ভিতর থেকে আওয়াজ করলো -''আমাদের দরকার নেই।''

হুযূর ফটকের পাশে বিশদিন যাবৎ অবস্থান করলেন। একুশতম দিনে তায়েফবাসীরা সারাদিন পাথর ছুঁড়তে থাকে। বাইশতম দিবসে তায়েফবাসীরা বললো, ''হে যুবক, যদি আপনি সম্পদ চান, তবে আমরা তা দিতে প্রস্তুত! তবুও আমাদেরকে মুক্তি দিন।'' হুযূর এরশাদ ফরমালেন, ''আমার তোমাদের সম্পদের দরকার নেই। আমার একটি মাত্র আহবান- তোমরা 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্' কলেমা পড়ে ঈমান নিয়ে এসো!''

তারা বললো, ''আপনার যদি আমাদের অর্থ-সম্পদের দরকার না থাকে, তবে আমাদেরও আপনার কলেমার প্রয়োজন নেই।'' ২৩তম দিবসে ওই কাফিররা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো, ''উনিতো আমাদের পথরুদ্ধ করে রেখেছেন; না আমরা মুক্তভাবে চলাফেরা করতে পারছি, না ব্যবসা করতে পারছি; বাইরে যাবারও অন্য কোন পথ নেই। সুতরাং উত্তম হবে যদি আমরা ফটক খুলে দিয়ে তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনা করি।''

তারা পরস্পর পরামর্শ করছিলো। তখন এক যুবতি দাঁড়ালো। সে শহরের প্রধানের কন্যা ছিলো। তাওরীত, যাবূর ও ইন্জিলের জ্ঞান রাখতো। সে শহরবাসীদের বললো, ''তোমাদের ইচ্ছা কি?'' তারা বললো, ''আমাদের ইচ্ছা হচ্ছে শহরের মূল ফটক খুলবো আর আলোচনার বাহানা করে (হযরত) মুহাম্মদ

(সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)কে কতল করে ফেলবো।'' মেয়েটি বললো, ''তিনি তোমাদের নিকট কি চান?'' তারা বললো, ''তিনি দাবী করেন যে, তিনি নবী। তিনি চাচ্ছেন যেন আমরা তাঁর উপর ঈমান নিয়ে আসি। আর আমাদের উপাস্যগুলোকে ত্যাগ করি।'' মেয়েটি বললো, ''আমি তোমাদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হয়ে তাঁর নিকট যাচ্ছি। তিনি তো আরবী। প্রকাশ তো এটাই যে, তিনি হয়তো না হিব্রু ভাষা জানেন, না সুরিয়ানী ভাষা। তবে যদি তিনি নবী হন, তবে এ ভাষাগুলো অবশ্যই জানবেন। যদি তিনি আমার প্রশ্নগুলোর জবাব দিতে না পারেন, তবে তিনি তাঁর অনুসারীদের সামনে লজ্জিত হয়ে ফিরে যাবেন।'' শহরবাসীরা তাদের শাসকের কন্যাকে অনুমতি দিলেন এবং আলোচনা করার পরামর্শ দিলো।

মেয়েটি খুবই সুশ্রী ছিলো। তদুপরি উন্নত মানের পোশাক পরলো। তার একটা স্বর্ণের বোত ছিলো। সেটার চোখ দু'টি ছিলো ইয়াক্বুত পাথরের। সে তার বোতটি সাথে নিয়ে প্রথমে সাহাবা-ই কেরামের নিকট আসলো। যখন সে হুযূর-ই আক্রামের সামনে আসলো, তখন হুযূর আপন চক্ষু দু'টি তার দিক থেকে অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেন। মেয়েটি বললো, ''আপনি নম্র, ভদ্র, সুন্দর ও সুশ্রী ইন্সান। আপনি আমার দিক থেকে চেহারা ফিরিয়ে নিলেন কেন?'' হুযূর বললেন, ''যতক্ষণ পর্যন্ত বোতটা তোমার নিকট থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি না তোমার দিকে তাকাবো, না তোমার সাথে কথা বলবো।'' একথা শুনামাত্র মেয়েটি তার বোতটা ফেলে দিলো। হুযূর এবার মেয়েটির নিটক গিয়ে বললেন, ''বেটী! এখানে বসো!'' সে বললো, ''আপনি তাশরীফ রাখুন! আপনার অধিকার বেশী।'' মেয়েটির উত্তর শুনে সাহাবা-ই কেরামকে হুযূর বললেন, ''মেয়েটি সুস্থ স্বভাব ও পরিপূর্ণ বিবেকবান। সে ঈমান নিয়ে আসবে।'' মেয়েটি আরয করলো, ''সত্যি করে বলুন আপনি কে?'' হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, ''আমি মুহাম্মদ, আল্লাহ তা'আলার রসূল, ক্বোরআনের ধারক।'' একথা শুনে মেয়েটি এত জোরে হেসে উঠলো যে, তার আওয়াজ তায়েফবাসীরা পর্যন্ত শুনেছে। তখন হুযূর এরশাদ করলেন, ''বেটী, এতে আশ্চর্যের কি দেখলে যে, এত জোরে হাসছো?'' মেয়েটি বললো, ''এটা কি আশ্চর্যের নয় যে, আপনার মতো উজ্জ্বল ও লাবণ্যময় চেহারার অধিকারী ও মধুর সুরে কথা বলেন এমন ব্যক্তিত্ব মিথ্যা বলছেন?'' হুযূর এরশাদ কররেন, ''না বেটী! আমি মিথ্যা বলছি না। আমি তো মিথ্যা ও মিথ্যাবাদী থেকে (আল্লাহর) আশ্রয় চাই। তুমি বলো, বেটী! তোমার নিকট (সত্য নবীর) কোন্ পরিচিতিটুকু আছে, যার কারণে তুমি আমার নুবূয়তকে অস্বীকার করছো? মেয়েটি বললো, ''হ্যাঁ আমার নিকট পরিচিতি আছে। তা হচ্ছে- আপনি যদি শেষ যমানার নবী হোন, তবে যাবূর শরীফে উল্লেখিত আপনার নাম ও সেটার অর্থ অবশ্যই

আপনার জানা আছে। বলুন ওই নাম কি? কি সেটার অর্থ?''
হুযূর-ই আকরাম এরশাদ করলেন, ''যবূরে আমার নাম 'মাহী' (اَلْمَاحِیْ); যার অর্থ মিথ্যাকে নিশ্চিহ্নকারী। অপর নাম 'আহমদ' (احمد), যার অর্থ হচ্ছে জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী। আচ্ছা বলুন তো তাওরীত শরীফে দু'টি শব্দ আছে- 'মায্' 'মায্' (ماذ ماذ)। ওই দু'টির অর্থ কি?'' হুযূর বললেন, ওই দু'টির অর্থ 'আহমদ' ও 'মাহমূদ'। আসমানে আমার নাম আহমদ ইবনে আব্দুল্লাহ্, আর যমীনে 'মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্'। মেয়েটি বললো, ''আরো দু'টি শব্দ আছে- 'ত্বাব ত্বাব' (طاب طاب)। বলুন তো ওই দু'টির অর্থ কি?'' হুযূর বললেন, ''ওই দু'টির অর্থ হচ্ছে- আমি হলাম 'আত্বইয়াবুত্ব ত্বাইয়্যেব' (اَطْیَبُ الطَّیِّبُ)। (সর্বাধিক পবিত্র); তদুপরি, যে সম্প্রদায়ে আমার নাম ডাকা হবে, তারা অশ্রুসজল হবে।'' মেয়েটি এবার বললো, ''ইন্জীলে একটি শব্দ আছে- 'ফার ক্বালীত্ব' (فار قلیط); এর অর্থ কি?'' হুযূর এরশাদ ফরমালেন, ''এর অর্থ হচ্ছে- হক্ব ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী। তিনি হলেন আমিই; যিনি মিথ্যা উপাস্যগুলো ও সত্য উপাস্যের মধ্যে পার্থক্য কারী।'' হুযূরের এ স্পষ্ট বর্ণনা শুনে মেয়েটি বললো, আমাদের নিকট শেষ যামানার নবীর আরো একটি পরিচয় আছে। তা হচ্ছে- যখন হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম আসনের উপর তাশরীফ নিয়ে গেলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, ''আমি আমার রবের নিকট যাচ্ছি। আমার পর আরবী রসূল আসবেন, যাঁর পিতামাতা ইন্তিকাল করবেন আর তখন তিনি ইয়াতীম হয়ে থাকবেন। তাঁর উম্মতগণ আল্লাহর হামদ্ (প্রশংসা) করবেন। যখন তাঁরা নামায পড়বেন, তখন তাঁরা ফিরিশতাদের মতো কাতারবন্দি হবেন। ওই নবীর সাহাবীগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর ও পরস্পরের মধ্যে হৃদয়বান হবেন। এসব বৈশিষ্ট্য কি আপনার ও আপনার উম্মতের মধ্যে আছে?''
হুযূর এরশাদ ফরমালেন, ''বেটী! তুমি সত্য বলেছো। আমি হলাম ওই নবী; আর এরা হলো আমার সাহাবী; যাঁদের মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান।'' মেয়েটি এবার বলতে লাগলো, ''ওহে পছন্দনীয় চরিত্রের অধিকারী! আপনার পোশাক, গড়ন ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাদি নি:সন্দেহে পয়গাম্বরসুলভ। কিন্তু একটি চিহ্ন এখনো আমার দেখার বাকী আছে। সেটা যদি আপনার মধ্যে থাকে, তবে নি:সন্দেহে আপনি আল্লাহর রাসূল।'' হুযূর বললেন, ''সেটা কি?'' মেয়েটি বললো, ''আপনার পৃষ্ঠ মুবারক দেখান!'' মেয়েটির আবেদন অনুসারে হুযূর আপন পৃষ্ঠ মুবারক প্রকাশ করলেন, যাতে 'মোহরে নবূয়ত' চমকাচ্ছিলো। মেয়েটি মোহরে দেখতেই ঝুঁকে গেলো আর বললো, ''আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত উপাস্য নেই, আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আল্লাহর রাসূল।''
তারপর শুরু হলো চরম পরীক্ষা। ইসলাম কবূল করার পর মেয়েটা বললো, "হে

শায়বাহ্ ও রবী'আহর বংশধররা! তোমরা ইসলাম কবূল করো এবং দোযখের আগুন থেকে নিজেদের রক্ষা করো।" মেয়েটার চার ভাই ছিলো। তার পিতা তাদেরকে ডেকে বললো, ''তোমাদের বোন পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। তোমাদেরকে আমি অনুমতি দিলাম- তাকে তোমাদের ইচ্ছামতো নির্যাতন করো। তারাও তাদের বোনকে বললো, ''আমরা তোমার জিব্বা কেটে ফেলবো। পাগলা কুকুর লেলিয়ে দেবো; যা তোমার শরীরকে টুকরো টুকরো করে খেয়ে ফেলবে। তোমাকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে ছাই সমুদ্রে ভাসিয়ে দেবো।'' কিন্তু মেয়েটি বললো, ''আমি কোনটারই পরোয়া করি না। আমি হযরত মুহাম্মদ মোস্তফাকে চিনেছি। আর আমিতো জাহান্নামের কুকুরগুলোর আক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে গেছি; সুতরাং দুনিয়ার কুকুরের আমায় ভয় কিসের? আর আমি যখন জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে গেছি, তখন এ দুনিয়ার আগুনের ভয় কিসের?'' হতাশ হয়ে পিতা ও পুত্ররা মেয়েটির উপর সব ধরনের নির্যাতন চালালো। তার হাত পা কেটে তাকে হত্যা করলো। চোখ দু'টি বের করে ফেললো। আর মেয়েটি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাম জপতে জপতে শহীদ হয়ে গেলো। তারপর তার বিবস্ত্র লাশ মুসলমানদের দিকে নিক্ষেপ করলো। হুযূর-ই আকরাম তা দেখে কেঁদে ফেললেন এবং নিজের চাদর মুবারক দান করে দিলেন, যা কাফন হিসেবে পরিয়ে জানাযার নামায পড়ানোর পর দাফনের ব্যবস্থা করলেন। হুযূর সুসংবাদ দিলেন, "সে শাহাদাত বরণের সাথে সাথে জান্নাতে আপন ঘর দেখে নিয়েছে। তার জন্য আল্লাহ তা'আলা রহমতের দরজাগুলো খুলে দিয়েছেন।"
অত:পর সেখানে (তায়েফ) আরেকজন হাবশী ক্রীতদাসও মুসলমান হলে তাঁকে তারা হত্যা করলো আর তার উলঙ্গ লাশও হুযূরের দিকে ছুঁড়ে মারলো। হুযূর একইভাবে তার জানাযার নামায পড়িয়ে দাফন করালেন।
পরদিন হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম এসে তায়েফবাসীদের পরিকল্পনা সম্পর্কে জানিয়ে দিলেন। তাদের পরিকল্পনা ছিলো যে, তারা হুযূর ও সাহাবীদের শহীদ করে ফেলবে। তাও এভাবে যে, তাদের নিকট অগণিত প্রশিক্ষিত কুকুর ছিলো। তারা সেগুলো মুসলমানদের দিকে ছেড়ে দেবে। এরপর হুযূর সাহাবা-ই কেরামকে সাথে নিয়ে তায়েফে প্রবেশ করলেন। সেখানে তাদের কুকুরগুলো দেখে সাহাবা-ই কেরাম ভয় পেয়ে গেলেন। তায়েফবাসীরাও কুকুরগুলোর শিকল খুলে দিয়ে হুযূর ও সাহাবা কেরামকে হামলা করার ইঙ্গিত করলো।
হুযূর-ই আকরাম আসমানের দিকে তাকালেন আর আরয করলেন, "হে আসমানসমূহ ও যমীনের মাবুদ! আদম ও হাওয়ার পরওয়ারদিগার; শীস, ইউনুস, মূসা ও ইব্রাহীমের মুনিব! (আলায়হিমুস্ সালাম) তোমায় মাহে রমযান, আশূরা, আরফাহ ও জুমু'আর দিনের শপথ! কুকুরগুলোরকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দাও!''

হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা বলেছেন, হুযূরের দো'আর পর আমরা দেখলাম যে, সমস্ত কুকুর মাটিতে সেগুলোর মুখ মুছতে মুছতে আমাদের সামনে আসলো আর লেজ নাড়তে নাড়তে আনুগত্য প্রকাশ করতে লাগলো। হুযূর বললেন, "হে কুকুররা! তোমরা তায়েফবাসীদের উপর হামলা করো।" সেগুলো নির্দেশ পাওয়া মাত্র তায়েফবাসীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আর তাদের কাপড় ছিড়ে ফেললো, দেহ চিরে ফেলতে লাগলো। তারা ভীত-সন্ত্রস্থ হয়ে তায়েফ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হলো। তখন তায়েফে বোতগুলো ছাড়া আর কেউ রইলো না।

এবার হুযূর মুর্তিগুলো ভাঙ্গতে লাগলেন। ইত্যবসরে তায়েফের লোকেরা একত্রিত হয়ে পাথর হাতে নিয়ে ফিরে আসলো এবং মুসলমানদের উপর হামলা করে বসলো। তারা হুযূরকে পাথর ছুঁড়তে লাগলো। এতে নূর নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর গোটা শরীর মুবারক জখমপ্রাপ্ত হয়েছিলো। এক হাবশী ক্রীতদাস উটের গোছার হাড্ডি দিয়ে হুযূরের কপালে আঘাত করেছিলো। এতে হুযূরের কপাল মুবারকে গভীর জখম লেগেছিলো। হুযূরের চেহারা ও দাড়ি মুবারক রক্তে রঞ্জিত হয়ে গিয়েছিলো। এতে তিনি কিছুটা দুর্বলতা অনুভব করেছিলেন। তখন তাঁর খুব পিপাসা হলো। তিনি পানি চাইলে সাহাবীগণ আরয করলেন, 'হুযূর! এখানে পানি সংগ্রহ করা মুশকিল ব্যাপার।" তখন হুযূর একটি পাথরের উপর হাত মুবারক বুলিয়ে দিয়ে দো'আ করলেন, "হে আল্লাহ! তোমার বান্দা খুব পিপাসার্ত; আমাদের জন্য পানির ব্যবস্থা করে দাও।"

হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, তাৎক্ষণিকভাবে সেখানে হুযূরের আঙ্গুল মুবারক থেকে পানির ফোয়ারা প্রবাহিত হলো। পানিও ছিলো দুধের চেয়েও সাদা, মধুর চেয়ে মিষ্ট। হুযূর অঞ্জলী ভরে পানি নিয়ে পান করলেন। ওযূ করলেন। আর অমনি পাঁচজন ফিরিশতা হাযির হলেন। তাঁরা হলেন- বাতাসের ফিরিশতা, পানির ফিরিশতা, সূর্যের ফিরিশতা, হযরত জিব্রাঈল ও হযরত মীকাঈল।

সূর্যের ফিরিশতা আরয করলেন, "হুযূর, অনুমতি পেলে সূর্যের তাপ বৃদ্ধি করে তাদের মাথার মগজ বিগলিত করে বাইরে নিক্ষেপ করবো।" বাতাসের ফিরিশতা বললেন, "আদেশ পেলে তুফান চালিয়ে সমস্ত তায়েফবাসীকে খড়কুটার মতো উড়িয়ে নিয়ে যাবো।" পানির ফিরিশতা আরয করলো, "আমাকে জলোচ্ছ্বাসের অনুমতি দিন!" তারপর হযরত জিব্রাঈল ও মীকাঈল ভয়ঙ্কর আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করলেন। হুযূর-ই আকরাম হযরত জিব্রাঈলকে বললেন, "তুমি তো ইতোপূর্বে কখনো এমন আকৃতিতে আসো নি?" তিনি কেঁদে ফেললেন আর আরয করলেন, "হুযূর! শাস্তি প্রদানের সময় আমি এমনি আকৃতিতে এসে থাকি।" এখন আসমান ও যমীনের ফিরিশতাগণ অতিমাত্রায় রাগান্বিত। কালো-কুৎসিৎ হাবশী ক্রীতদাসটি আপনার সাথে চরম বেয়াদবী

করেছে এবং অমার্জনীয় অপরাধ করেছে।"

হুযূর জিব্রাঈলকে বললেন, "তুমি এখন তায়েফবাসীদের সাথে কিরূপ আচরণ করতে চাও!" জিব্রাঈল আরয করলেন, "আমার ডান পাখা মেরে তায়েফের ভু-খণ্ডকে এতো উপরে তুলে নিয়ে যাবো যে, তাদের কুকুরগুলোর আওয়াজ ও মোরগগুলোর আযান আসমানের ফিরিশতাগণ শুনতে পাবে। তায়েফ ভূ-খণ্ডকে আসমান পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে উল্টিয়ে যমীনের দিকে ছুঁড়ে মারবো।"

এটা শুনে হুযূর কাঁদতে লাগলেন। আর এরশাদ ফরমালেন, "জিব্রাঈল! আল্লাহ্ আমাকে 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' (সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত) করে প্রেরণ করেছেন; আযাব (শাস্তি) বানিয়ে প্রেরণ করেন নি। এখন থামো জিব্রাঈল!"

হুযূর যোহরের আযান বলার নির্দেশ দিলেন। আযান দোয়া হলো, তার পরক্ষণে হুযূর আপন শির মুবারক আসমানের দিকে তুলে আরয করলেন-

"হে আল্লাহ! হযরত আদম ও হযরত ইব্রাহীমের মর্যাদার দোহাই! তায়েফবাসীদেরকে ঈমানের মহামূল্যবান সম্পদ দান করো! তারা যা করেছে না জেনে করেছে।"

হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, আল্লাহরই শপথ! আমরা যোহরের নামায এমতাবস্থায় পড়েছি যে, তায়েফের লোকেরা কাতারগুলোতে আমাদের সাথে দণ্ডায়মান ছিলো। আমরা সবাই মিলে যোহরের নামায সম্পন্ন করেছি। আমরা সবাই হুযূরের পেছনে নামায পড়েছি। তায়েফবাসীরা হুযূরের গুণাবলী ও মু'জিযাদি প্রত্যক্ষ করলো। সুতরাং তারা হুযূর করীমের উপর ঈমান নিয়ে আসলো। সুবনাল্লাহ্ হুযূর তায়েফ থেকে মক্কায় খুশী মনে ফিরে আসলেন। আলহামদু লিল্লাহ্।

বিরল দাওয়াত

বর্ণিত আছে যে, একদিন হযরত ওসমান ইবনে আফ্ফান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে তাঁর ঘরে দাওয়াত করলেন। হুযূর-ই আকরামও দাওয়াত সদয় গ্রহণ করে সাহাবা-ই কেরামকে সাথে নিয়ে হযরত ওসমানের ঘরের দিকে তাশরিফ নিচ্ছিলেন। হযরত ওসমানও হুযূর-ই আকরামের সাথে ছিলেন। তবে তিনি হুযূরের কদম শরীফ (পদাঙ্ক মুবারক)গুলো গুন্ছিলেন। হুযূর এক পর্যায়ে থেমে গেলেন এবং এরশাদ করলেন, "ওসমান! আমার পদাঙ্কগুলো গুন্ছো কেন?" হযরত ওসমান আরয করলেন, "আমার মাতাপিতা আপনার কদম শরীফে উৎসর্গ! হে আল্লাহ্র রসূল! আজ আপনার সম্মানার্থে আপনারই প্রতিটি কদম শরীফ (পদাঙ্ক মুবারক)-এর পরিবর্তে একেকজন ক্রীতদাস আযাদ করবো।" সুতরাং হযরত ওসমানের ঘরে দাওয়াত খাওয়ার পর মেহমানগণ আপন আপন ঘরে চলে গেলেন।

হযরত আলী দাওয়াতে অংশগ্রহণের পর ঘরে ফিরে এলেন। কিন্তু আজ তিনি অত্যন্ত চিন্তিত-দুঃখিত ছিলেন। খাতূনে জান্নাত হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা, তাঁর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, "আজ আপনি যে খুব চিন্তিত! এর কারণ কি?" হযরত আলী বললেন, "হে আল্লাহর হাবীবের কন্যা! চিন্তিত এজন্য যে, আজ হযরত ওসমান সাহাবীগণ সহকারে হুযূর-ই আক্রামের শানদার আতিথ্য করেছেন। তিনি হুযূরের প্রতিটি কদম (পদাঙ্ক) শরীফের পরিবর্তে একটি করে গোলামও আযাদ করেছেন। আমাদের নিকটও যদি হযরত ওসমানের মত সম্পদ থাকতো, তবে আমরাও হুযূরকে দাওয়াত দিয়ে আতিথ্য করতাম। আর তেমনি করতাম যেমনটি হযরত ওসমান করেছেন।"

রসূল তনয়া হযরত ফাতিমা বললেন, "চিন্তা-ভাবনা ছাড়ুন, আপনিও গিয়ে হুযূরকে দাওয়াত দিয়ে আসুন, যেন হুযূর সাহাবা-ই কেরামকে সাথে নিয়ে তাশরিফ নিয়ে আসেন। আর আমরা হুযূর ও সাহাবা-ই কেরামের তেমনি আতিথ্য করবো, যেমনটি হযরত ওসমান করেছেন।"

হযরত আলী বললেন, "কিন্তু এটা কীভাবে হতে পারে, নবী তনয়া? খাদ্য ও অর্থ-সম্পদ পাবো কোথায়?" সাইয়্যেদা ফাতিমা বললেন, "হে আমার মাথার মুকুট! আপনি আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন! তাড়াতাড়ি যান, হুযূরকে দাওয়াত করে আসুন! তিনি মহামহিম আল্লাহর মাহবূব। তাঁর বরকতে সব কিছুর ব্যবস্থা হয়ে যাবে।"

হযরত আলী একথা শুনে খুশী হলেন আর হুযূর-ই আকরামের দরবারে গিয়ে

আরয করতে লাগলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কলিজার মুবারকের টুকরা (হযরত ফাতিমা) আপনার সমীপে সালাম আরয করেছে। সে আপনাকে ও আপনার সাহাবীদের তেমনি দাওয়াত করতে চায়, যেমন হযরত ওসমান করেছেন। অনুগ্রহ করে তাশরিফ আনুন এবং যা কিছুর আয়োজন হয়েছে তা গ্রহণ করে আমাদেরকে ধন্য করুন!" এটা শুনতেই হুযূর-ই আকরাম উঠে দাঁড়ালেন। উপস্থিত সাহাবীগণও দাঁড়ালেন। আর হযরত ফাতিমার ঘরের দিকে রওনা হলেন। হুযূর তাশরিফ আনলেন। হযরত ফাতিমা হুযূরকে ঘরের দরজায় স্বাগত জানালেন। হুযূর সাহাবীগণকে সাথে নিয়ে ঘরে বসে গেলেন। খাতূনে জান্নাতের ঘর মেহমান দ্বারা পূর্ণ হয়ে গেলো। এদিকে সাইয়্যেদাহ্ ফাতিহা আলাদা কামরার দরজা বন্ধ করে আল্লাহর দরবারে মুনাজাত আরম্ভ করলেন- "হে আমার রব! হে আমার মুনিব! তুমি তো আমার অবস্থা সম্পর্কে অবগত আছো। আমি তোমার মাহবূবকে আমার ঘরে দাওয়াত দিয়েছি এবং আমার ঘরে বসিয়েছি। তাও এজন্য যে, আমি তাঁদের তেমনি আতিথ্য করবো যেমনটি করেছেন হযরত ওসমান।

হে আল্লাহ! তোমার এ বান্দিনীর তো ওই সামর্থ্য নেই। আমি তোমার দরবারে তোমার দয়া ও অনুগ্রহ ভিক্ষা চাচ্ছি। তুমি আমার মান-ইজ্জত রক্ষা করো! হে আমার মুনিব! আমাকে তোমার মাহবূবের সামনে লজ্জিত করো না! আমি তোমার এক গুনাহ্গার বান্দিনী! মাহবূবের ওসিলায় তুমি আমার উপর দয়া করো!"

মুনাজাত সমাপ্ত করে হযরত ফাতিমা চুলোর উপর ডেক্সী চড়ালেন। আর কাঁদতে লাগলেন। আজ হযরত ফাতিমার এ কান্না আল্লাহর এত পছন্দ হলো যে, তিনি আপন কুদরতেই হযরত ফাতিমার ডেক্সীগুলো জান্নাতের সুস্বাদু খাবার দিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে ভর্তি করে দিলেন। সুবহানাল্লাহ!

তিনি তৎক্ষণাৎ খাদ্যভর্তি ডেকসী নিয়ে হুযূরের খিদমতে পেশ করলেন। সাহাবীদের সাথে খাবার গ্রহণ করলেন। সমস্ত সাহাবীও খুব তৃপ্ত হয়ে আহার গ্রহণ করলেন; কিন্তু ডেক্সী যেমন ছিলো তেমনি (খাদ্যভর্তি) রয়েই গেলো। তারপর হুযূর আপন সাহাবীদের উদ্দেশ্যে এরশাদ করলেন, "তোমরা কি জানো, এ খাবার কোত্থেকে এসেছে? জান্নাত থেকে আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য পাঠিয়েছেন।" সাহাবীগণ আল্লাহ্ তা'আলার হামদ ও সানা (প্রশংসাবাক্য) পাঠ করলেন এবং তাঁর নি'মাতগুলোর শোকরিয়া আদায় করলেন।

দাওয়াতের পর ঘরের দরজা বন্ধ করে হযরত ফাতিমা আবার কাঁদতে লাগলেন। তিনি এবার কেঁদে কেঁদে আরয করতে লাগলেন- "হে আমার মা'বূদ! তুমি জানো যে, আমার নিকট তত অর্থকড়ি নেই যা দিয়ে গোলাম কিনে আযাদ করবো, যেমন হযরত ওসমান করেছেন। তবে আমি তোমার দয়া ও অনুগ্রহের

আশা দৃঢ়ভাবে পোষণ করি। মুনিব! তুমি তোমার মাহবূবের প্রতিটি কদম (পদাঙ্ক) শরীফের বিনিময়ে উম্মতে মুহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)'র গুনাহ্গারদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দাও!"

হযরত সাইয়্যেদাহ্ ফাতিমা মুনাজাত শেষ করতেই হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালাম হাযির হয়ে হুযূর-ই আকরাম-এর দরবারে আরয করলেন-

"আপনার কলিজার টুক্রা (সাইয়্যেদা ফাতিমা) আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করে আপনার প্রতিটি কদম শরীফের পরিবর্তে একেকজন গুনাহ্গারকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করার ফরিয়াদ করেছেন। হে আল্লাহর রসূল! বরং আপনার প্রত্যেক কদম শরীফের পরিবর্তে এমন এক হাজার গুনাহ্গার পুরুষ ও এক হাজার গুনাহ্গার নারীকে আযাদ করে দেয়া হবে, যাদের জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেছে। আর এসবই হযরত ফাতিমার কারামতের বদৌলতেই হবে।"

হুজুর-ই আক্রাম সাহাবা-ই কেরামকে হযরত জিব্রাঈললের পয়গাম শুনিয়ে দিলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার হামদ ও সানা বর্ণনা করলেন। আর খুশী হয়ে সবাই আপন আপন ঘরে চলে গেলেন। [সূত্রঃ জামেউল মু'জিযাত]

শাজারাতু ইয়াক্বীন

বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা চারটি শাখা বিশিষ্ট একটি অতি সুন্দর বৃক্ষ সৃষ্টি করেছেন। সেটার নাম 'শাজারুল ইয়াক্বীন' (ইয়াক্বীনবৃক্ষ)। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ওই বৃক্ষের উপর 'নূর-ই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম' (হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নূর)-কে একটি 'তাঊস' (ময়ূর)-এর আকারে বসিয়ে দিলেন। তারপর ওই 'তাঊস' সেখানে সত্তর হাজার বছর আল্লাহ্ তা'আলার 'তাসবীহ্' (স্তুতিবাক্য) পাঠ বা বর্ণনা করতে থাকে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা 'আয়না-ই হায়া' (লজ্জা-দর্পণ) বানিয়ে তাঊসের সামনে রেখে দিলেন। তখন আয়নায় তাঊস আপন সৌন্দর্য ও লাবণ্য দেখে আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্যাতের দরবারে পাঁচটি সাজদাহ্ করলো, যেগুলোকে 'ফরয' সাব্যস্ত করা হয়েছে। এ কারণে আল্লাহ্ তা'আলা হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্সালাম-এর উম্মতের উপর দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্বত নামায ফরয করেছেন।

তারপর 'তাঊস' (অর্থাৎ নূর-ই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি যখন আল্লাহ্ তা'আলা রহমতের দৃষ্টিতে তাকালেন, তখন তিনি লজ্জার ঘামে সিক্ত হয়ে গেলেন। আর ওই ঘাম মুবারক থেকে মহান স্রষ্টা প্রধান প্রধান সৃষ্টিগুলো সৃষ্টি করেছেন-

আল্লাহ্ তা'আলা ওই নূরী শরীরের

* শির মুবারকের ঘাম শরীফ নিয়ে সমস্ত ফিরিশ্তা সৃষ্টি করেছেন।

* চেহারা-ই আন্ওয়ারের ঘাম মুবারক থেকে আরশ, কুরসী, লওহ, কলম, সূর্য, চন্দ্র, নূরের পর্দাগুলো, তারা-নক্ষত্রগুলো ও বিশ্বের আশ্চর্যজনক জিনিসগুলো সৃষ্টি করেছেন।
* তাঁর বিদ্বেষমুক্ত বক্ষ শরীফের ঘাম মুবারক থেকে নবীগণ, রসূলকুল, আলিম সমাজ, কামিল ব্যক্তিবর্গ, শহীদান ও নেক্কার বুযুর্গদের পবিত্র রূহ বা আত্মাগুলোকে সৃষ্টি করেছেন।
* পৃষ্ঠ মুবারকের ঘাম শরীফ থেকে বায়তুল মা'মূর, কা'বা-ই মুআয্যমাহ্, বায়তুল মুক্বাদ্দাস এবং গোটা সৃষ্টি-জগতে আল্লাহকে সাজদা করার স্থানগুলোকে সৃষ্টি করেছেন।
* আব্রু শরীফের পবিত্র ঘাম থেকে মু'মিন মুসলিম নর-নারীদের সৃষ্টি করেছেন।
* আর দু' ক্বদম শরীফের ঘাম নিয়ে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ এবং খনিজ ও আশ্চর্যজনক আরো অনেক কিছু সৃষ্টি করেছেন।

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করলেন, "হে আমার মাহবুব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নূর! চতুর্দিকে তাকাও!" ওই নূর চতুর্দিকে তাকালো। সর্বত্র নূরেরই ছড়াছড়ি দৃষ্টিগোচর হলো। এ 'জল্ওয়া' বা নূরের ঝলকগুলো ছিলো- হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব, হযরত ফারূক্ব-ই আ'যম, হযরত ওসমান গণী ও হযরত আলী হায়দার-ই কার্‌রার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুম আজমা'ঈন-এরই নূররাশি। তাঁর (হুযূর-ই আকরাম) নূর এমতাবস্থায় সত্তর হাজার বছর পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার 'তাসবীহ্' পড়তে থাকে।

আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত নবী-রসূলের রূহগুলোকে যখন হুযূর-ই আক্রাম হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর 'নূর' থেকে সৃষ্টি ক্রলেন, তখন সমস্ত নবী-রসূলের রূহগুলো সমস্বরে বলে ওঠলো- لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্)। অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বূদ (উপাস্য) নেই, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আল্লাহর রসূল।

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা 'আক্বীক্ব-ই আহমার' (লাল বর্ণের আক্বীক্ব) দিয়ে একটি 'ফানূস' তৈরি করলেন এবং হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নূরকে তাঁর পার্থিব আকৃতিতে রূপান্তরিত করে ওই ফানূসের মধ্যে স্থাপন করলেন। ফানূসের মধ্যে তিনি তেমনভাবে দণ্ডায়মান হলেন, যেমন নামাযে দাঁড়ানো হয়। তারপর সমস্ত রূহ ওই ফানূসের চতুর্দিকে (তাওয়াফ) প্রদক্ষিণ করতে লাগলো। রূহগুলোর এমন তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) দীর্ঘ এক হাজার বছর যাবৎ চলতে থাকে।

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা রূহগুলোকে নির্দেশ দিলেন- 'আমার মাহবূবের দিকে তাকাও!' রূহগুলো নির্দেশ পালন করলো। রূহগুলো থেকে যে ব্যক্তির রূহ হুযূরে

করীমের-

* শির মুবারক দেখেছেন, তিনি দুনিয়ায় বাদশাহ্ ও শাসক হয়েছেন।
* আব্রু মুবারক দেখেছেন, তিনি ন্যায় বিচারক শাসক হয়েছেন।
* চক্ষু যুগল শরীফ দেখেছেন, তিনি প্রশস্ত দৃষ্টি ও প্রশস্ত মনের অধিকারী হয়েছেন।
* কপাল শরীফের দিকে দেখেছেন, তিনি নকশা প্রস্তুতকারক হয়েছেন।
* কান মুবারক দেখেছেন, তিনি সৃষ্টির নিকট গ্রহণযোগ্য হয়েছেন।
* বিদ্বেষমুক্ত বক্ষ মুবারক দেখেছেন, তিনি জ্ঞানী ও উপকার সাধনকারী হয়েছেন।
* নাক মুবারক দেখেছেন, তিনি চিকিৎসক ও আতর প্রস্তুতকারক বা সরবরাহকারী হয়েছেন।
* ওষ্ঠ মুবারক দেখেছেন, তিনি উজির (মন্ত্রী) হয়েছেন।
* মুখ মুবারক দেখেছেন, তিনি রোযা পালনকারী হয়েছেন।
* দাঁত মুবারক দেখেছেন, তিনি সুন্দর ও সুশ্রী হয়েছেন।
* রসনা মুবারক দেখেছেন, তিনি বাদশাহ্র দূত (রাষ্ট্রদূত) হয়েছেন।
* কণ্ঠনালী শরীফ দেখেছেন, তিনি ওয়া-ইয, উপদেশদাতা ও মুআয্যিন হয়েছেন।
* দাড়ি মুবারক দেখেছেন, তিনি আল্লাহর পথে জিহাদকারী (ধর্মীয় যোদ্ধা) হয়েছেন।
* ঘাড় মুবারক দেখেছেন, তিনি ব্যবসায়ী হয়েছেন।
* হাত মুবারক দেখেছেন, তিনি দানশীল হয়েছেন।
* আঙ্গুল শরীফগুলো দেখেছেন, তিনি সুন্দর হস্তাক্ষর বিশিষ্ট (উত্তম লেখক) হয়েছেন।
* উদর মুবারক দেখেছেন, তিনি ধৈর্যশীল ও অল্পে তুষ্ট হয়েছেন।
* স্কন্ধযুগল শরীফ দেখেছেন, তিনি ইবাদতপরায়ণ ও দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত বুযুর্গ হয়েছেন।
* পদযুগল মুবারক দেখেছেন, তিনি আল্লাহর পথে হিজরতকারী হয়েছেন।
* নখ শরীফ দেখেছেন, তিনি বিচারপতি, মুফতি কিংবা জজ হয়েছেন।

কিন্তু যেসব রূহ হুযূর-ই আক্রামকে মোটেই দেখেনি, সে ইহুদি, খ্রিষ্টান, অগ্নিপূজারী কিংবা ফির'আউন হয়েছে। আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞাতা।

[সূত্র: 'জামেউদ্ দুররী' কিতাবে এমনই বর্ণিত হয়েছে। 'জামে'উল মু'জিযাত' থেকে উদ্ধৃত]

যেই সৌভাগ্যবানের কোলে আকাশের চাঁদ ও সূর্য নেমে এসেছে!

সাইয়্যেদুনা সিদ্দীক্ব-ই আক্বার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অন্ধকার যুগে খুব

বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। ব্যবসার উদ্দেশ্যে তিনি সিরিয়া গেলে সেখানে তাঁর সাথে এমনি এক ঘটনা ঘটলো, যা তাঁর ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়েছিলো। তিনি সেখানে এক আজব স্বপ্ন দেখলেন। স্বপ্নটি হলো- 'চাঁদ ও সূর্য তাঁর কোলে নেমে এসেছে। আর তিনিও ওই দু'টোকে চাদরে জড়িয়ে নিয়ে আপন বুকের সাথে লাগাচ্ছিলেন।' জাগ্রত হয়ে তিনি এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানার জন্য পার্শ্ববর্তী এক ধর্ম যাজকের (রাহিব) নিকট গেলেন। তিনি রাহিবকে স্বপ্নের পূর্ণ বর্ণনা দিলেন। তারপর আরম্ভ হলো কথোপকথন-

: আপনার নাম?

: আবূ বকর।

: আপনি কোন্ শহরের বাসিন্দা?

: মক্কার অধিবাসী।

: কোন গোত্রের?

: বনূ হাশিমের।

: কি কাজ করেন?

: ব্যবসা-বাণিজ্য।

এসব কথা শুনে ধর্মযাজক (রাহিব) বললেন, ''শেষ যামানায় এমন এক মহান ব্যক্তি পয়দা হবেন, যাঁর নাম শরীফ 'মুহাম্মদ'। আর উপাধি হবে 'আল-আমীন' (মহা বিশ্বস্ত)। সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। তিনিই শেষ যামানার নবী। তিনিও বনূ হাশিম গোত্রের হবেন। তিনি সৃষ্টি না হলে কিছুই সৃষ্টি হতো না। তিনি পূর্বাপর সবার সরদার। (সাইয়্যেদুল আউয়ালীন ওয়াল আ-খিরীন।)''

রাহিব হুযূর-ই আক্রামের এভাবে প্রশংসা করতে করতে এক পর্যায়ে সিদ্দীক্ব-ই আকবরকে বললেন, ''আপনি ধন্য। আপনি সর্বপ্রথম তাঁর উপর ঈমান এনে তাঁর উজির হবেন। তিনি যখন দুনিয়া থেকে অন্তরাল গ্রহণ করবেন, তখন আপনি 'মুসলমানদের খলীফা' হবেন। এটাই হচ্ছে আপনার স্বপ্নের ব্যাখ্যা।''

পরিশেষে, ওই রাহিব আরেক আজব কথা বললেন। তিনি বললেন, ''আমি তাওরীত, ইনজীল ও যাবূরে তাঁর প্রশংসাদি পড়েছি; আর তুমিও শোনো, আমি তাঁর উপর ঈমানও এনেছি; কিন্তু খ্রিষ্টানদের ভয়ে আমি আমার ঈমানকে প্রকাশ করিনি।''

রাহিবের কথা শুনে সিদ্দীক্ব-ই আকবরের হৃদয় গলে গেলো। হুযূর-ই আকরামের সাক্ষাৎ লাভের জন্য তিনি তখন থেকেই ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। তিনি মক্কায় ফিরে এসেই হুযূর-ই আকরামের মহান দরবারে হাযির হয়ে গেলেন। হুযূর-ই আকরামের চাঁদ ও সূর্য অপেক্ষাও সুন্দর আলোকোজ্জ্বল চেহারা-ই আক্বদাস দেখে মনের অনাবিল শান্তি উপভোগ করলেন। তখনকার দিনে হুযূর দ্বীন-ইসলামের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দিয়েই যাচ্ছিলেন। হুযূর তখন হযরত

সিদ্দীক্ব-ই আকবারের উদ্দেশ্যে এরশাদ করলেন-
"তুমি প্রতিদিন আমার নিকট এসে থাকো কিন্তু ইসলাম কেন গ্রহণ করছো না?" সিদ্দীক্বে আকবর আরয করলেন, "যদি আপনি আল্লাহর নবী হন তবে কোন মু'জিযা দেখান।"
সিদ্দীক্ব-ই আকবরের একথা শুনে হুযূর মুচ্‌কি হাসলেন আর বললেন, "তুমি সিরিয়ায় যেই স্বপ্ন দেখেছো আর রাহিব তোমাকে তোমার স্বপ্নের যেই ব্যাখ্যা দিয়েছে, সেটা কি তোমার ইসলাম গ্রহণের জন্য যথেষ্ট নয়?"
একথা শুনে হযরত সিদ্দীক্ব-ই আকবর উচ্চস্বরে বলে উঠলেন, "আপনি সত্য বলেছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বূদ (উপাস্য) নেই, হে মুহাম্মদ মোস্তফা (আলায়কাস্ সালাওয়াতু ওয়াস্ সালাম)! আপনি আল্লাহর সত্য রসূল।" একথা বলে তিনি ইসলামের সুশীতল ছায়ায় প্রবেশ করে উম্মতের মধ্যে সর্বোচ্চ আসনে আসীন হন। তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী। নবীগণের পর তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)

[সূত্রঃ 'জামে'উল মু'জিযাত' কৃত. শায়খ মুহাম্মদ রাহাভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি]

হুযূর-ই আকরামের আহবানে সাড়া দিয়ে খিদমত আন্‌জাম দিলে নামায ভঙ্গ হয় না

দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের দরবারের নিয়ম-কানুন, আদব-কায়দা তাঁরা নিজেরাই তৈরি করেন ও প্রশিক্ষণ দেন; কিন্তু হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মহান দরবারে থাকার নিয়ম-কানুন খোদ্ আল্লাহ্ তা'আলা শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন- হে মুসলমানরা! এ মহান দরবারের আদব হচ্ছে আমার মাহবূব কখনো তোমাদেরকে ডাকলে তোমরা যে কোন অবস্থায় থাকোনা কেন-নামাযে, কোন ওযীফা আদায়ে কিংবা অন্য কোন কাজে, সব ছেড়ে তাৎক্ষণিকভাবে নিকট হাযির হয়ে যাও দেরী করবে না। এখন এ প্রসঙ্গে সাহাবা-ই কেরামের আমল দেখুন-
এক. প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত উবাই ইবনে কা'ব নবী-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দরবারে উপস্থিত ছিলেন। তিনি নামায পড়ছিলেন। ইত্যবসরে হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ডাক দিলেন। তিনি (হযরত উবাই) তাড়াতাড়ি নামায সমাপ্ত করে হাযির হলেন। হুযূর এরশাদ করলেন, "তুমি হাযির হতে দেরী করলে কেন?" তিনি আরয করলেন, "এয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি নামাযে ছিলাম।" হুযূর এরশাদ ফরমান, তুমি কি ক্বোরআন পাকের এ আয়াত পড়োনি-

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ

তরজমাঃ হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আহ্বানে হাযির হও! যখন রসূল তোমাদেরকে ওই বস্তুর জন্য আহ্বান করেন, যা তোমাদেরকে জীবন দান করবে। [আয়াত নম্বর ২৪, সূরা আন্‌ফাল]
এ থেকে বুঝা গেলো যে, নামাযীর উপর অপরিহার্য নামায ছেড়ে দিয়ে হুযূর-ই আক্‌রামের আহবানে সাড়া দিয়ে তাঁর খিদমতে হাযির হয়ে যাওয়া। ফক্বীহ্‌গণ বলেছেন, হুযূর-ই আক্‌রামের আহ্বান শুনামাত্র নামাযরত অবস্থায় থাকলে নামায ছেড়ে হুযূরের খিদমতে হাযির হয়ে যাবেন, তারপর হুযূর-ই আক্‌রামের নির্দেশ পালন করে অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করে দেবেন। এতে তাঁর নামায ভঙ্গ হয়নি, বরং তিনি নামাযে রত ছিলেন বলে গণ্য হবেন।

[ক্বাস্তলানী, শরহে বোখারী, কিতাবুত্ তাফসীর, সূরা হিজর]

এখানে লক্ষণীয় যে, সম্মানিত ফক্বীহগণের ওই অভিমত বিশুদ্ধ। কারণ, যদি নামাযী ওই আহ্বানে সাড়া দিতে গিয়ে কথাও বলে থাকেন, তাহলে কার সাথে বলেছেন? তাঁরই সাথে বলেছেন, যাঁকে নামাযে সালাম দেওয়া ওয়াজিব। 'আস্‌সালা-মু আলায়কা আইয়্যুহান্নাবিয়্যু'! হে নবী! আপনাকে সালাম। অথচ নামাযরত অবস্থায় অন্য কাউকে সালাম দিলে নামায ভঙ্গ হয়ে যায়। এ মুসল্লী নামায ছেড়ে নিজ বক্ষকে কা'বা থেকে ফিরিয়ে কার দিকে করলেন? তিনি তাঁরই দিকে ফিরেছেন, যিনি কা'বারও কা'বা। আ'লা হযরত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন-

اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں کعبہ پہ نثار
شمع اک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا - حدائق بخشش

অর্থাৎ- অন্য লোকেরা এমন পতঙ্গের মতো, যা কা'বারূপী প্রদীপের উপর প্রাণোৎসর্গ করে; সেটার চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করে কিন্তু আপনি এমন প্রদীপ, কা'বা শরীফ পতঙ্গের স্থলাভিষিক্ত হয়ে আপনার চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করে।

[হাদাইক্বে বখশিশ]

যদি ওই নামাযী হেঁটে গিয়ে থাকেন, তবে কোন্ দিকে গেছেন? তিনি হুযূর মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে গেছেন, যা ইবাদতই। এমতাবস্থায় নামাযও ভঙ্গ হবে কেন? যদি নামাযে কারো ওযূ ভঙ্গ হয়ে যায়, তবে তার জন্য জায়েয পানির দিকে যাওয়া, পানি পর্যন্ত হাঁটা ও কা'বার দিক থেকে বক্ষ অন্যদিকে ফেরানো। 'আমলে কাসীর' (বেশী পরিমাণ অন্য কাজ) সম্পন্ন হয়ে গেলেও সে নামাযের মধ্যেই থাকে। তার নামায ভঙ্গ হয় না। সুতরাং আলোচ্য অবস্থায়, আল্লাহর রহমতের সমুদ্ররূপী নবী-ই আক্‌রামের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর দিকে দৌঁড়ে গিয়ে, তাঁর খিদমত আন্‌জাম দিলে নামায কেন ভাঙ্গবে? তাই ফক্বীহ্‌গণ বলেছেন, এমতাবস্থায় তার নামায মোটেই

ভঙ্গ হবে না। আর আহ্বান শোনার সাথে সাথে নবী-ই আক্রামের আনুগত্য করা যে কোন অবস্থাতেই ওয়াজিব যা অপরিহার্য। অন্যান্য বিষয়েও মু'মিন, মুসলমান, এমনকি অমুসলিমদের উপরও হুযূর-ই আক্রামের আনুগত্য করা ওয়াজিব-এ বিষয়টিই স্পষ্ট হয়ে যায়।

দুই. হযরত হানযালাহ্, একজন প্রখ্যাত সাহাবী। তিনি 'গাসীলুল মালা-ইকাহ্' নামে প্রসিদ্ধ। তিনি বিবাহ্ করার পর প্রথম রাতে স্ত্রীর নিকট গিয়েছিলেন। কিন্তু তখনও গোসল করেননি। এদিকে রসূলে আকরামের দিক থেকে যুদ্ধের আহ্বান শুনতে পেলেন। তিনি গোসলের জন্য বিলম্ব না করেই তাৎক্ষণিকভাবে যুদ্ধে চলে গেলেন এবং শহীদ হলেন। অতঃপর সমস্ত শহীদের লাশগুলো থেকে হযরত হানযালার লাশ বের করা হলো। তখন দেখা গেলো তাঁর শবদেহ থেকে গোসলের পানি টপকে পড়ছে। হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, ''তাঁকে ফিরিশ্তাগণ গোসল দিয়েছে।'' এ কারণে, তাঁকে 'গাসীলুল মালা-ইকাহ্' বলা হয়। অর্থাৎ তিনি ওই মহান শহীদ, যাঁকে খোদ্ ফিরিশ্তাগণ গোসল দিয়েছেন।

তিন. এক সাহাবী আপন বিবির সাথে সহবাসরত ছিলেন। ওদিকে তাঁর ঘরের দরজা হুযূর-ই আক্রাম তাশরীফ আনলেন এবং তাকে ডাক দিলেন। তখনও বীর্যপাত হয়নি। এমতাবস্থায় তিনি স্ত্রীর নিকট থেকে আলাদা হয়ে কাল বিলম্ব না করেই হুযূর-ই আক্রামের সামনে হাযির হয়ে গেলেন। অদৃশ্যের সংবাদদাতা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন- **لَعَلَّنَا اَعْجَلْنَاکَ** (হয়তো আমরা তোমাকে তাড়াহুড়ায় ফেলে দিয়েছি।) তিনিও জবাবে সত্য বিষয়টিই আরয করলেন- ''জ্বী-হ্যাঁ।'' হুযূর এরশাদ করলেন- ''যাও, গোসল করে এসো।'' [ত্বাহাভী শরীফ: গোসল সম্পর্কিত অধ্যায়]

আল্লাহর বিধানের কার্যত শিক্ষাদাতা প্রিয়নবীর এ ঘটনা থেকে একটি অতি জরুরি মাস্আলার শিক্ষা দেওয়া হলো। তা হচ্ছে- যে ব্যক্তি আপন স্ত্রীর সাথে সহবাস করে এবং বীর্যপাতের পূর্বে আলাদা হয়ে যায়, তার উপরও গোসল ওয়াজিব হয়। ফক্বীহ্গণ এ মাসআলা এ হাদীস শরীফ থেকে প্রমাণ করেছেন।

চার. শুধু মানুষ কেন? আল্লাহর অন্যান্য সৃষ্টিও এমনকি জড়বস্তুগুলো হুযূর-ই আক্রামের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে কাল-বিলম্ব না করে। কবি কয়েকটা উদাহরণ তাঁর কবিতায় উল্লেখ করেছেন-

ارشاد ہوا' سورج لوٹا-پاپا جو اشارہ چاند چرا
بادل رم جھم رم جھم برسا-جب حکم حبیب خدا پایا

অর্থাৎ ১. আল্লাহ্ হাবীবের নির্দেশ মুবারক পাওয়া মাত্র ডুবন্ত সূর্য পুনরায় ফিরে এসেছে। ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র আকাশের চাঁদ দ্বি-খণ্ডিত হয়ে গেছে।

২. আকাশের মেঘ এসে মুষলধারে বর্ষণ করেছে- যখনই আল্লাহর হাবীবের নির্দেশ পেয়েছে।

মোটকথা, সবাই হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য করেছে, তাঁর নির্দেশ তাৎক্ষণিকভাবে পালন করেছে। (মিশকাত শরীফ: বাবুল মু'জিযাত দ্রষ্টব্য) এমনকি গাছও হুযূর-ই আক্রামের ডাকে সাড়া দিয়ে হাজির হয়ে গিয়েছিলো।

সুতরাং লক্ষ্যণীয় যে, হুযূর-ই আক্রামের আহ্বান হুযূর-ই আক্রামের নূরানী জীবদ্দশায় প্রত্যক্ষভাবে ছিলো, যার আনুগত্য সাহাবা-ই কেরাম ও অন্যান্য সৃষ্টি এভাবে করেছেন। এর পরবর্তীতে হুযূর-ই আক্রামের আহ্বানগুলো, আদেশ ও নিষেধগুলো ক্বিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ রয়েছে- বিভিন্ন মাধ্যম সহকারে। সুতরাং আল্লাহর হাবীবের ডাকে সাড়া দেওয়া, তিনি আমাদেরকে যার নির্দেশ দিয়েছেন ও যা থেকে নিষেধ করেছেন সবই যথাযথভাবে পালন করা একান্ত জরুরী। তাতেই উভয় জগতের সাফল্য অনিবার্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে জীবন দান করেন। কারণ, তিনি মৃত হৃদয়ে প্রাণের সঞ্চার করেন, ধ্যান-ধারণাকে সত্যিকার অর্থে জাগ্রত করেন। তা হবেও না কেন? নিম্নলিখিত কয়েকটা উপমা ও ঘটনা থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায়-

এক. হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালাম তাঁর ঘোটকীর পিঠে আরোহণ করে বাহরে কুলযমে ফিরআউনের নিমজ্জিত হবার ঘটনায় উপস্থিত হয়েছিলেন। হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর জন্য সমুদ্রে শুষ্ক রাস্তা হয়ে গিয়েছিলো। হযরত জিব্রাঈল ফিরআউনকে সমুদ্রে ডুবানোর জন্য ওই রাস্তা দিয়ে ফিরআউনের আগে আগে অগ্রসর হয়েছিলেন। তখন তাঁর ঘোটকীর পা যেখানেই পড়েছিলো সেখানে ঘাস জন্মে গিয়েছিলো। বনী ইস্রাঈলের জনৈক লোক সামেরী ওখান থেকে নিয়ে আসা মাটি জড় পদার্থ স্বর্ণ দ্বারা তৈরি গরু বাছুরের মুখে স্থাপন করা মাত্রই সেটার মধ্যে প্রাণ সৃষ্টি হয়েছিলে, যা দেখিয়ে সে লোকজনকে পথভ্রষ্ট করেছিলো। কিন্তু শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে- হযরত জিব্রাঈলের শরীর লেগেছিলো ঘোটকীর সাথে, ঘোটকীর পা লেগেছিলো মাটিতে, এ মাটি লেগেছিলো প্রাণহীন বাছুরের মধ্যে। ফলে সেটা জীবিত হয়ে গিয়েছিলো। এ কারণে হযরত জিব্রাঈলের নাম 'রূহুল আমীন'। কারণ, তাঁর স্পর্শেও রূহ পাওয়া যায়। বস্তুত: আমাদের আক্বা হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কৃপাদৃষ্টিতে হাজারো জিব্রাঈলের শক্তি সৃষ্টি হয়। সুতরাং তাঁর ইঙ্গিতে মৃত জীবিত হবে না কেন? মসনভী শরীফে মাওলানা রূমী বলেন-

اے ہزاراں جبرئیل اندر بشر - بہر حق سوئے غریباں ایک نظر

অর্থাৎ ওহে শোনো! 'বশর'-এর পর্দা পরিহিত নূরের নবীর মধ্যে হাজারো জিব্রাঈলের ক্ষমতা রয়েছে। সুতরাং আল্লাহর ওয়াস্তে এ গরীবদের প্রতিও কৃপার একটি মাত্র দৃষ্টি দিন!

দুই. 'মাদারিজুন্নবূয়ত'-এও এমন বহু ঘটনা লিপিবদ্ধ হয়েছে। সেগুলোতে বর্ণিত হয়েছে যে, হুযূর-ই আক্রাম মৃতকেও, আল্লাহর নির্দেশে জীবিত করেছেন। হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর ঘরে হুযূর-ই আক্রামের দাওয়াত ছিলো। হযরত জাবির ছাগল জবাই করেছিলেন। এটা দেখে তাঁর দু'পুত্রের মধ্যে একজন অপরজনকে যবেহ করে ফেলেছিলো। যবেহকারী ছেলেটি ভয়ে ঘরের ছাদের উপর পালাতে গিয়ে সেও পা ফস্কে নিচে পড়ে মারা গিয়েছিলো।

হযরত জাবিরের স্ত্রী ছেলে দু'টির লাশ গোপন করে রেখেছিলেন যেন হুযূর-ই আক্রামের দাওয়াতে কোন ব্যাঘাত না হয়। যখন হুযূর-ই আক্রাম তাশরীফ এনে হযরত জাবিরকে তাঁর পুত্র দু'টিকেও সাথে আহারের জন্য ডাকতে বললেন, তখন তিনি নিরুপায় হয়ে ওই মর্মান্তিক ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন। তখন হুযূর-ই আক্রাম দো'আ করলেন এবং হযরত জাবিরের ছেলে দু'টি জীবিত হয়ে হুযূর-ই আক্রামের সাথে আহার করেছিলো।

তিন. হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর ঘরে এক দাওয়াতে দস্তরখানায় হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হাত মুবারক মুছেছিলেন। এরপর থেকে যখনই ওই দস্তরখানা ময়লামুক্ত হতো, তখন সেটাকে তাঁরা জ্বলন্ত চুলোয় ফেলে দিতেন। তখন সেটা আগুনে জ্বলতো না, বরং ময়লাগুলো জ্বলে গিয়ে দস্তরখানাটা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যেতো। [মসনভী শরীফ ইত্যাদি]

চার. এক জায়গায় দাওয়াতে হুনযূর আলায়হিস্ সালাম তাশরীফ নিয়ে গেলেন। ছাগল যবাই করা হলো। হুযূর-ই আন্ওয়ার এরশাদ করলেন, তোমরা গোশ্তটুকু খাও, কিন্তু হাড়গুলো ভাঙ্গবে না। আহারের পর হাঁড়গুলো একত্রিত করে হুযূর দো'আ করলেন। তখন ছাগলটা পুনরায় জীবিত হয়ে গিয়েছিলো। [মাদারিজ, মু'জিযাতের বর্ণনা সম্বলিত পরিচ্ছেদ]

মোটকথা, আমাদের আক্বা ও মাওলা হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রাণী, মানুষ, পাথর ও কাঠকেও প্রাণ দান করেছেন। কঙ্করগুলোকে প্রাণ দিয়ে কলেমা পড়িয়েছেন। শুষ্ক খেজুরগাছ হুযূর-ই আক্রামের বিচ্ছেদে কান্না করেছে। হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম মৃত মানুষকে জীবিত করেছেন, আর আমাদের নবী, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু

তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রাণহীন জড় পদার্থগুলোর মধ্যেও প্রাণ দান করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন- **لِمَا يُحْيِيْكُمْ** [যাতে তিনি তোমাদেরকে জীবিত করেন। ৮:২৪]

হযরত সাবিত ইবনে ক্বায়স ইবনে শাম্মাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উঁচু আওয়াজই শুনতেন! সুতরাং...

রসূলে পাকের দরবার। এখানে কাউকে এগিয়ে যেতে দেওয়া যাবে না। এ মহান দরবারের প্রতি আদব প্রদর্শন করা অপরিহার্য। হযরত সাবিত ইবনে ক্বায়স রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হলেন এক সাহাবী। তিনি উঁচু আওয়াজই শুনতে পেতেন। যারা উঁচু আওয়াজই শুনে, তারা কথাও বলে উচ্চস্বরে। এটা তাদের অভ্যাস। সুতরাং হযরত ক্বায়সের কণ্ঠস্বরও হুযূর-ই আক্রামের দরবারে উঁচু হয়ে যেতো। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এটাও পছন্দনীয় ছিলো না।

হযরত ক্বায়স তো বাধ্য ছিলেন, তাঁর ওযর ছিলো- তিনি নিম্নস্বর শুনতেন না। কিন্তু এ দরবারে পাকের প্রতি আদবের কানুন নাযিল হলো-

يَاۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلاَ تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُوْنَ

তরজমা: হে ঈমানদারগণ! নবীর আওয়াজের উপর নিজেদের আওয়াজকে উঁচু করো না। তাঁর সামনে উচুস্বরে কথা বলো না, যেভাবে তোমরা একে অপরের সাথে উঁচুস্বরে কথা বলে থাকো, (তাঁকে উচু স্বরে অন্য লোকের মতো ডাকোনা) এতে তোমাদের আমলগুলো বরবাদ হয়ে যাবে, অথচ তোমরা বুঝতেই পারবে না।

দেখুন, কণ্ঠস্বর তো স্বভাবজাত হয়। কারো কণ্ঠস্বর উঁচু হয়, কারো হয়ে নিচু। কিন্তু এ আয়াতে এ স্বভাবজাত জিনিষকেও নিয়ন্ত্রণে রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে- 'এ মহান দরবারে নিজেদের আওয়াজকে নিচু রাখো! তাঁকে তোমাদের মধ্যেকার অন্য কারো মতো ডাকো না।' কেন? এজন্য যে, এমনটি করলে কখনো তোমাদের আমলগুলো বরবাদ হয়ে যায় কিনা। কারণ এটা এ মহান দরবারের আদব বা নিয়মের পরিপন্থী। ওযর থাকা সত্ত্বেও হযরত ক্বায়সকে এখানে আদবের কানুন ভঙ্গ করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। কারণ, তখন কেউ উঁচু আওয়াজে কথা বলে ফেললে সে বলবে -এটা হযরত সাবিত ইবনে ক্বায়স, সাহাবী-ই রসূলের সুন্নাত। সুতরাং উক্ত কানুন সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। কারো জন্য এর অনুমতি নেই।

হযরত ক্বায়স এ কানুন সম্পর্কে অবগত হলেন। সুতরাং তিনি এরপর রসূলে পাকের পবিত্র দরবারে আসাই ছেড়ে দিলেন। হযরত সাবিত ইবনে ক্বায়স,

সাহাবী-ই রসূলের নিকট দীদার-ই রসূল অপেক্ষা বড় নি'মাত আর কি ছিলো? তবুও তিনি পবিত্র দরবারে আসা ছেড়ে দিলেন। একদিন রসূলে পাক এরশাদ করলেন, 'আজ কয়েকদিন যাবৎ ক্বায়স আসছে না!' তখন কয়েকজন সাহাবী হযরত ক্বায়সের নিকট গেলেন। আর বললেন, "হুযূর-ই আক্রাম আপনাকে স্মরণ করেছেন।" তিনি কান্না করতে করতে বললেন, "আমি তো জাহান্নামী হয়ে গেছি। আমার প্রসঙ্গে আয়াত নাযিল হয়েছে। তাঁরা এসে হযরত সাবিত ইবনে ক্বায়সের একথা হুযূর-ই আক্রামকে জানালেন। তখন হুযূর-ই আক্রাম বললেন, "না, জান্নাতী।" অর্থাৎ মহান রব তাঁর ত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ্!

এরপর থেকে হযরত সিদ্দিক্ব-ই আক্বার ও হযরত ওমর ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমাকে দেখা গেলো- তাঁরা অতি নিম্নস্বরে কথা বলতে আরম্ভ করলেন। কিছু সংখ্যক সাহাবী তো নিজেদের মুখে পাথর পুরে দিয়ে কথা বলতেন; যাতে তাঁদের কণ্ঠস্বর উঁচু না হয়। তা কেন করতেন? তা এ জন্য করতেন যে, যদি রসূলে পাকের দরবারে কখনো কণ্ঠস্বর উঁচু হয়ে যায়, তাহলে গোটা জীবনের আমলগুলো এ একটি মাত্র ভুলের কারণে বরবাদ হয়ে যাবার আশংকা রয়েছে।

কোন্ ধরনের লোকদের আমল বরবাদ হয়ে যাবে?

এটা বড়ই বিপজ্জনক কথা হচ্ছে যে, 'আমলসমূহ বরবাদ হয়ে যাবে, অথচ সেটার খবরও হবে না।' এটা মহাশাস্তি। এ বিষয়টা এমনি যে, মনে করুন একজন লোকের ঘরে অনেক ধনভাণ্ডার সংরক্ষিত আছে; ওইগুলোতে প্রচূর ধন-সম্পদ, মণি-মুক্তা ও অলংকার জমা আছে। কিন্তু ওই ভাণ্ডার বা সিন্দুকগুলো থেকে ওইসব সম্পদ চুরি হয়ে গেলো, কেউ ধনরাশি বের করে নিয়ে গেলো, অথচ মালিকের তা জানাও নেই। সে বুঝতেই পারে নি যে, তার ধনভাণ্ডার শূন্য হয়ে গেছে; বরং তার ধারণা হচ্ছে- সে প্রচুর সম্পদের মালিক। কারণ, সে তো এ ধারণায় আছে যে, তার সিন্দুকগুলোতে ওই ধনরাশি জমা রয়েছে। কিন্তু যখন প্রয়োজন হবে, তখন ওই সিন্দুকগুলো খুললে দেখতে পাবে যে, ওইগুলোতে কিছুই নেই। তখন তো তার চেয়ে বড় দরিদ্র ও রিক্ত হস্ত আর কেউ থাকবে না! আল্লাহ্ রক্ষা করুন!

মহান রবও সতর্ক করে দিয়েছেন- 'হে রসূলের শানে বেয়াদবী প্রদর্শনকারীরা! শোন, এমনটি নয় যে, আমি তোমাদেরকে সৎ কার্যাদির সামর্থ্য দেবো না, বরং আমি তোমাদেরকে নামায পড়ার, রোযা রাখার, হজ্ব করার ও যাকাত আদায় করার সুযোগ দেবো, তোমাদেরকে আমলের ভাণ্ডারগুলো ভর্তি করার সুযোগ দেবো, কিন্তু তোমরা যদি আমার নবীর শানে বেয়াদবী করতে থাকো, তা হলে

তোমাদের আমলের ভাণ্ডারও শূন্য করতে থাকবো; অথচ তোমরা বুঝতেও পারবে না যে, তোমাদের আমলনামা থেকে তোমাদের সঞ্চিত আমলগুলো বরবাদ ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। না'ঊযুবিল্লাহি মিন যালিকা।

এমনটিও নয় যে, তোমরা কাজ করবে না, অথচ শাস্তি পাবে, এমনও নয় যে, কাজ করবে, প্রতিদান পাবে না। বরং বাস্তবে তোমরা কাজও করতে থাকবে- নামাযও অনেক পড়বে, অলিগলিতে, গ্রামে-গঞ্জে এবং দেশে-বিদেশেও ঘুরতে থাকবে, দ্বীনী কাজের নামে অনেক কিছু করে দেখাতে থাকবে; কিন্তু যদি হও রসূলে পাকের শানে বেয়াদব-গোস্তাখ, আর মনে করো যে, তোমার আমলনামায় অনেক নামায, অনেক রোযা, অনেকবারের হজ্ব ইত্যাদি জমা আছে, তাহলে তোমাদের এসব আমল অর্থহীন হয়ে যাবে। তোমাদের আমলনামা খালি হয়ে যাবে, ক্বিয়ামতে তোমাদের চেয়ে বেশী মুহতাজ বা মুখাপেক্ষী ও অসহায় আর কেউ থাকবে না। এখানে তোমাদের জন্য বড়ই দুঃখজনক হবে এ বিষয় যে, তোমাদের খবরও থাকবে না যে, তোমাদের আমলনামা শূন্য হয়ে যাচ্ছে। তোমরা যদি জানতে, তা হলে হয়তো তোমরা আত্মশুদ্ধি অর্জন করে তার প্রতিকার করতে, পুনরায় যথানিয়মে আমল করে আমলনামা পূরণের চেষ্টা করতে; কিন্তু হায়! হে গোস্তাখানে রসূল, তোমাদের অগোচরেই তোমাদের আমলগুলো বরবাদ ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, প্রতিকারের কোন প্রয়োজন অনুভব করার সুযোগ থাকবে না। এটা কত বড় শাস্তি! আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন- **عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً** অর্থাৎ আমলও করবে, কষ্টও সহ্য করবে, কিন্তু ফলাফল স্বরূপ জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে।

সুতরাং সাবধান হওয়া চাই, আল্লাহ্ ও রসূলের মহামর্যাদা সম্পর্কে জানা উচিৎ। সবসময় আল্লাহ্ ও তাঁর হাবীবের শানের প্রতি যত্নবান থাকা দরকার।

আল্লাহ্ তাওফীক্ব দিন। আমীন।

খোদার ধনভাণ্ডারে মাহবুবে খোদার ইখ্‌তিয়ার

একথা বাস্তব ও সন্দেহাতীত যে, আল্লাহ তা'আলাই উভয় জাহানের খালিক্ব ও মালিক। তিনি যাঁকে চান দান করেন। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেছেন-

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشَآءُ

(হে হাবীব! এভাবে আরয করুন! হে আল্লাহ! বিশ্ব রাজ্যের মালিক! আপনি রাজ্য যাকে চান প্রদান করেন)। [সুরা আল-ই ইমরান: আয়াত-২৬]

সুতরাং সবকিছুর প্রকৃত (হাকীকী ও যাতী) মালিক আল্লাহ তা'আলা এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আর এ কথাও সত্য এবং যুক্তিযুক্ত যে, এ মহান মালিকের যিনি মাহবুব (ঘনিষ্টতম বন্ধু), তিনি আল্লাহর দানক্রমে উভয় জাহানের মালিক ও হুকুমদাতা। কারণ প্রেমিক ও প্রেমাষ্পদের মধ্যে সর্ম্পক অটুট থাকে আর প্রেমিক তাঁর সমস্ত জিনিষের মধ্যে আপন মাহবুবকে ইখ্‌তিয়ার ও অনুমতি দিয়ে থাকেন। কোন কিছু তাঁর নিকট থেকে গোপন করেন না। তাই আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,

میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب
یعنی محبوب و محبّ میں نہیں میرا تیرا

অর্থাৎ! আমিতো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে মালিকই বলবো, কারণ তিনি হলেন মহান মালিকের হাবীব। বস্তুত প্রেমিক ও প্রেমাষ্পদের মধ্যে 'আমার-তোমার' নেই। [হাদা-ইক্বে বখশিশ]

আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর কৃত ওয়াদা পূরণ করে দিয়েছেন এবং তিনি তাঁর হাবীবকে আপন ধনভাণ্ডারের মালিক করে দিয়েছেন। তার অকাট্য প্রমাণ পবিত্র ক্বোরআন ও হাদীস শরীফে এবং নির্ভরযোগ্য কিতাবাদিতে পাওয়া যায়। যেমন-

মক্কা বিজয়ের সময় নবীকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন উম্মতকে পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের বাদশাহীর ওয়াদা দিয়েছিলেন। তখন ইহুদি ও মুনাফিক্বরা সেটাকে অসম্ভব মনে করলো। তারা বলতে লাগলো -পারস্য ও রোম সাম্রাজ্য অতিমাত্রায় শক্তিশালী। সুতরাং এ ওয়াদা পূরণ হবার নয়।

[খাযাইনুল ইরফান:সূরা আল-ই ইমরান:আয়াত-২৬ এর শানে নুযুল]

অথচ এ ওয়াদা যথাসময়ে পূরণই হয়েছে।

সাহাবা-ই কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমও একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, আল্লাহ তা'আলা আপন রাজ্যগুলোর মালিক আপন মাহবুব সাল্লাল্লাহু তা'আলা

আলায়হি ওয়াসাল্লামকে করেছেন। কিন্তু যারা একথায় তখন বিশ্বাস করেনি তারা ছিলো ইহুদি ও মুনাফিক্ব। এখন দেখুন এ প্রসঙ্গে কিছু ঘটনা ও প্রমাণ।

কিস্‌রার কাঁকন

একদা হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত সুরাক্বাহ ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে বললেন,''হে সূরাক্বাহ ওই সময় তোমার কী শান হবে, যখন কিস্‌রার (ইরান সম্রাট) স্বর্ণের কারুকার্য কৃত কাঁকন তোমার হাতে পরানো হবে?'' সরকার-ই দু'আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ অদৃশ্য সংবাদ হযরত ওমর ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর খিলাফতামলে পূর্ণ হয়েছে। ইরান বিজিত হলো। তখন মাল-ই গণীমত হিসেবে কিস্‌রার কাঁকনও আসলো। হযরত ওমর ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সুরাক্বাহ ইবনে মালিককে ডেকে ওই কাঁকন পরিয়ে দিয়েছেন।

[হুজ্জাতুল্লা-হি আলাল আলামীন ইত্যাদি]

সাহায্য ও নূবুয়াতের চাবিগুচ্ছ

হযরত আমিনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন,হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বেলাদতের সময় জনৈক ব্যক্তিকে বলতে শোনা গেলো-

يَقُوْلُ قَبَضَ مُحَمَّدٌ عَلٰى مَفَاتِيْحِ النُّصْرَةِ وَمَفَاتِيْحِ الرِّبْحِ وَمَفَاتِيْحِ النُّبُوَّةِ بَخٍ بَخٍ قَبَضَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الدُّنْيَا كُلِّهَا لَمْ يَسْبَقْ خَلْقٌ مِّنْ اَهْلِهَا اِلَّا دخَلَ فِیْ قَبْضَتِهٖ [خصائص کبری صفحه ۷۸ ج – ۱]

অর্থাৎ বলছিলো, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসালাম) সাহায্যের চাবিগুচ্ছ,লাভের চাবিগুচ্ছ ও নুবুয়তের চাবিগুচ্ছ হাতের মুঠোয় নিয়েছেন।

বাহ! বাহ! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সমগ্র দুনিয়াকে হাতের মুঠোয় নিয়েছেন। এমন কোন সৃষ্টি থাকেনি, যা তাঁর হাতের মুঠোয় আসেনি। [খাসাইসে কুবরা:১ম খণ্ড: ৭৯ পৃষ্ঠ]

সমস্ত ধন-ভাণ্ডরের চাবিগুচ্ছ

হযরত ওক্ববাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

اِنِّی اُعْطِیْتُ مَفَاتِیْحَ خَزَائِنِ الْاَرْضِ اَوْ مَفَاتِیْحَ الْاَرْضِ

অর্থাৎ নিশ্চয় আমাকে পৃথিবীর সমস্ত ধন-ভাণ্ডারের চাবিগুচ্ছ দেওয়া হয়েছে।

[বোখারী শরীফ:২য় খণ্ড :পৃ:৫৫৮ ও ৯৭৫,মুসলিম শরীফ :২য় খণ্ড পৃ:২৫০]

অনুরূপ, হযরত আবু হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

اُوْتِیْتُ خَزَائِنَ الْاَرْضِ فَوُضِعَ فِیْ یَدَیَّ

অর্থাৎ আমাকে পৃথিবীর সমস্ত ধন-ভাণ্ডার দেওয়া হয়েছে, অত:পর আমার হাতে রাখা হয়েছে। [সহীহ বোখারী শরীফ :২য় খন্ড :পৃ ১০৪২ ও মুসলিম শরীফ ২য় খন্ড :পৃ ২৪৪]

তাছাড়া, হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

اُوْتِيتُ بِمَقَالِيدِ الدُّنيَا عَلٰى فَرَسٍ اَبْلَقَ جَآءَ بِهَاجِبْرِيْلُ عَلَيْهِ قَطِيْفَةٌ مِنْ سُنْدُسٍ

অর্থাৎ আমাকে সমগ্র দুনিয়ার চাবিগুচ্ছ দেওয়া হয়েছে। জিব্রাঈল আমীন আলায়হিমুস সালাম সেগুলো সাদা-কালো রঙের ঘোড়ার উপর রেখে আমার নিকট এনেছে। তখন ওইসব চাবির উপর রেশমী চাদর ছিলো।

[খাসাইসে কুবরা :২য় খণ্ড: পৃ:১৯৫ যারকানী আলাল মাওয়াহিব ও সিরাজ-ই মুনীর]

হুযুর সরওয়ার-ই আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেছেন-

اُوْتِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْاَحْمَرَ وَالْاَبْيَضَ

অর্থাৎ আমাকে লাল ও সাদা দু'টি ধন-ভাণ্ডার দেওয়া হয়েছে।

[মুসলিম ও মিশকাত পৃ:৫১২]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, হুযূর-ই পুরনুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

اُوْتِيتُ مَفَاتِيحَ كُلِّ شَيْءٍ

অর্থাৎ আমাকে সবকিছুর চাবিগুচ্ছ দেওয়া হয়েছে।

[মুসনাদ,তাবরানী ও খাসাইসে কুবরা: ১ম খণ্ড পৃ-১৯৫]

হুযুর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন

وَلِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَئِذٍ بِيَدِى يَئِسُوْا الْكَرَامَةُ وَالْمَفَاتِيحُ يَوْمَئِذٍ بِيَدِى

অর্থাৎ- ক্বিয়ামতের দিন লোকেরা যখন নিরাশ হয়ে যাবে, তখন কারামত ও চাবিগুচ্ছ আমার হাতে থাকবে। আর 'প্রশংসার পতাকা' (লিওয়া-উল হামদ) আমার হাতে থাকবে। [দারেমী,মিশকাত শরীফ :পৃ:৫১৪]

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর ও তাঁর হাবীবকে প্রদত্ত ধন-ভাণ্ডার থেকে উভয় জাহানে আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু দান করুন! আমিন ।

অদৃশ্যজগতের বৃষ্টি

রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সম্পর্কের মহত্ত ও তাঁর পবিত্রতম শরীর মুবারকের মু'জিযার কথা কী বলবো! একটি সুতা কিংবা উলের কাপড়ও যদি ওই নূরী দেহকে স্পর্শ করে সেটাও নূর হয়ে যায়; বরং ওই নূরানিয়াতের অবস্থা এ হয়ে যায় যে, সেটা যদি অন্য কোন মানুষের মাথার উপর পড়ে, তবে তাও নূরের ভাণ্ডারে পরিণত হয়।

এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস শরীফ লক্ষ করুন! একদা প্রখর রোদ ছিলো। আকাশে মেঘের নাম নিশানাও ছিলো না। হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এক সাহাবীর দাফনের জন্য কবরস্থানে তাশরীফ নিয়ে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে যখন আপন হুজরা শরীফে কদম মুবারক রাখলেন আর হযরত উম্মুল মু'মিনীন বিবি আয়েশা সিদ্দীক্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেলেন; তখন উম্মুল মু'মিনীন হুযূরকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য ওঠে দাঁড়ালেন। মাওলানা রূমী ওই বর্ণনাটি এভাবে লিখেছেন-

چشم صدیقہ جو بر رویش افتاد + پیش آمد دست بر وی می نہاد

অর্থাৎ: উম্মুল মু'মিনীনের দৃষ্টি যখন নবূয়তের সৌন্দর্য্যের উপর পড়লো, তখন তিনি সামনে আসলেন। আর শরীর মুবারকের উপর হাত রেখে অনুসন্ধান করতে লাগলেন। তখন রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন-

گفت پیغمبر چہ می جوئی شتاب + گفت باران آمد امروز از سحاب

অর্থাৎ : ওহে আয়েশা! তুমি তাড়াহুড়া করে আমার শরীরের উপর কি তালাশ করছো? উম্মুল মু'মিনীন আরয করতে লাগলেন, ''হে আল্লাহ্র রসূল! আজ এ মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে আপনি তাশরীফ এনেছেন, কিন্তু-

جامہایت را ہمی جویم در طلب + تر نمی بینم زباران اے عجب

অর্থাৎ : আমি আপনার কাপড় মুবারকগুলোকে এ জন্য এভাবে দেখছি যে, এ বৃষ্টিতে আপনার কাপড়গুলো ভিজলো না কেন? এ তো বড়ই আশ্চার্যের কথা! কিন্তু হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম একথা এরশাদ করেন নি, ''ওহে আয়েশা! বৃষ্টিতো হচ্ছে না! দেখো! আকাশে রোদ হাসছে, বিন্দুমাত্র মেঘ নেই।'' বরং হুযূর অতি প্রিয় সূরে এরশাদ করলেন-

گفت پیغمبر چہ کردی از ازار + گفت کردم آن ردائے تو خمار

অর্থাৎ :''আজ তুমি কোন্ কাপড় পরেছো!? উম্মুল মু'মিনীন আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আজ আমি আপনার চাদর মুবারককে আমার দু'পাট্টা বানিয়েছি।''

একথা শুনে মাহবূবে খোদা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন-

گفت زاں نمود حق اے پاک جیب +چشم پاکت راخدا باران غیب

অর্থাৎ : হে আয়েশা! যেহেতু তুমি আমার নূরানী চাদরকে আপন মাথার দু'পাট্টা বানিছে নিয়েছো, সেহেতু এ চাদরের নূরানিয়াত দ্বারা তোমার চক্ষুযুগলে এত মহা নূর পয়দা হয়ে গেছে যে, খোদাওয়ান্দ আলম গায়বে (অদৃশ্যের) মুষলধারে বৃষ্টির দীদার করিয়েছেন।

এর আরো বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে এরশাদ করেছেন-

نیست ایں باراں ازیں ابر سما+ ہست ابر دیگرود یگر سما

অর্থাৎ: হে আয়েশা! এ বৃষ্টি যা তুমি দেখছো, সেটা বর্ষণরত মেঘের বৃষ্টি নয়, বরং এটা অদৃশ্য জগতের (**عالم غیب**) বৃষ্টি। আর এ বৃষ্টির মেঘ এবং সেটার আসমানও ভিন্নতর।

লক্ষ করুন! একটি সুতি চাদর কিছুদিন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নূরানী শরীরের সাথে লেগেছে। অমনি ওই চাদরে এতো নূর পয়দা হয়ে গেছে যে, যখন সেটা উম্মুল মু'মিনীনের শির মুবারকের উপর পড়ার সাথে সাথে সেটার নূরানিয়াতের প্রভাবে তাঁর চক্ষুদ্বয় এতোই আলোকিত হয়ে গেলো যে, তিনি প্রকাশ্য (দৃশ্য) জগতে বসে অপ্রকাশ্য (অদৃশ্য) জগতের বর্ষণরত নূরের বৃষ্টি প্রত্যক্ষ করেন। সুবহানাল্লাহ্! কোথায় তোমরা, ওহে হুযূর মোস্তফার ইল্‌মে গায়বকে অস্বীকারকারীরা! একটু এ বর্ণনার প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করো! যাঁর পবিত্র চাদরের এ প্রভাব যে, তা উম্মুল মু'মিনীনের মাথার উপর পড়ার কারণে অদৃশ্য জগতের বৃষ্টি তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়েছে, সুতরাং ওই চাদর শরীফটি যাঁর, তিনি যদি অদৃশ্য জগত অনুধাবন করেন এবং তাঁর ইল্‌মে গায়ব হাসিল হয়েছে বলা হয়, তাহলে তাতে আশ্চর্যের কী আছে? আল্লাহ্ পাক বুঝার ও মানার তাওফীক্ব দান করুন! আমীন!!

চতুষ্পদ প্রাণীও হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে চিনতো

আবূ নু'আয়ম হযরত সা'লাবাহ্ ইবনে আবূ মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বনী সাল্‌মাহ্ (গোত্র) থেকে একটি উট ক্রয় করলেন, যাকে পানি বহনের কাজে ব্যবহার করা হতো। সেটার পিঠে পানি বোঝাই করা হতো। লোকটি সেটাকে উটের আস্তাবলে বেঁধে দিলেন, যাতে সেটার পিঠে বোঝা উঠানো যায়। কিন্তু সেটার গায়ে খোস্-পাঁচড়া হয়ে

গিয়েছিলো। ফলে উটটি এতোই অস্থির হয়ে গিয়েছিলো যে, কেউ সেটার কাছে যেতে সাহস করতো না। যে-ই কাছে যেতো, সেটা তাকে পদদলিত করতো। লোকটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দরবারে আসলেন এবং ঘটনা আরয করলেন। হুযূর (তাশরীফ আনলেন এবং) নির্দেশ দিয়ে এরশাদ করলেন, ''সেটাকে খুলে দাও।'' সাহাবা-ই কেরাম আরয করলেন, ''খুলে সেটার দিক থেকে আপনার ব্যপারে আমাদের ভয় হচ্ছে।'' হুযূর এরশাদ ফরমালেন, ''সেটাকে খুলে দাও!'' সুতরাং তাঁরা সেটাকে খুলে দিলেন।

উটটি যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দেখলো, তখন এসে সাজদাবনত হয়ে গেলো। উপস্থিত লোকেরা 'সুবহা-নাল্লা-হ্' বলে উঠলেন। আর আরয করলেন, ''এয়া রসূলাল্লাহ্! আমরা এ পশু অপেক্ষা আপনাকে সাজদা করার বেশি উপযোগী।'' হুযূর এরশাদ ফরমালেন, ''যদি সৃষ্টির মধ্যে কোন ব্যক্তির জন্য এটা শোভা পেতো যে, সে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে সাজদা করবে, তবে স্ত্রীর জন্য শোভা পেতো সে তার স্বামীকে সাজদা করা।''

তাবরানী ও আবূ নু'আয়ম হযরত ইয়া'লা ইবনে মুর্‌রাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বললেন, একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বাইরে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। তখন একটি উট ছুটে আসলো এবং হুযূরকে সাজদা করলো। মুসলমানগণ (সাহাবা-ই কেরাম) এটা দেখে আরয করলেন, ''নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সাজদা করার আমরাই বেশি হক্বদার (উপযোগী)।'' তদুত্তরে হুযূর এরশাদ ফরমালেন, ''যদি আমি আল্লাহ্‌কে ব্যতীত অন্য কাউকে সাজদা করার নির্দেশ দিতাম, তাহলে নিশ্চিতভাবে নির্দেশ দিতাম, যেন স্ত্রী তার স্বামীকে অবশ্যই সাজদা করে। তোমরা কি জানো উটটি কি বলছে? সেটা বলছে, সেটা তার মালিকের চল্লিশ বছর যাবৎ খিদমত করেছে। শেষ পর্যন্ত যখন সেটা বৃদ্ধ হয়ে গেছে, তখন সেটার (খাবারের) চারা হ্রাস করে ফেলেছে এবং কাজ বাড়িয়ে দিয়েছে। আর যখন তার সেখানে শাদীর আয়োজন হলো, তখন সে ছোরা নিয়ে তাকে যবেহ করার ইচ্ছা করেছে।''

তখন হুযূর সেটার মালিকদেরকে তলব করলেন এবং তাদের সেটার অভিযোগগুলো বর্ণনা করলেন। তাঁরা বললো, ''হে আল্লাহ্‌র রসূল! আল্লাহ্‌রই শপথ! সেটা সত্য বলেছে।'' হুযূর এরশাদ করলেন, আমি চাচ্ছি তোমরা সেটাকে আমার খাতিরে ছেড়ে দাও।''

-('আল্-খাসাইসুল কুবরা ফী মু'জিযাতি খায়রিল ওয়ারা' : কৃত আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী

সরকার-ই মদীনা হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করে দিয়েছেন

ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম সাইয়্যেদুনা আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, সাইয়্যেদুনা হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু লোকজনকে বললেন, ''আপনারা বলছেন, আবূ হোরায়রা ফখরে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস শরীফ বেশি পরিমাণে বর্ণনা করে। একথার ফয়সালা (ফলশ্রুতি) ক্বিয়ামতের দিন প্রকাশ পাবে। যদি আমি হাদীস শরীফগুলোতে কমবেশি করি, কিংবা খিয়ানত করি, তবে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা আমাকে শাস্তি দেবেন। কারণ, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ''যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আমার নামে মিথ্যা রচনা করে সে যেন তার ঠিকানা দোযখেই করে নেয়।''

অতঃপর সাইয়্যেদুনা আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, বেশি সংখ্যক হাদীস শরীফ বর্ণনা করার কারণ হচ্ছে আমার মুহাজির ভাইয়েরা ব্যবসা-বাণিজ্যের পরস্পরায় আর আন্সার ভাইয়েরা কৃষিকাজে ব্যস্ত থাকেন। আমি একজন মিসকীন ছিলাম।(আমার কোন কাজ-কারবার ছিলো না) সামান্য যা কিছু পেতাম তা আহার করতাম, আর আক্বা ও মাওলা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দরবারে দিনাতিপাত করতাম। হুযূরের হাদীসসমূহ শুনতাম। একদিন রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, ''যে ব্যক্তি আমার দো'আ চাওয়ার সময় আপন কাপড় বিছিয়ে রাখবে অতঃপর সেটা আপন বক্ষে লাগাবে, সে আমার বর্ণিত হাদীসগুলো কখনো ভুলবে না।''

সুতরাং আমিও আমার কম্বলখানা বিছিয়ে দিলাম। সেটা ব্যতীত আমার নিকট অন্য কোন কাপড় ছিলো না। যখন হুযূর-ই আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম দো'আ খতম করলেন, তখন ওই কম্বলটি আমার বক্ষের সাথে লাগিয়ে নিলাম।

وَالَّذِىْ بَعَثَهٗ بِالْحَقِّ مَانَسِيْتُ مِنْ مَّقَالَتِه ذٰلِکَ اِلٰى يَوْمِىْ هٰذَا

অর্থাৎ : শপথ ওই মহান সত্তার, যিনি আপন নবী-ই পাককে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, আজ পর্যন্ত আমি সরকারে মদীনার হাদীসগুলো ভুলি নি।

[মিশ্কাত শরীফ : পৃষ্ঠা : ৫৩৫]

ইমামে আহলে সুন্নাত আ'লা হযরত বলেছেন-

شافع - نافع رافع دافع- کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں
قادر کل کے نائب اکبر- کن کا رنگ دکھاتے یہ ہیں
اُنکے ہاتھ میں ہر کنجی ہے-مالک کل کہلاتے یہ ہیں

অর্থাৎ: হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হলেন- সুপারিশকারী, উপকার সাধনকারী, উন্নীতকারী ও প্রতিহতকারী। কত রকমের রহমতই নিয়ে আসেন তিনি। সর্ব শক্তিমানের মহানতম প্রতিনিধি হলেন তিনি। আল্লাহর নির্দেশ 'হয়ে যাও'-এর 'রং' (প্রকৃতি) প্রদর্শন করেন তিনি। তাঁর হাতে রয়েছে (আল্লাহর) প্রতিটি ভান্ডারের চাবি। এ কারণে তাঁকে 'মালিক-এ কুল' (সবকিছুর মালিক) বলা হয়।

অন্ধ চোখে জ্যোতি ফিরিয়ে দিয়েছেন

ইবনে মাজাহ্ সাইয়্যেদুনা হযরত ওসমান ইবনে হানীফ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, এক অন্ধ লোক দরবারে রিসালতে হাযির হয়ে আরয করলো, ''হে আল্লাহর রসূল! (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) দো'আ করুন যেন আল্লাহ তা'আলা আমার চোখের আলো দান করেন।'' হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন- যাও, ওযূ করে দু' রাক'আত নফল নামায পড়ো। অতঃপর এ দো'আ পাঠ করো-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُکَ وَاَتَوَجَّهُ اِلَيْکَ بِمُحَمَّدٍ نَّبِىِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ اِنِّىْ اَتَوَجَّهُ بِکَ اِلٰى رَبِّىْ فِىْ حَاجَةِ هٰذِهٖ لِتُقْضٰى لِىْ اَللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِىَّ.

বর্ণনাকারী বলেছেন, ওই অন্ধ (হুযূরের এরশাদ অনুসারে) চলে গেলো। (এবং ওই কাজগুলো করে) কিছুক্ষণ পর যখন ফিরে ফিরে আসলো তখন তার চোখ দু'টি জ্যোর্তিময় (সুস্থ) ছিলো। [শেফা শরীফ : ১ম খন্ড : পৃষ্ঠা : ২১২]

অনুরূপ, উহুদের যুদ্ধে সাইয়্যেদুনা ক্বাতাদাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র চোখে শত্রুদের তীর এসে লাগলো। ফলে তাঁর চোখ বের হয়ে চেহারার উপর ঢলে পড়লো। সাইয়্যেদুনা হযরত ক্বাতাদাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সেটা নিজ হাতে চেপে ধরলেন আর দৌঁড়ে হুযূর রসূলে করীমের নিকট এসে হাযির হয়ে গেলেন। রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন বরকতময় হাতে তাঁর (হযরত ক্বাতাদার) ঝুলন্ত চোখ সেটার জায়গায় স্থাপন করলেন। فَكَانَتْ اَحْسَنَ عَيْنَيْهِ (ফলে ওই চোখ তাঁর অপর চোখ অপেক্ষা সৌন্দর্য ও জ্যোতিতে বেড়ে গেলো)। অপর চোখে কখনো ব্যথা ইত্যাদি হলেও হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে পুনঃস্থাপিত চোখটিতে

কখনো কোন ব্যথা হয়নি। [শেফা শরীফ: ১ম খন্ড ২১২পৃষ্ঠা/ মাদারিজুন্নুবুয়াত: ১ম খন্ড ২৩৯পৃষ্ঠা]

আ'লা হযরত বলেছেন-

دافع یعنی حافظ و حامی -دفع بلا فرماتے یہ ہیں
ماتم گھر میں اک نظر میں-شادی شادی رچاتے یہ ہیں
لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن- کوں بچاتے بچاتے یہ ہیں

অর্থাৎ : বালা দূরীভূতকারী অর্থাৎ হিফাযতকারী ও রক্ষাকারী, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, বালা দূরীভূত করেন।

মাতম বা শোকে ছেয়ে ফেলা ঘরে একটি মাত্র কৃপাদৃষ্টি দ্বারা আনন্দের বন্যা প্রবাহিত করেন তিনি।

যেখানে লাখো বালা-মুসীবৎ, কোটি কোটি শত্রু, সেখানে কে রক্ষা করেন? রক্ষা করেন ইনি। (আল্লাহ পাক তাঁকে এমন ক্ষমতা প্রদান করেছেন।)

হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কয়েকজন মৃতকে জীবিত করেছেন

এক. ইমাম বায়হাক্বী তাঁর 'দালাইলুন্নুবূয়ত'-এ বর্ণনা করেছেন- ফখরে দু'আলাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তখন ওই লোকটি আরয করলো, ''আমি ইসলাম তখনই গ্রহণ করতে পারি, যখন আপনি আমার ছোট্ট কন্যাকে জীবিত করবেন।'' হুযূর এরশাদ করলেন, ''আচ্ছা! তাঁর কবরটি দেখিয়ে দাও।'' লোকটি শাহে কাউনাঈন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে তার কন্যার কবরটি দেখিয়ে দিল। অন্য বর্ণনায় এসেছে, লোকটি বলেছিলো, ''আমি আমার শিশুকন্যাটিকে একটি উপত্যকায় ফেলে দিয়েছি।'' সরকারে মদীনা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছিলেন, ''আচ্ছা, আমাকে ওই উপত্যকাটা দেখিয়ে দাও!'' মোট কথা, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওখানে পৌঁছে ওই শিশুটিকে ডাক দিলেন। আল্লাহর শান দেখুন, কন্যাটি তখনই বলে উঠলো, '' লাব্বাইক ও সা'দাইক। (আমি হাযির, ওহে আল্লাহর রসূল! আমি সবিনয়ে হাযির!) হুযূর মালিক-ই দু'জাহান সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তার উদ্দেশে বললেন, ''তুমি কি দুনিয়ায় ফিরে আসতে পছন্দ করো!'' কন্যা শিশুটি আরয করলো, ''এয়া রসূলাল্লাহ! আমি দুনিয়ায় পুনরায় আসা পছন্দ করি না। আমি আখিরাতকে দুনিয়া অপেক্ষা উত্তম পেয়েছি।''

অন্য বর্ণনায় এভাবে এসেছে- (হুযূরের এ মু'যিযা দেখে শিশুটির মাতা-পিতা মুসলমান হয়ে গেছে। তখন) শাহে কওন ও মকান এরশাদ করলেন, ''তোমার মাতা-পিতা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছে। তুমি তাদেরকে পছন্দ করলে

আমি তোমাকে তাদের নিকট পৌঁছিয়ে দেবো।'' শিশুটি আরয করলো, ''এয়া রসূলাল্লাহ! এখন আমার মাতা-পিতার দরকার নেই। আমি আমার দয়ালু খোদাকে তাদের চেয়ে উত্তম পেয়েছি।

[শেফা শরীফ: ১ম-২১১পৃষ্ঠা/ মাদারিজুন্নুবূয়ত: ১ম-২৪০পৃষ্ঠা]

দুই. হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর দু' পুত্রসন্তানকে জীবিত করেছিলেন-

প্রসিদ্ধ কিতাব 'শাওয়াহিদুন নুবূয়ত'-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, যখন সাইয়্যেদুনা জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দাওয়াত দিয়ে আতিথ্যের জন্য ছাগল যবেহ করেছিলেন, তখন তাঁর অনুসরণে তাঁর বড় ছেলেটি তার সহোদরকে যবেহ করে ফেলেছিলো। মা তখন তাকে ধরতে চাইলে সে ঘরের ছাদে উঠে গিয়েছিলো এবং অবচেতন হয়ে ছাদ থেকে পড়ে গেলো এবং সেও মারা গেলো। অতঃপর রাহমাতুল্লিল আলামীন যখন তাদের জন্য দো'আ করলেন, তখন তারা উভয়ে জীবিত হয়ে গিয়েছিলো।

[মাদারিজুন্ নুবূয়ত : ১ম খন্ড : পৃষ্ঠা : ২৪০]

তিন. হুযূর-ই আকরামের বরকতে এক আনসারী যুবক জীবিত হয়েছিলো

হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম -এর নূরানী জীবদ্দশায় এক যুবকের মৃত্যু হলো। লোকেরা তার কাফনের উভয় পার্শ্বও বেঁধে ফেলেছিলো। যখন তার দুর্বল-অন্ধ মা আসলেন তখন লোকেরা তাঁকে তাঁর যুবক ছেলেটির মৃত্যুর খবর দিলেন। তখন ওই দুর্বল বৃদ্ধা আপন দু'হাত তুলে নিম্নলিখিত বাক্যগুলো দ্বারা আল্লাহর মহান দরবারে দো'আ করলেন-

اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّیْ هَاجَرْتُ اِلَیْکَ وَاِلٰی نَبِیِّکَ رَجَآءَ اَنْ یُّغِیْثَنِیْ فِیْ كُلِّ شِدَّةٍ فَلَا تَحْمِلْ عَلَیَّ هٰذِهِ الْمُصِیْبَةَ بِحُرْمَةِ نَبِیِّکَ.

অর্থাৎ : হে আল্লাহ! যদি তুমি একথা জানো যে, আমি তোমার ও তোমার হাবীবের দিকে এ আশায় হিজরত করেছি যেন তুমি প্রতিটি বালা-মুসীবতে আমাকে সাহায্য করবে, তাহলে তুমি তোমার হাবীবের ওসীলায় আমার উপর এ মুসিবৎ ফেলো না!

অবলা বৃদ্ধা এ দো'আ করতেই তার মৃত যুবক পুত্র জীবিত হয়ে গেলো। অতঃপর লোকেরা তার মুখ ও কাফন খুলে দিলেন। আর সে উঠে দাঁড়ালো। সুবহানাল্লাহ! হুযূরের ওসীলায়ই মৃত জীবিত হয়ে গেলো।

রসূলে পাকের সাচ্চা আশিক্বকে আগুন স্পর্শ করেনি হযরত যুরায়ব ইবনে কুলায়য রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু

ইবনে ওয়াহাব ইবনে লুহায়'আহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন-আস্ওয়াদ আনাসী যখন নুবূয়তের ভণ্ড দাবিদার হলো এবং 'সানা'আ' (ইয়ামেনের সানা)'র উপর তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা কল তখন হযরত যুরায়ব ইবনে কুলায়ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুকে ধরে আগুনে নিক্ষেপ করা হলো। কারণ, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সত্যনবী বলে বিশ্বাস করে তাঁর প্রতি ঈমানের ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং ভণ্ড নবী আস্ওয়াদ আনাসীকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সুব্হানাল্লাহিল আযীম! আগুন কিন্তু হযরত যুরায়বের কোন ক্ষতি করেনি। এদিকে এ ঘটনা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন সাহাবীদেরকে বলেছিলেন। তখন হযরত ওমর ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আরয করলেন, 'ওই রব্বুল ইয্যতের প্রশংসা, যিনি আমাদের উম্মতের মধ্যে এমন লোককে পয়দা করেছেন, যাকে হযরত ইব্রাহীম খলীল আলায়হিস্ সালাম এর মতো আগুন জ্বালায়নি, 'হযরত আবদান 'কিতাবুস্ আহবা'য় লিখেছেন, হযরত যুরায়ব হলেন ওই ব্যক্তি, যিনি কুলায়ব ইবনে রবী'আহ খাত্তলানীর পুত্র। ইয়ামনবাসীদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ঈমান এনেছিলেন। [খাসাইস কুব্রা : কৃত ইমাম সুয়ুতী]

এক খাওলানী!

ইবনে আসাকির আবূ বিশ্র জা'ফর ইবনে আবূ ওয়াহশিয়াহর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, 'খাওলান' গোত্রের এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলো। তাঁর গোত্রের লোকেরা তাঁকে পুনরায় কুফরের দিকে ফিরিয়ে নিতে চাইলো। কিন্তু তিনি তাতে রাজী হননি। সুতরাং তারা তাঁকে ধরে আগুনে নিক্ষেপ করলো। কিন্তু আগুন তাঁকে জ্বালায়নি, ওই সব স্থান ব্যতীত যেগুলোতে ইতোপূর্বে ওযূর পানি পৌঁছতো না। অতপর লোকটি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্বের নিকট আসলো। লোকটি তাঁকে বললো, 'আপনি আমার জন্য আল্লাহর দরবারে ইস্তিগফার করুন! (ক্ষমা প্রার্থনা করুন!) তিনি বললেন, 'তুমিই অধিকতর উপযোগী! কারণ, তোমাকে কাফিররা আগুনে নিক্ষিপ্ত করেছে অথচ আগুন তোমাকে জ্বালায়নি।" অতপর তবুও তিনি লোকটির জন্য দো'আ করেছেন। এরপর লোকটি সিরিয়া চলে গিয়েছিলেন। এরপর থেকে লোকেরা তাকে হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম এর মু'জিযা এবং খাওলানীর এ কারামতের আলোচনা করতো।

[খাসাইসে কুব্রা]

হযরত আবূ মুসলিম খাওলানী

ইবনে আসাকির ইসমাঈল ইবনে আইয়্যাশের সূত্রে হযরত শুরাহবীল ইবনে মুসলিম খাওলানী থেকে বর্ণনা করেছেন, আস্ওয়াদ ইবনে কায়স আনাসী ইয়ামনে নবূয়তের ভণ্ড দাবিদার হলো। তখন সে হযরত আবূ মুসলিম খাওলানীর নিকট আসলো। সে তাঁকে বললো, "আপনি কি সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আমি আল্লাহর রসূল?" হযরত আবূ মুসলিম বললেন, "আমি শুনতে পাচ্ছি না।" সে বললো, "আপনি কি এমর্মে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসূল?" হযরত আবূ মুসলিম বললেন, "হ্যাঁ, আমি একথার সাক্ষ্য দিচ্ছি।" এটা শুনে সে অতিমাত্রায় ক্রোধান্বিত হলো এবং একটি অগ্নিকুণ্ড প্রবলভাবে প্রজ্জ্বলিত করার নির্দেশ দিলো। তারপর হযরত আবূ মুসলিমকে ওই আগুনে নিক্ষেপ করা হলো। কিন্তু আগুন তাঁকে বিন্দু মাত্রও জ্বালায়নি। তাঁর কোন ক্ষতি হয়নি। এটা দেখে ভণ্ড নবী আস্ওয়াদ আনাসী ভীত-সন্ত্রস্থ হয়ে পড়লো। তাকে একজন বললো, "তুমি তাঁকে এখান থেকে দূরে কোথাও সরিয়ে না দিলে তিনি তোমার অনুসারীদেরকে তোমার দিক থেকে ফিরিয়ে ইসলামের দিকে ধাবিত করে ফেলবে। সুতরাং সে আব মুসলিমকে ইয়ামেন থেকে বের হয়ে অন্যত্র চলে যাবার নির্দেশ দিলো।

অতপর তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় চলে গেলেন। ওই সময় হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ দুনিয়া থেকে পর্দা করেছিলেন। তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু খলীফা ছিলেন। তাঁর ঘটনা শুনে হযরত আবূ বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, "ওই মহামহিম আল্লাহরই প্রশংসা, যিনি ওই সময় পর্যন্ত আমাকে মৃত্যু দেন নি, এবং আমাকে তিনি হুযূর মুহাম্মদ মোস্তফার উম্মতের এমন এক ব্যক্তিকে দেখিয়েছেন, যাঁর সাথে ওই ঘটনা ঘটেছে যা হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম এর সাথে ঘটেছিলো।" ওদিকে খাওলাল গোত্রের লোকেরা আস্ওয়াদ আনাসীর অনুসারীদেরকে বলছিলো, "তোমরা তেমনি মিথ্যুক লোক যে, তোমরা আমাদের একজন সাথীকে আগুনে নিক্ষেপ করেছো, আর আগুন তাঁর কোন ক্ষতিই করে নি।" [খাসাইসে কুব্রা]

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

ইবনে সা'দ বলেছেন, আমাকে ইয়াহিয়া ইবনে হাম্মাদ, তাঁকে আবূ আওয়ানাহ্ আবূ বাল্জ থেকে, তিনি আমর ইবনে মায়মূন থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন-তিনি বলেছেন, মুশরিকগণ হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসারকে আগুনে ফেলে দিয়েছিলো। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওখানে তাশরিফ নিয়ে গেলেন। আর হযরত আম্মারের মাথার উপর আপন হাত মুবারক বুলিয়ে দিলেন আর আগুনের উদ্দেশ্যে এরশাদ ফরমালেন- **يَا نَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّ سَلَامًا عَلٰى عَمَّارٍ كَمَا كُنْتِ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ** অর্থাৎ হে আগুন! তুমি আম্মারের উপর

শীতল ও শান্তিময় হয়ে যাও, যেভাবে তুমি ইব্রাহীমের উপর হয়েছিলে।
আর হযরত আম্মারের উদ্দেশ্যে এরশাদ ফরমালেন, "হে আম্মার! তোমাকে বিদ্রোহী দল শহীদ করবে। (এ আগুন নয়) [খাসাইস কুব্‌রা]

হযরত ওমর ফারূক্ব ও হযরত তামীম দারী আগুনকে তাড়িয়েছেন!

বায়হাক্বী ও আবূ নু'আয়ম হযরত মু'আবিয়া ইবনে হারমাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বললেন, হাররাহ্ থেকে আগুন বের হলো। খবর পেয়ে আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত তামীম-ই দারীর নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন। আর বললেন, "ওই আগুনের দিকে চলুন!" তিনি তাঁর সাথে গেলেন। আমি ও তাঁরা উভয়ের পেছনে চলতে লাগলাম। তাঁরা উভয়ে আগুনের নিকট আসলেন। আর হযরত তামীম আপন হাতে আগুনকে তাড়াছিলেন। আগুনও পিছু হটতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত ওই আগুন পাহাড়ে একটি উপত্যকায় ঢুকে পড়লো। হযরত তামীম-ই দারীও সোর পিছু ধাওয়া করেছেন। এ ঘটনার গুরুত্ব হযরত ওমর ফারুক্বের এ উক্তি শরীফ অনুধাবন করা যায় তিনি তিনবার বলেছিলেন, 'যে ব্যক্তি আগুন দেখেনি, সে ওই আগুন প্রত্যক্ষকারীর সমান নয়।"
উল্লেখ্য, আবূ নু'আয়ম হযরত মারযূক্ব থেকে এভাবে বর্ণনা করেছেন, হযরত ওমর ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর খিলাফতকালে আগুন লেগেছিলো। তখন হযরত তামীমদারী আপন চাদর দ্বারা ওই আগুনকে তাড়িয়ে ছিলেন যে পর্যন্ত না আগুন পাহাড়ের একটি গূহায় ঢুকে পড়েছিলো। তখন হযরত ওমর ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছিলেন, 'হে আবূ রুকিয়াহ্! এ কাজের জন্যই আমি তোমাকে এতদিন গোপন রেখে ছিলাম।
পরিশেষে উল্লিখিত ঘটনাবলী থেকে জানা গেলো যে, আমাদের আক্বা ও মাওলা হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াল্লাম'র উপর সাচ্চা ঈমান ও ভালবাসার বদৌলতেও তাঁদের মধ্যে এমন ক্ষমতা ও মর্যাদা এসে গেলো যে, আগুন তাঁদেরকে না জ্বালিয়ে সম্মান প্রদর্শন করেছে। সে বস্তুর সাথে হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র হাত মুবারক লেগেছে তাঁকেও আগুন স্পর্শ করেনি। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর দস্তর খানায় হুযূর হাত মুছে ছিলেন। ওই দস্তরখানাকে আগুন জ্বালাতো না। সে অপরিস্কার হলে তিনি তা জ্বলন্ত চুলোয় ফেলে দিতেন। আগুন ময়লাগুলোকে জ্বালিয়ে ফেলতো, দস্তরখানাকে নয়; ফলে সেটা পরিচ্ছন্ন হয়ে আগুন থেকে বের আসতো। সুবহানাল্লাহ্! আল্লাহ তা'আলা আমাদের অন্তরে ওই ইশক্ব ও মুহাব্বতে রসূল পয়দা করুন, যার বদৌলতে আমরা কাল ক্বিয়ামতে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা পাই!, আমীন।

গোসাপের সাক্ষ্য

বর্ণিত হয়েছে যে, সাহাবা-ই কেরামের সাথে একদা আঁ- হযরত সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদ শরীফে তাশরীফ রাখছিলেন। তখন এক গ্রাম্য লোক আসলো। আর বলতে লাগলো, "হে মুহাম্মদ! (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমি আপনাকে পছন্দ করি না, আপনার সম্প্রদায়ের ভয় না থাকলে আমি এক্ষুনি আপনাকে কতল করে ফেলতাম।"
এটা শুনতেই হযরত ওমর ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ক্রোধান্বিত হয়ে তলোয়ার উঁচিয়ে নিলেন এবং তাকে হত্যা করার উপক্রম হলেন। হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাধা দিলেন আর এরশাদ করলেন, "ওমর, রুখে যাও! তাকে হত্যা করো না!" তারপর গ্রাম্য লোকটির সাথে কথোপকথনঃ

: (হে আ'রাবী!) তুমি কোন্ গোত্রের লোক?
: বনী সুলায়ম গোত্রের।
: তুমি কি আমার সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কোন অপছন্দনীয় কথা শুনেছো?
: না।
: আমি কি তোমাকে কখনো কোন কষ্ট দিয়েছি?
: না-তো।
: তাহলে তো তুমি এমন একজনকে কতল করতে চাচ্ছো, যিনি তোমার কথানুসারে না মন্দ, না তিনি কখনো তোমার কোন ক্ষতি করেছেন! এখন তুমি নিজেই ফয়সালা করো যে, তুমি সত্য ও ন্যায়ের পথে আছো কিনা। যদি তুমি তজ্জন্য লজ্জিত ও দু:খিত হয়ে থাকো, তবে কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যাও!
: কেন? আমি মুসলমান হতে যাবো কেন? আপনি তো যাদুকর, গণক ও মিথ্যাবাদী!
: না, মোটেই না। আমি না যাদুকর, না গণক। আমি তো আল্লাহ্ তা'আলার রসূল! এমন এক রসূল, যিনি সমস্ত মানব জাতির প্রেতি প্রেরিত। আমি মিথ্যাবাদীও নই, বরং ভূ-পৃষ্ঠে বসবাসকারী সকলের চেয়ে বেশী সত্যবাদী। সুতরাং তুমি আমার কথায় বিশ্বাস করো এবং কলেমা পড়ে নাও।
: কিন্তু একটি শর্তে আমি ঈমান আনবো?
: সেটা কি?
: হে মুহাম্মদ! (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার নিকট একটি

জিনিষ আছে। যদি সেটা আপনার উপর ঈমান আনে, তবে আমিও মুসলমান হয়ে যাবো।

হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার শর্ত মঞ্জুর করে নিলেন। তখন গ্রাম্য লোকটি তার আস্তিনের মুখ খুলে দিলো। তা থেকে একটি গোসাপ বেরিয়ে আসলো। এবার গো-সাপের সাথে হুযূর-ই আক্‌রামের কথোপকথন-

: হে গোসাপ! তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক!

: আপনার উপর লাখো সালাম হে মানবকুল সরদার!

: বলোতো দেখি আমি কে?

: আপনি সত্য রসূল, মানব জাতির গৌরব। ক্বিয়ামত দিবসে 'হামদ-এর পতাকা' আপনার হাত মুবারকে থাকবে, আপনার উপর যে ঈমান আনবে, তার জন্য রয়েছে মুক্তি (নাজাত) আর অস্বীকারকারীর জন্য ক্ষতি অবধারিত।

: হে গোসাপ! তুমি কার ইবাদত করো? (হুযূর-ই আক্‌রাম একথা বিজ্ঞাসা করলে গোসাপ স্পষ্ট ভাষায় বললো-)

: আমি ওই খোদার ইবাদত করি, আসমানের উপর যার আরশ, যমীনের উপর যাঁর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত, স্থলভাগে রয়েছে যাঁর অগণিত আশ্চর্যজনক সৃষ্টি, সমুদ্রেও রয়েছে তাঁর অসংখ্য আজব সৃষ্টি। ক্বিয়ামত দিবসে যাঁর রাজত্ব থাকবে, জাহান্নামে যাঁর শাস্তি কার্যকর, সর্বোপরি জান্নাতে রয়েছে যাঁর রহমতের ছড়াছড়ি।

গ্রাম্য লোকটি তার গোসাপের মুখে এ সাক্ষ্য শুনে মুচকি হাসলো আর বললো, "এয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার প্রতি ইতোপূর্বে আমার মনে ঘৃণা ছিলো, আর এখন সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে আপনার প্রতিই আমার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসা সৃষ্টি হয়ে গেছে।" এটা বলে সে কলেমা পড়ে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিলো।

[বায়হাক্বী, মাদারিজুন্নবূয়ত, আহ্‌সানুল মু'জিযাত, জামে'উল মু'জিযাত ইত্যাদি]

নেকড়ে বাঘের সাক্ষ্য

হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, ছাগলের একটি পালের উপর এক নেকড়ে বাঘ হামলা করল। আর একটি ছাগল ধরে নিজের আয়ত্তে নিয়ে নিলো। ওই রাখালও ছিলো দারুন সাহসী। সে দৌঁড়ে গিয়ে নেকড়ের পাঞ্জা থেকে তার ছাগলটি ছাড়িয়ে নিলো। নেকড়েটি এরপর পাহাড়ের উপর গিয়ে বসলো। আর বললো, "ওহে রাখাল! তুমি আমার নিকট থেকে আমার রিয্‌ক্বটুকু ছিনিয়ে নিলে?"

রাখাল বাঘের মুখে কথা বলতে শুনে আশ্চার্যান্বিত হয়ে গেলো। আর বলতে

লাগলো, "আল্লাহরই শপথ! কতোই আশ্চর্যের বিষয়! আমি আজ পর্যন্ত নেকড়ে বাঘকে মানুষের মতো কথা বলতে শুনিনি।"

নেকড়ে বাঘটি এবার রাখালের উদ্দেশে বললো, "এর চেয়েও বেশি আশ্চার্যজনক তো তোমার অবস্থা! শেষ যমানার নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল হিসেবে তাশরীফ এনে তোমাদেরকে নাজাতের দিকে ডাকছেন। আর তোমরা তাঁর নিকট থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছো। তাঁর কথা পর্যন্ত শুনতে চাচ্ছো না!"

রাখাল লোকটি ইহুদী ছিলো। সে তাৎক্ষণিকভাবে রসূল-ই আক্‌রামের দরবারে হাযির হলো এবং বাঘের ঘটনাটা শুনিয়ে কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলো।

[জামেউল মু'জিযাত, মাদারিজ: ১ম খণ্ড: হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে এ হাদীস বর্ণিত]

বোত-প্রতিমা বলে উঠলো!

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ইসলামের প্রাথমিক অবস্থার এক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমরা হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালাম-এর পবিত্র দরবারে উপবিষ্ট ছিলাম। ইত্যবসরে এক অপরিচিত লোক আসলো। তার চেহারা ও লেবাস-পোশাক দেখে মনে হলো সে অনেক দূর থেকে এসেছে। আমাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে বললো, "আপনাদের মধ্যে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) কে? আমরা হুযূর-ই আকরামের দিকে ইঙ্গিত করলাম। এবার লোকটি হুযূর-ই আকরামকে সম্বোধন করে বলতে লাগলো, "আমি কি প্রথমে আমাদের বোতের (প্রতিমা) কথা শোনাবো, না আপনি আপনার রবের বিধানাবলী শুনাবেন?" হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "প্রথমে আমার রবের বিধানাবলী শোনো! এটা বলে হুযূর এরশাদ করলেন, "ইসলামের বুনিয়াদ পাঁচটি জিনিসের উপর প্রতিষ্ঠিত- 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'র সাক্ষ্য দেওয়া, নামায কায়েম করা, যাকাত দেওয়া, রমযানের রোযা রাখা এবং সামর্থ্য থাকলে হজ্ব করা।" তারপর হুযূর এরশাদ করলেন, "হ্যাঁ, এখন বলো তোমাদের বোত্ কি বলেছে?"

লোকটি বললো, "হে আল্লাহর রসূল! আমার নাম গাস্‌সান ইবনে মালেক আমেরী। আমাদের একটি বোত্ (মূর্তি) আছে। সেটার পদতলের বেদীতে আমরা প্রত্যেক রজব মাসে আপন আপন কোরবানী পেশ করি। সুতরাং আমাদের মধ্যেকার ইসাম নামের এক ব্যক্তি তার কোরবানী পেশ করলো, তার কোরবানী সমাধা করার পরক্ষণে বোত্ থেকে আওয়াজ আসলো, "ইসাম! ইসলাম প্রকাশ লাভ করেছে এবং বোত্ প্রতিমাগুলোর মাথা নত হয়ে গেছে।" ইসাম আমাদেরকে একথা বলে দিলো। কিছু দিন পর তারেক্ব নামের এক ব্যক্তি বোতের পদতলে কোরবানী পেশ করলো। "তারেক্ব যখন কোরবানীর কাজ সমাপ্ত করলো, তখন বোতের পেট থেকে আওয়াজ আসলো, "তারেক্ব! সত্য

নবী তাঁর প্রিয় স্রষ্টার পক্ষ থেকে সবাক ওহী নিয়ে তাশরিফ এনেছেন।'' তারেক্ব এটা শুনে জোরেশোরে লোকদেরকে বলতে আরম্ভ করে দিলো। এদিকে আমিও আপনার সম্পর্কে শোনেছি। এভাবে আমরা এক বিরাট সংশয়ে পড়ে গেছি। এমতাবস্থায় তিনদিন অতিবাহিত হলো। আমার সাথেও এমনি ঘটেছে। আমি যখন আমার কোরবানী পেশ করে অবসর হলাম তখন বোতটি স্পষ্ট ভাষায় বললো, ''গাস্‌সান! জা---আল হাক্বকু ওয়া যাহাক্বাল বাত্বিলু। (সত্য সমাগত, মিথ্যা অপসৃত)। বনু হাশিম গোত্রে নবী প্রেরিত হয়েছেন। তাঁর গোলামদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা আবধারিত, আর তাঁর শত্রুদের জন্য অবমাননা নিশ্চিত।'' একথা বলে বোত্‌টা মুখের উপর ভর করে লুটিয়ে পড়লো। গাসসান এসব ঘটনার বর্ণনা শেষ করে হুযূর-ই আকরামের পবিত্র হাতে ইসলাম গ্রহণ করলো। সাহাবা-ই কেরাম আবেগাপ্লুত হয়ে না'রা উচ্চারণ করলেন।

[জামেউল মু'জিযাত]

মহান চিকিৎসক

হযরত ইয়াযীদ ইবনে আবূ ওবায়দাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, আমি, হযরত সালমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর পায়ের গোছায় একটি জখমের চিহ্ন দেখতে পেলাম। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। হযরত সালমা বললেন, ''খায়বারের যুদ্ধে আমার পায়ের গোছায় এক গভীর যখন লেগেছিলো। লোকেরা বলতে লাগলেন, ''এমন জখম থেকে আরোগ্য লাভ করা মুশকিল ব্যাপার।'' আমি হুযূর-ই আকরামের দরবারে হাযির হলাম। আর আমার জখমের কথা আরয করলাম। হুযূর যখমের উপর তিন বার থুথু মুবারক দিলেন। অমনি আরোগ্য লাভ করলাম এবং আজ পর্যন্ত আমার পায়ে কোন ব্যাথা পর্যন্ত অনুভব করিনি।

নবীকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বাদশাহী হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম-এর বাদশাহী অপেক্ষা ব্যাপকতর

হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম-এর নুবূয়ত ও বিশ্বব্যাপী বাদশাহীর কথা কে না জানে? প্রায় সবাই অবগত আছে যে, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে ফরিয়াদ করেছিলেন যেন তাঁকে তিনি এমন বাদশাহী দান করেন, যা অন্য কারো বৈশিষ্ট্য বা শোভা না হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ফরিয়াদ কবূল করেছেন। ফলে তিনি তৎকালীন সমগ্র দুনিয়ায় মানব, দানব, পশু, পাখী থেকে আরম্ভ করে ক্ষুদ্রতর প্রাণী পিঁপড়ার উপর পর্যন্ত রাজত্ব করেছেন। অন্যদিকে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর হাবীব, আমাদের আক্বা ও মাওলা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দু'জাহানের বাদশাহী দিয়েছেন, এমনকি পূর্ববর্তী নবীগণকে যেসব বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন ওই সব বৈশিষ্ট্য ও গুণ তাঁকেও দান করেছেন। সুতরাং দলীলগত ও যুক্তিগত দিয়ে এবং

বাস্তবিকপক্ষেও আমাদের নবী-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বাদশাহী দুনিয়ার সব রাজা-বাদশাহর বাদশাহী অপেক্ষা ব্যাপকতরই ছিলো। এ নিবন্ধে আমি প্রথমে হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম-এর বাদশাহী সম্বন্ধে আলোচনা করবো, তারপর আমাদের আক্বা ও মাওলার বাদশাহীর ব্যাপকতা সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়াস পাবো- ইনশাআল্লাহু তা'আলা।

হযরত সুলায়মান্ আলায়হিস্ সালাম

'সূরা নাম্‌ল'-এর নিম্নলিখিত আয়াত ও এর পূর্বাপর আয়াতে হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম-এর এক সফরের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এ সফরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হচ্ছে- একদিন হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম সিরিয়া (শাম) থেকে ইয়ামনের দিকে রওনা হলেন। তাঁর নিয়ম ছিলো- তিনি সফরে তাঁর সাথে জিন, মানুষ, পশু ও পাখীর বিরাট বাহিনীও নিয়ে যেতেন। এ সফরেও এর ব্যতিক্রম ছিলো না। তাফসীর-ই রূহুল বয়ানে উল্লেখ করা হয়েছে- এ বাহিনী সাড়ে বার হাজার বর্গমাইল ভূ-খণ্ড ব্যাপী বিরাজিত ছিলো। সফরকালে তাঁরা সিরিয়ার এক মরুভূমি অতিক্রম করেছিলেন, যাতে প্রচূর পরিমাণে পিপঁড়ার বসবাস ছিলো। পূর্ণ-মরুভূমিতে সেগুলো ছড়িয়ে পড়েছিলো। ওই পিঁপড়াগুলোর প্রধান ছিলো তাদের রাণী। সেটার নাম ছিলো 'মুনযিরাহ্' কিংবা 'ত্বাখিয়াহ্'। হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম-এর বাহিনী ওই মরুভূমি থেকে তখন তিন মাইল দূরে ছিলো। পিঁপড়ার রাণী তাঁদেরকে দেখে ঘোষণা করলো, ''ওহে পিঁপড়ার দল! এক্ষুণি তোমরা নিজ নিজ ঘরে (গর্তে) ঢুকে পড়ো। এমন যেন না হয় যে, হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম-এর বাহিনীর পদতলে তোমরা পিষে যাবে, অথচ তা তাঁরা অনুভবই করতে পারবেন না।''

তিন মাইল দূর থেকে হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম পিপঁড়াগুলোর রাণীর ওই মা'মূলী ও ক্ষীণ আওয়াজ শুনতে পান ও তার কথা বুঝতে পারলেন। তিনি পিঁপড়া-রাণীর এমন বুদ্ধিমত্তা ও দায়িত্বশীলতার উপর আশ্চর্যবোধ করলেন আর মুচকি হাসলেন, আল্লাহর শোকরিয়া (কৃতজ্ঞতা) প্রকাশ করলেন। মুচকি হেসেছিলেন রাণীর বুদ্ধিমত্তা দেখে, আর শোকরিয়া আদায় করলেন তাঁর প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের উপর যে, তিনি তাঁকে এমন বাদশাহী ও জ্ঞান দান করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা 'সূরা নাম্‌ল'-এর ১৮নং আয়াতে এ প্রসঙ্গে এরশাদ করেছেন-

حَتّٰى اِذَا اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يٰٓاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ - فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا - الاية -

তরজমা: এ পর্যন্ত যে, যখন তারা পিপড়াগুলোর উপত্যকায় আসলো, তখন একটি পিঁপড়া বললো, হে পিঁপড়ারা! নিজ নিজ ঘরে (গর্তে) ঢুকে পড়ো, যাতে তোমাদেরকে পদদলিত না করে সুলায়মান ও তাঁর বাহিনী অজ্ঞাতাসরে। তখন

(হযরত সুলায়মান) একথা শুনে মুচকি হাসলো। [সূরা নাম্‌ল: আয়াত-১৮]
এ আয়াতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সুস্পষ্ট হয়-
১. হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম-এর বাদশাহী শুধু মানবজাতি নয় বরং অন্যান্য সৃষ্টিব্যাপী ছিলো। ২. তিনি শুধু মানুষের নয়, বরং অন্যান্য প্রাণীর কথাও বুঝতে পারতেন। ৩. অনেক দূরের কথা শুনার ক্ষমতাও তাঁর ছিলো। তিন মাইল দূর থেকে তিনি পিঁপড়ার মা'মুলী শব্দ শুনেছিলেন। ৪. তিনি যুল্‌ম-অত্যাচার থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র ছিলেন- একথায় পিঁপড়ারও নিশ্চিত বিশ্বাস ছিলো। তাই পিঁপড়া-রাণী বলেছিলো- ''যেন হযরত সুলায়মান ও তাঁর বাহিনী অজানাবশত তোমাদেরকে পদদলিত না করে।'' ইচ্ছাকৃতভাবে এমনটি করার প্রশ্নই আসে না। ৫. পিঁপড়া হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালামকে চিনেছিলো। কারণ, তাঁর আনুগত্য করা সেটার উপর ওয়াজিব ছিলো।
এগুলো ছিলো হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম-এর বাদশাহীর কতিপয় বৈশিষ্ট্য। এখন আল্লাহর মাহবূব, বাদশাহগণের বাদশাহ্, ইমামুল ক্বেবলাতাঈন, নবী-ই হারামাঈন **হযরত মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সালতানাৎ বা বাদশাহীর আলোচনা করা যাক**
একথা দৃঢ়ভাবে সাব্যস্ত হয়েছে যে, সকল নবী আলায়হিমুস্ সালাম-এর সমস্ত গুণ ও বৈশিষ্ট্য হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে সন্নিবিষ্ট; বরং আরো বেশী। ক্বোরআন শরীফের আয়াত **فَبِهُدَا هُمُ اقْتَدِهْ** -এর মর্মার্থ এটাই। মাওলানা জামী আলায়হির রাহ্‌মাহ্ একথাই বলেছেন-

حُسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری - آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری

অর্থাৎ হযরত ইয়ূসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর সৌন্দর্য, হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর ফুঁক, হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর শুভ্রহস্ত, হে আল্লাহর রসূল, আপনিও ধারণ করেন। তাঁদের সবার যত সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য ছিলো সবই আপনার মধ্যে রয়েছে। হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম-এর ব্যাপক বাদশাহী তাঁর একটা বৈশিষ্ট্য। সুতরাং সেটাও আমাদের আক্বা ও মাওলা হুযূর-ই আক্‌রামের মধ্যে থাকা চাই। বস্তুতঃ সমস্ত নবীর মু'জিযাগুলো ও হুযূর-ই আক্‌রামকে দেওয়া হয়েছে। সেগুলোর বহিঃপ্রকাশ অন্যভাবেও হতে পারে। যেমন- পিতার মাধ্যম ব্যতীত সৃষ্টি হওয়া হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর বৈশিষ্ট্য, হুযূর-ই আক্‌রাম 'মাধ্যম' ছাড়া সরাসরি আল্লাহর নূর হতে সৃষ্টি হয়েছেন। হুযূর-ই আক্‌রাম এরশাদ করেছেন- **اَنَا نُوْرٌ مِّنْ نُوْرِ اللّٰهِ** (আমি আল্লাহ্ নূর, আল্লাহর নূর থেকে)। হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম 'কলীমূল্লাহ্' (আল্লাহর সাথে সরাসরি কথোপকথনকারী) ছিলেন 'তূর পাহাড়ে। আর আমাদের আক্বা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সরাসরি আল্লাহর সাথে

কথা বলেছেন 'আলম-ই লা-মাক্বানে'। হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম পাথর থেকে পানির নহর প্রবাহিত করেছিলেন, আর হুযূর-ই আক্‌রাম আপন আঙ্গুল মুবারক থেকে পানির ফোয়ারা প্রবাহিত করেছেন। হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম মৃত মানুষকে জীবিত করেছেন; আর হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কঙ্কর, পাথর ও শুষ্ক কাঠকেও নিজের কলেমা পড়িয়েছেন। অনুরূপ, যদি হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম-এর, সমগ্র পৃথিবীর প্রাণীগুলো প্রজা হয়ে থাকে, তবে হুযূর-ই আক্‌রাম আলায়হিস্ সালাম-এর উম্মত ছিলো- সমগ্র পৃথিবীর, আসমানের, ফরশের প্রাণসম্পন্ন ও প্রাণহীন-সবাই ও সবকিছু। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমান- **لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا** (যাতে তিনি সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য সতর্ককারী হন)। মোটকথা, সমস্ত সৃষ্টির উপর হুযূর-ই আক্‌রামের বাদশাহী ছিলো, যদিও তিনি সবটুকু প্রকাশ করেন নি।
মিশকাত শরীফে উদ্ধৃত এক হাদীস শরীফে হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ''আজ রাতে শয়তান আমার নিকট আমি নামাযরত অবস্থায় এসেছিলো। আমি চেয়েছিলাম তাকে ধরে বেঁধে রাখবো। অতঃপর মদীনার শিশুরা তাকে নিয়ে খেলা করবে। কিন্তু তখন হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম-এর দো'আর কথা স্মরণ হলো। তিনি দো'আ করছিলেন, ''হে আল্লাহ্! আমাকে এমন বাদশাহী দাও যা অন্য কারো উপযোগী না হয়।'' তখন তাকে ছেড়ে দিলাম।'' সুতরাং একথা স্পষ্ট হলো যে, শয়তানের উপর হুযূর আক্‌রামের কর্তৃত্ব ছিলো। কিন্তু তিনি তা পুরোপুরি প্রয়োগ করেননি, বরং ওই মিশকাত শরীফে আছে যে, হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যাকাতের মালের রক্ষক ছিলেন। শয়তান তা থেকে চুরি করতে এসেছিলো। তিনি তাকে বন্দি করেছিলেন। সে ছুটতে পারেনি; কিন্তু তাঁকে তোষামোদ করে সে রক্ষা পেয়েছিলো। অস্ত যাওয়া সূর্য হুযূর-ই আক্‌রামের ইশারায় ফিরে এসেছিলো, চন্দ্র দ্বি-খণ্ডিত হয়েছিলো। বৃক্ষগুলো আনুগত্য করেছিলো। সবকিছুর উপর বাদশাহী না থাকলে এগুলো আনুগত্য করেছে কেন? কোন কবি বলেছেন-

سلام اس پر کہ جس نے بیکسوں کی دستگیری کی
سلام اس پر کہ جس نے پادشاہی میں فقیری کی

অর্থাৎ ওই মহান সত্তার প্রতি সালাম, যিনি অসহায়দের সহায়তা দিয়েছেন, ওই মহান রসূলের প্রতি সালাম, যিনি বাদশাহ হওয়া সত্ত্বেও দরিদ্রের ন্যায় সাদাসিধে জীবন-যাপন করেছেন।
হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম প্রাণীকুলের ভাষা জানতেন। আর আমাদের মাহবূব আলায়হিস্ সালাম শুধু প্রাণী নয়; বরং পাথর ও কাঠের বুলিও জানতেন।

বনের হরিণ তাঁর দরবারে তার বিপদের কথা আরয করেছিলো। [দালা-ইলুল খায়রাত], উট তার মালিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে যে, তাকে পেট ভরে খাবার দেয় না, অথচ কাজ নেয় বেশী। (মিশকাত, আবূ দাউদ) হুযূর-ই আক্‌রাম এরশাদ করেন- আমি ওই পাথরকে চিনি, যে আমাকে আমার নুবূয়ত প্রকাশের পূর্বে সালাম করতো। (মিশকাত) উস্তনে হান্নানাহ্ হুযূর-ই আক্‌রামের বিচ্ছেদে কান্না করেছে। অতঃপর যখন হুযূর-ই করীম সেটাকে জড়িয়ে ধরেছেন, তখন সেটা আরয করেছিলো-

مسندت من بودم از من تا ختی - بر سر منبر تو مسند ساختی

অর্থাৎ আমি আপনার 'মসনদ' (মিম্বর) ছিলাম। অতঃপর আপনি আমার পরিবর্তে অন্য মিম্বরকে আপনার 'মসনদ' করেছেন। (এ বিচ্ছেদ আমার নিকট অসহনীয় জ্বালা সৃষ্টি করেছে। তাই আমি কাঁদছি।)

হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম তিন মাইল দূর থেকে পিঁপড়ার আওয়াজ শুনেছেন; কিন্তু ওই পবিত্র কান শরীফের উপর উৎসর্গ হই, যা আপন মহিয়সী মায়ের গর্ভে থাকাবস্থায় লওহ-ই মাহ্‌ফূযের উপর 'কলম' চালনার আওয়াজ শুনতে পেয়েছেন। হুযূর-ই আক্‌রামের ফয়যপ্রাপ্ত হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত সারিয়াকে মদীনা-ই পাক থেকে আহবান করেছিলেন। সুদূর নেহাওয়ান্দ থেকে হযরত সারিয়া ওই আহ্বান শুনেছিলেন। হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালামকে পিঁপড়া যুল্‌ম-অত্যাচার থেকে মা'সূম জেনেছে, আমাদের আক্বা ও মাওলা হুযূর আলায়হিস্ সালামকে প্রত্যেক সৃষ্টি মা'সূম বলে জানে। আর কেউ যুল্‌ম করলে তার বিরুদ্ধে ওই মযলূম অভিযোগ নিয়ে তাঁর মহান দরবারে হাযির হতো। এমনকি হুযূর-ই আক্‌রাম ও মুসলমানদের প্রাণের শত্রু ইহুদী প্রমুখও নিজ নিজ নালিশ নিয়ে সুবিচারের জন্য হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের দরবারে হাযির হতো। কারণ, তারাও জানতো যে, এ মহান দরবারে চুলচেরা সমাধান পাওয়া যায়। এখানে যুল্‌ম হয় না, বরং যুল্‌ম থেকে বাঁচানো হয়।

হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালামকে পিপড়া চিনেছে। আর আমাদের আক্বা ও মাওলাকে চন্দ্র, সূর্য, তারাগুলোও চিনতো। 'মিশকাত শরীফ' কিতাবুল হজ্ব: বাবুল হাদীতে আছে- বিদায় হজ্জে কিছু উট ক্বোরবানীর জন্য হুযূর-ই আক্‌রামের সামনে পেশ করা হলো। নিয়ম হচ্ছে যবেহের পূর্বক্ষণে পশুরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু এ উটগুলোর অবস্থা ছিলো এর বিপরীত। প্রত্যেকটা উট চাচ্ছিলো যেন হুযূর তাকে সর্বাগ্রে ক্বোরবানী দেন। ওইগুলো পরস্পর প্রতিযোগিতা করছিলো।

হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর গোলামদেরকেও

পশুরা চিনতো। 'মিশকাত শরীফ: কিতাবুল কারামাত'-এ আছে- হযরত সফীনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বন্দি হয়ে রোম সাম্রাজ্যের জেলখানায় আটকা পড়েছিলেন। হযরত ওমর ফারুক্বের খেলাফতকালে, তিনি জেলখানায় খবর পেলেন যে, ওই দেশে ইসলামী সৈন্যদল এসেছেন। তিনিও রাতের বেলায় একদিন সুযোগ পেয়ে জেল থানা থেকে পালিয়ে বের হলেন। কিন্তু রাস্তা জানা ছিলো না। তিনি জানতেন না ইসলামী সেনাবাহিনী কোন এলাকায় রয়েছেন। তবুও সম্মুখে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। একটি বাঘ পথ আগলে দাঁড়ালো। হযরত সফীনা বললেন, ''হে বাঘ! তুমি জানো যে, আমি রসূলে করীমের আযাদকৃত ক্রীতদাস। পথ ভুলে গেছি।'' বাঘটি একথা শুনামাত্র লেজ নাড়তে নাড়তে তাঁর সামনে আসলো এবং আগে আগে চলতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত তাকে ইসলামী সৈন্যদের নিকট পৌঁছিয়ে দিলো। এখানে দু'টি বিষয় লক্ষ্যণীয়: হযরত সফীনাকে বাঘটি চিনেছিলো। আর ইসলামী সেনাবাহিনীর ঈমানের খুশ্‌বু পেয়ে বনের এ বাঘটি তাঁদের ঠিকানা জানতে পেরেছিলো; যেভাবে কোন ঘরে উন্নতমানের খাবার তৈরি হলে সেটার খুশ্‌বু বাইরের লোকেরাও জানতে পারে। অতএব, একথা সুস্পষ্ট হলো যে, আমাদের আক্বার বাদশাহীই ব্যাপকতর।

বিশ্বনবীর অনুপম সহানুভূতি

আমার মতো দুঃখ ক্লিষ্ট নেই আর বিশ্বনবীর মতো সহানুভুতিশীল নেই

আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বনবী আমাদের আক্বা ও মাওলা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সমস্ত বিশ্ব ও বিশ্ববাসীদের জন্য রহমত করে পাঠিয়েছেন। সুতরাং তিনি সৃষ্টির সেরা মানব জাতির দুঃখ-দুর্দশা তো দূরীভূত করেছেন, ফরিয়াদী পশুর পর্যন্ত দুঃখ দূরীভূত করেছেন।

হযরত তামীম দারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, আমরা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দরবারে উপস্থিত ছিলাম। হঠাৎ এক উট দৌড়ে এসে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শির মুবারকের নিকটে দাঁড়িয়ে গেলো। (আর কিছু যেন আরয করলো।) হুযূর এরশাদ ফরমালেন, ''থামো, যদি তোমার কথা সত্য হয়, তবে তুমি সত্যের সুফল অবশ্যই পাবে, আর যদি মিথ্যা হয় তবে মিথ্যার কুফলও ভোগ করবে। এতদ্‌সত্ত্বেও এটাতো নিশ্চিত কথা যে, যে আমার আশ্রয়ে আসে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য নিরাপত্তা রেখেছেন। আর যে আমার নিকট কোন ফরিয়াদ নিয়ে এসেছে সে ব্যর্থতার মুখ দেখতে পায় না।''

আমরা আরয করলাম, ''এয়া রসূলাল্লাহ! এ উট কি আরয করছে?'' হুযূর বললেন, ''এর মালিকরা সেটাকে যবেহ করে খেয়ে ফেলতে চেয়েছিলো। সুতরাং সে ওখান থেকে পালিয়ে এসেছে। আর তোমাদের নবীর দরবারে প্রাণ রক্ষার জন্য ফরিয়াদ করছে।''

আমরা উপবিষ্ট ছিলাম। অপেক্ষা করছিলাম ঘটনাপ্রবাহ্ দেখার জন্য। দেখলাম উটটার মালিকগণ দৌঁড়াতে দৌঁড়াতে এসে হাযির। তাদেরকে দেখতেই উট আবার হুযূর-ই আক্রামের শির মুবারকের নিকটে এসে গেলো এবং হুযূর-ই আক্রামের আশ্রয় নিলো।

এবার মালিকগণ আরয করলো, ''এয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের উটটি আজ তিন দিন যাবৎ পলাতক। আজ আপনার নিকট পেয়েছি।'' হুযূর-ই আক্বদাস বললেন, ''দেখো! সেটা আমার নিকট নালিশ করেছে। অভিযোগও অতি জঘন্য।'' তারা আরয করলো, ''সেটা কি বলেছে?'' হুযূর বললেন, ''তার অভিযোগ হচ্ছে- সেটা আজ কয়েক বছর ধরে তোমাদের নিকট লালিত হয়েছে। সেটাও তোমাদের আনুগত্য করেছে। সেটা গরমের মৌসুমে তোমাদের মাল-সামগ্রী বহন করে দূর-দূরান্তরে যেতো, শীতের মৌসুমে এভাবে গরম স্থান পর্যন্ত সফর করতো। যখন সেটা বয়োঃপ্রাপ্ত হলো তখন তোমরা তার থেকে ষাঁড়ের কাজ নিয়েছো। আল্লাহ্ তা'আলা তার বীর্য থেকে অনেক উট পয়দা করেছেন, যেগুলো আজ তোমাদের মালিকানাধীন হয়ে চরে বেড়াচ্ছে। আজ যখন সেটা হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে এবং সেটার সুদিন এসেছে, তখন তোমরা সেটাকে যবেহ করে খেয়ে ফেলার পরিকল্পনা করেছো।'' তারা আরয করলো, ''এয়া রাসূলাল্লাহ্, আল্লাহরই শপথ! ঘটনা এটাই।'' হুযূর এরশাদ ফরমালেন, ''সৎ ও অনুগত মামলূকের প্রতি তার মালিক পক্ষের এমন আচরণ হওয়া উচিত নয়।'' তারা আরয করলো, ''এখন থেকে আমরা সেটাকে না বিক্রি করবো, না যবেহ করবো।'' হুযূর বললেন, ''তোমরা ভুল বলছো। সেটা (অবস্থার ভাষায়) তোমাদের নিকট ফরিয়াদ করেছে, কিন্তু তোমরা তা শুনোনি। এখন আমি তোমাদের চেয়ে এরই বেশী উপযোগী যে, তার ফরিয়াদ শুনবো ও তার প্রতি দয়াপরবশ হবো। আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিক্বদের অন্তর থেকে দয়া-মায়া বের করে নিয়েছেনঃ এটা (দয়া-মায়া) তো মু'মিনদের মধ্যেই রয়েছে।

সুতরাং হুযূর-ই আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম উটটা তাদের নিকট থেকে একশ' দিরহামের বিনিময়ে কিনে নিলেন এবং সেটার উদ্দেশে বললেন, ''হে উট, চলে যাও! তুমি আল্লাহ্ আয্যা ওয়াজাল্লার ওয়াস্তে আযাদ।'' এটা শুনে উটটা হুযূর-ই আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে তার ভাষায় কিছু আরয করলো। হুযূর-ই আক্বদাস বললেন, ''আ-মী-ন।'' (হে আল্লাহ কবূল করো!) সেটা দ্বিতীয়বার কিছু বললো, ''হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম 'আ-মী-ন' বললেন। তৃতীয়বারও সে কিছুটা বললো। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আবার আ-মী-ন বললেন। সেটা চতুর্থবারও কিছু বললো। হুযূর-ই আক্রাম এবার কেঁদে ফেলেছেন। সাহাবা-ই কেরাম আরয করলেন, এয়া রাসূলাল্লাহ্! ''সেটা কি

বলছিলো?'' হুযূর এরশাদ ফরমালেন, সেটা প্রথমবারে বললো, ''হে আল্লাহর নবী! মহামহিম আল্লাহ্ হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ইসলাম ও ক্বোরআনের জন্য উত্তম প্রতিদান দিন!'' আমি 'আ-মী-ন' বললাম। তারপর সেটা বললো, ''আল্লাহ্ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিনে হুযূরের উম্মত থেকে ভয়-ভীতি দূর করে দিন, যেভাবে হুযূর আলায়হিস্ সালাম আমার ভয়-ভীতি দূর করে দিয়েছেন।'' আমি বললাম, ''আ-মী-ন।'' তারপর সেটা বললো, ''আল্লাহ্ তা'আলা হুযূর আলায়হিস্ সালাম-এর উম্মতের রক্তকে তাদের দুশ্মনদের হাত থেকে নিরাপদ রাখুন!'' (তারা যেন তাঁদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে না পারে) যেভাবে হুযূর আমার রক্তকে রক্ষা করেছেন।'' আমি বললাম, ''আ-মী-ন''। শেষবারে বললো, ''আল্লাহ্ তা'আলা হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর উম্মতের নির্দয়তা ও কঠোরতা তাদের পরস্পরের মধ্যে যেন না রাখেন!'' এর উপর আমার কান্না এসেছে। আমি আমার রব তাবারাকা ওয়া তা'আলার দরবারে প্রথমোক্ত তিনটি বিষয় চেয়েছি। তিনি আমাকে সেগুলো দান করেছেন। কিন্তু সর্বশেষ দো'আটি করতে আমাকে নিষেধ করেছেন। [কান্যুল ওম্মাল]

রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর এ মহা-বদান্যতার ভিত্তিতে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন-

مجھ سا کوئی غمزدہ نہ ہو گا-تم سا نہیں غمگسار آقا

অর্থাৎ আমার মতো দুঃখক্লিষ্ট হবে না, আর হে আক্বা (মুনিব)! আপনার মতো সহানুভূতিশীল নেই। (সুতরাং আমার সব দুঃখ দূর করে দিন!) [হাদাইক্বে বখশিশ]

শাহানে ইসলাম যে মহান নবীর প্রতি ক্বোরবান!

অনেক বড় বড় বাদশাহর ইতিহাস থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা নবী-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নাম-ই পাক শুনতেই তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য সহকারে আদব প্রদর্শন করেছেন। সুলতান মাহমূদ গযনবী, বাদশাহ্ আওরঙ্গযেব ও বাদশাহ্ হারূন রশীদ প্রমুখের ঘটনাবলী এর পক্ষে উজ্জ্বল স্বাক্ষর। নিম্নে সুলতান মাহমূদ গযনবীর কয়েকটা ঘটনা পেশ করার প্রয়াস পেলাম-

ক. রসূলে পাকের প্রতি এ কেমন আদব!

বিশ্ব বিখ্যাত তাফসীরকারক আল্লামা ইসমাঈল হক্কী আলায়হির রাহমাহ্ বলেন, সুলতান মাহমুদ গযনবী আলায়হির রাহমাহর উজির আয়াযের পুত্রের নাম ছিলো 'মুহাম্মদ'। একবার সুলতানের ওযূর প্রয়োজন হলো। সুতরাং তিনি ডেকে বললেন, ''আয়াযের পুত্র! আমার জন্য পানি আনো!'' আয়াযও এটা শুনতে পেলেন আর চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি ভাবলেন, 'জানিনা আমার পুত্রের কী

ভুল হয়েছে, সুলতান আজ তার নাম না নিয়ে 'আয়াযের পুত্র' বলে ডাকলেন!' ওযূর পর সুলতান আয়াযকে দুঃখিত ও চিন্তিত দেখে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তখন আয়ায বললেন, "আজ আপনি আমার পুত্রের নাম ধরে ডাকেন নি। তাই আমি মহা চিন্তায় পড়েছি। তার দ্বারা কোন ত্রুটি হয়ে গেলো কিনা!" সুলতান মুচকি হেসে বললেন, "আপনি দুঃখিত হবেন না। আপনার পুত্রের নাম এজন্য মুখে উচ্চারণ করিনি যে, তখন আমার ওযূ ছিলো না। ওযূবিহীন অবস্থায় এ মুবারক নাম (মুহাম্মদ) মুখে উচ্চারণ করতে আমার লজ্জা অনুভূত হয়েছে। এজন্য 'আয়াযের পুত্র' বলে ডেকেছি।" সুবহানাল্লাহ

[রুহুল বয়ান: পারা ২২, তাফসীর-আয়াতে সালাত: সপ্তম খণ্ড, পৃ. ২:৩৩৪]

খ. সুলতান মাহমূদের দৈনন্দিন আমল

সুলতান মাহমূদ গযনবী আলায়হির রাহমাহ্ একবার দরবারে উপস্থিত লোকদের উদ্দেশে বললেন, "যে ব্যক্তি এ দুরূদ শরীফ একবার পড়লো সে যেন দশ হাজার বার দুরূদ শরীফ পড়লো। সুতরাং আমি তিনবার রাতের প্রথমভাগে এবং তিনবার শেষ রাতে ওঠে এ দুরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে পড়ে থাকি। এভাবে আমি দিনে ষাট হাজার দুরূদ শরীফ হিসাব করে থাকি। দুরূদ শরীফটা হলো-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَااخْتَلَفَ الْمَلَوَانِ وَتَعَاقَبَ الْعَصْرَانِ وَكَرَّ الْجَدِيْدَانِ وَاسْتَقَلَّ الْفَرْقَدَانِ وَبَلِّغْ رُوْحَهٗ وَاَرْوَاحَ اَهْلِ بَيْتِهٖ مِنَّا اَلتَّحِيَّةَ وَالسَّلَامَ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ كَثِيْرًا

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা সল্লি 'আলা- সাইয়্যিদিনা- মুহাম্মাদিন মাখ্তালাফাল মালাওয়ান, ওয়া তা'আক্বাবাল 'আস্‌রান, ওয়া কার্‌রাল জাদী-দা-ন, ওয়াস্‌তাক্বাল্লাল ফারক্বাদা-ন। ওয়া বাল্লিগ রূ-হাহূ- ওয়া আরওয়া-হা আহলি বায়তিহী মিন্নাত্ তাহিয়্যাতা ওয়াস্ সালা-ম ওয়া বা-রিক ওয়া সাল্লিম 'আলায়হি কাসী-রান। [রুহুল বয়ান: ৭ম খণ্ড: পৃ. ৩৩৪]

এক অনন্য পুরস্কার

সুলতান মাহমূদ আলায়হির রাহমাহ্‌র ইশক্বে রসূল ও হুযূর মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কারণে রসূলে পাকের মহান দরবারে তাঁর বড় গ্রহণযোগ্যতা ও মর্যাদা ছিলো। এ কথা নিম্নলিখিত ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয়-

এক সৌভাগ্যবান ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখে ধন্য হলেন। লোকটি আরয করলেন, "এয়া রাসূলাল্লাহ! আমার উপর হাজার দিরহাম ঋণ (কর্জ) আছে, যা পরিশোধ করার সামর্থ্য আমার নেই। আমার ভয় হচ্ছে- এ কর্জ পরিশোধ করা ব্যতিরেকেই আমার মৃত্যু হয়ে যায় কিনা!"

হুযূর-ই আক্‌রাম এরশাদ করলেন, "মাহমূদের নিকট যাও! তাকে বলো এবং তার নিকট থেকে এ অংকের অর্থ নিয়ে কর্জ পরিশোধ করে দাও!" লোকটি এবার আরয করলেন, "এয়া রাসূলল্লাহ! তিনি যদি আমার কথা বিশ্বাস না করেন এবং আমার নিকট কোন আলামত তলব করেন তখন কি করব?" হুযূর-ই পাক এরশাদ করলেন, "এর নিশানা (প্রমাণ) হিসেবে এটা বলো, "সে রাতের প্রথম ভাগে ত্রিশ হাজারবার ও রাতের শেষ ভাগে জাগ্রত হয়ে ত্রিশ হাজার বার দুরূদ শরীফ পাঠ করে।"

সুতরাং লোকটি যখন সুলতান মাহমূদের দরবারে হাযির হয়ে এ বরকতময় স্বপ্ন বর্ণনা করলেন, তখন সুলতান মাহমূদ আনন্দে কেঁদে ফেললেন। তিনি তাঁকে এক হাজার দিরহাম কর্জ পরিশোধের জন্য এবং আরো এক হাজার দিরহাম অতিরিক্ত দান করলেন। এটা শুনে ওলামা- কেরামও এ ঘটনার সত্যায়ন করলেন। সুতরাং এটাও নিশ্চিত হলো যে, এ দুরূদ শরীফ দশ হাজার বার দুরূদ শরীফের সমান মর্যাদা রাখে। [তাফসীর-ই রূহুল বয়ান ইত্যাদি]

হায়াতুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র ওফাতোত্তর মু'জিযাদি

'মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়াহ্' প্রণেতা লিখেছেন, আল্লামা ক্বোশায়রী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বর্ণনা করেছেন, তাঁর সাহিবযাদা (পুত্র) অতিমাত্রায় অসুস্থ হয়ে পড়লো। একেবারে মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে গেলো। পরিবারের সবাই হতাশ হয়ে পড়েন। তিনি বলেন, তখন আমি আমার আক্বা ও মাওলা হুযূর করীম রঊফুর রহীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখলাম। আমি হুযূর করীমের মহান দরবারে আমার সন্তানের অসুস্থতার কথা আরয করলাম।

হুযূর পুরনূর শাফী'ই ইয়াওমিন নুশূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমালেন, "আয়াতে শিফা সম্পর্কে কেন বে-খবর হয়ে আছো?" আমার চোখ খুলে গেলো। আমি 'আয়াতে শিফা' লিখে ধুয়ে শিশুটিকে পান করালাম। সুবহানাল্লাহ! এরপর শিশুকে এমনই সুস্থ দেখলাম যেন তার কোন রোগই ছিলো না। শিফার আয়াতগুলো নিম্নরূপ:

১. **وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ**

২. **وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ** م

৩. **يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَاشَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ**

৪. **وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَاهُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ**

৫. **وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ**

৬. قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ

[শরহে ক্বসীদাহ্-এ বুরদাহ্ : আল্লামা খরপূতী : পৃষ্ঠা-১৪৬]

হযরত আবূ বক্র রাযী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেন, আমি ইস্পাহানে আবূ নু'আয়মের নিকট ছিলাম। এক ব্যক্তি বললো, আবূ বকর ইবনে আলী সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন এবং বন্দী হয়েছেন। অতঃপর আমি স্বপ্নে দেখলাম- হুযূর সরকার-ই আলামীন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ রেখেছেন (সদয় হাযির আছেন), আর সাইয়্যেদুনা হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম হুযূর করীমের ডান পাশে আছেন। হুযূর-ই আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন নূরানী ওষ্ঠযুগল নেড়ে কোন তাসবীহ পাঠ করছিলেন। অতঃপর হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাকে এরশাদ ফরমালেন, আবূ বকর ইবনে আলীকে বলো যেন সে দু'আ-ই কারব, যা বোখারী শরীফে আছে, তা পাঠ করে। আর যেন ততক্ষণ পর্যন্ত পড়তে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা তার বিপদ দূরীভূত করে দেন। ভোর হতেই আমি তাকে বললাম। তিনি ওই দু'আ পড়লেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি মুক্ত হয়ে চলে আসলেন। দু'আটি নিম্নরূপ:

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ .

[শরহে ক্বসীদাহ্-ই বোরদাহ্ : আল্লামা খরপূতী : পৃষ্ঠা ১৪৬]

আল্লামা খরপূতী তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন- আমাদের যুগেও এমন একটি ঘটনা ঘটেছে। আর তা হচ্ছে আমাদের ওস্তাদের স্ত্রী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। এমনভাবে আক্রান্ত হন যে, রাতে ও দিনের কোন মুহূর্তেই শান্তি ও স্বস্থি বোধ করছিলেন না। সবসময়ই আর্তচিৎকার করছিলেন। আর তাঁর আর্তচিৎকারে প্রতিবেশীরাও বিরক্ত হয়ে যাচ্ছিলো। চিকিৎসকরাও বহু ঔষধ সেবন করালেন। কিন্তু কোন ফল হয় নি।

অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, "আমার পক্ষ থেকে আরজনামা রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মহান দরবারের প্রতি লিখেন এবং তাতে এ রোগ থেকে আরোগ্য কামনা করেন।" সুতরাং আমি দরখাস্তখানা লিখলাম এ ভাবে-

প্রথমে আমি সালাত ও সালাম লিখলাম। অতঃপর আমার উদ্দেশ্য লিখলাম। আর হাজ্বীরা, যাঁরা হজ্জে যাচ্ছিলেন, তাঁদের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিলাম। আমরা দিন গুণতে থাকলাম। এমনকি যেদিন হাজ্বীগণ মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছলো, ওই দিন থেকে তাঁর আর্তচিৎকার বন্ধ হয়ে গেলো। আর একেবারে সুস্থ হয়ে গেলেন ।[শরহে ক্বসীদাহ্-ই বোরদাহ্ : আল্লামা খরপূতী : পৃষ্ঠা ১৪৬]

বৃক্ষ শাহানশাহে রিসালাতের নির্দেশ পালন করছে

সাইয়্যেদুনা হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ফখরে কা-ইনা-ত সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দরবারে সাইয়্যেদুনা হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম হাযির হলেন। তখন হুযূর-ই আকরাম কিছুটা চিন্তিত ছিলেন। মক্কাবাসীদের অশালীনতা প্রদর্শনের কারণে তিনি রক্তাক্ত হয়েছিলেন। হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম আরয করলেন, "এয়া রসূলাল্লাহ্! আপনি যদি পছন্দ করেন তাহলে আমি একটি নিদশ্ন (মু'জিযা) দেখাবো (যাতে আপনি মনে প্রশান্তি অনুভব করেন)।" হুযূর এরশাদ করলেন, "হ্যাঁ"। সাইয়্যেদুনা জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম একটি গাছ দেখতে পেলেন, যা তাঁর পেছনে দণ্ডায়মান ছিলো। তিনি আরয করলেন, "আপনি এটাকে ডাকুন!" হুযূর-ই আকরাম ডাকলেন। তখনই গাছটি (মাটির বুক চিরে) এসে হুযূর-ই করীমের সামনে এসে দাঁড়ালো। সাইয়্যেদুনা হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম আরয করলেন, "এখন আপনি সেটাকে ফিরে যেতে বলুন।" হুযূর-ই আকরাম সেটাকে ফিরে যেতে নির্দেশ দিলেন। তখনই সেটা (গাছটি) ফিরে গেলো। রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "এটা আমার জন্য যথেষ্ট; এটা আমার জন্য যথেষ্ট।"

[ইমাম দারিমী বর্ণনা করেছেন, মিশকাত শরীফ : পৃষ্ঠা-৫৪১]

এ মহান মু'জিযা ইমাম বূসীরী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি তাঁর ক্বসীদাহ্-ই বোর্দা শরীফে এভাবে বলেছেন-

جَآءَتْ لِدَعْوَتِهِ الْاَشْجَارُ سَاجِدَةً تَمْتَشِىْ اِلَيْهِ عَلٰى سَاقٍ بِلَا قَدَمٍ

অর্থাৎ: বৃক্ষ হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁর দিকে আপন কাণ্ডের উপর ভর করে চরণ ব্যতীত চলে এসেছে।

বোত প্রতিমাগুলো মুখের উপর ভর করে লুটিয়ে পড়েছিল

মক্কা বিজয়ের পর সৃষ্টিকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হেরম শরীফে তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং একটি খোৎবা এরশাদ ফরমালেন। যাতে হুযূর-ই আকরামের অনুগ্রহ, বদান্যতা, দয়া ও ভালবাসার চমৎকার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিলো। তখনো বায়তুল্লাহ্ শরীফে স্থাপিত মক্কার কাফিরদের ৩৬০টি বোত্ ছিল। তখন বায়তুল্লাহ্ শরীফ শুধু আল্লাহ্ তা'আলারই ইবাদতের জন্য খাস হয়ে যাওয়া এবং মূর্তিপূজারীদের মূর্খতা যেসব বোত্ নিজেদের হাতে গড়েছিলো সেগুলোর উপাদানগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবার সময় এসে পড়েছিলো। সুতরাং মাদানী চাঁদ হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন হাত মুবারকের ছড়ি মুবারক দ্বারা ওই বোত্গুলোর দিকে ইশারা করছিলেন। শুধু ইঙ্গিতই, স্পর্শ করেন নি। অমনি বোত্গুলো মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ছিলো। তখন হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি

ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র মুখে নিম্নলিখিত আয়াত শরীফ ধ্বনিত হচ্ছিলো-

جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا

(সত্য সমাগত, মিথ্যা অপসৃত; মিথ্যা তো অপসৃত হবারই)

দেখতে দেখতে কা'বা-ই মু'আয্যমায় স্থাপিত ৩৬০টি মুর্তি মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিলো। [শেফা শরীফ : পৃষ্ঠা ২০৩]

কবি বলেন-

تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا
تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا

অর্থাৎ: হে আল্লাহর হাবীব! আপনি তাশরীফ আনতেই খোদ বায়তুল্লাহ্ আপনাকে অভিবাদন জানাতে ঝুঁকে পড়েছে। আপনার ভক্তিপ্রযুক্ত ভয়ের এমনই শান ছিল যে, প্রতিটি বোত্ থরথরিয়ে কেঁপে উঠেছে ও মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে।

পর্বতমালা ও বৃক্ষরাজি সালাম পেশ করেছে

ইমাম তিরমিযী ও দারিমী সাইয়্যেদুনা হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হযরত আলী মুরতাদ্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন, আমি সৃষ্টিকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মক্কা মু'আয্যমায় ছিলাম। আমরা মক্কা মুকাররামার বাইরে একদিকে পথ অতিক্রম করছিলাম-

فَمَااسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَّلَاشَجَرٌ اِلَّا وَهُوَ يَقُوْلُ
'اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه'.

অর্থাৎ: হুযূর করীমের সামনে যেই পাহাড় কিংবা বৃক্ষ এসেছে, প্রত্যেকটি আরয করছে 'আস্ সালামু আলায়কা এয়া রসূলাল্লাহ্!' [মিশকাত শরীফ : পৃষ্ঠা ৫৪০]

কবি বলেন-

ان پر درود جن کو حجر تک سلام کریں
ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے

অর্থাৎ ওই মহান রসূলের পবিত্র দরবরে দুরূদ শরীফের হাদিয়া নিবেদন করছি, যাঁকে পাথরও সালাম করে। তাঁর মহান দরবারে সালাম নিবেদন করছি, যাঁকে বৃক্ষরাজিও অভিবাদন জানায়।

রওযা-ই আনওয়ার 'আরশ' অপেক্ষাও উত্তম

আল্লাহর মাহবূব বান্দাগণ, বিশেষ করে আল্লাহর সর্বাধিক প্রিয় মাহবূব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে যার সম্পর্ক হয়ে যায় তা মর্যাদাবান হয়ে যায়। এ কারণে মক্কা মুকাররামাহ্ ও মদীনা মুনাওয়ারার ফযিলত ও মর্যাদা দুনিয়া, বরং সমগ্র সৃষ্টি জগতে সবচে বেশি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর রওযা-ই আক্বদাস একই কারণে আরশ-ই আ'যম অপেক্ষাও উত্তম।

মক্কা মু'আযযামাহর ফযিলত

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র ক্বোরআনে মক্কা নগরীর শপথ করেছেন। কোন স্থান, কাল বা পাত্রের নামে আল্লাহ্ তা'আলা শপথ করলে ওই স্থান কাল বা পাত্রের মহা মর্যাদাই প্রকাশ পায়। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ ফরমান-

لَا اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ـ وَاَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ ـ وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ

তরজমা: ১. আমার এ শহরের পশথ, ২. যেহেতু হে মাহবূব! আপনি এ শহরে তাশরীফ রাখছেন, ৩.এবং আপনার (পূর্ব পুরুষ) ইব্রাহীমের শপথ এবং তাঁর বংশধরের, অর্থাৎ আপনার শপথ। [সূরা বালাদ: আয়াত-১-৩, কানযুল ঈমান]

এ আয়াত শরীফে হুযূর-ই আনওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর স্পষ্ট ভাষায় প্রশংসা করা হয়েছে। এতে এরশাদ হয়েছে যে, হুযূর-ই আক্বরামের সাথে যারই সম্পর্ক হয়েছে সেটাও মর্যাদাবান হয়ে গেছে। এ আয়াত শরীফ হিজরতের পূর্বে নাযিল হয়েছে। এ আয়াতে মক্কা নগরীর শপথ করা হয়েছে। কেন? এজন্য যে, ওখানে আল্লাহর হাবীব আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম অবস্থান করছিলেন। এতে একথা স্পষ্ট হলো যে, এ শহর (মক্কা শরীফ) এর মর্যাদা আল্লাহর মাহবূব-ই আক্বরামের কারণেই অর্জিত হয়েছে। কারণ মক্কা মুকাররমারতো আরো বহু ফযিলত রয়েছে। যেমন: ১. সেটাকে হযরত ইব্রাহীম খলীল আলায়হিস্ সালাম আবাদ করেছেন এবং তিনি এটার জন্য দো'আ করেছেন। ২. হযরত ইসমাঈল আলায়হিস্ সালাম এ শহরে লালিত হয়েছে। ৩. সেখানে আল্লাহর ঘর রয়েছে, যা সমগ্র দুনিয়ার ক্বেবলা, সেটার অবস্থান 'বায়তুল মা'মূরের' সোজাসুজি। ৪. শেষ যমানার নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থান স্থল। লক্ষ্যণীয় যে, প্রথমোক্ত তিনটি বৈশিষ্ট্যতো মক্কা মুকাররামার মধ্যে হিজরতের পরও মওজুদ রয়েছে। কিন্তু চতুর্থটি থাকেনি। সুতরাং আয়াতগুলোতে এরশাদ হয়েছে যে, এ শহরের শপথ করা প্রথমোক্ত কারণগুলোর ভিত্তিতে নয়, বরং মাহবূব সাল্লাল্লাহু তা'আলা

আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কদম শরীফের বরকতের পরিপ্রেক্ষিতেই।

এখন দেখুন মদীনা মুনাওয়ারায় রওযা-ই আক্বদাসের শান! হুযূর-ই আকরাম-এর রওযা-ই আক্বদাসের ওই অংশ, যা হুযূর-ই আক্বদাসের শরীর মুবারকের সাথে লেগে আছে, তা খানা-ই কা'বা ও আরশ-ই আ'যম অপেক্ষাও বেশি ফযিলত মণ্ডিত। সম্মানিত ফক্বীহ্গণও একথার উপর ঐক্যমত্য পোষণ করেছেন। [ফাতওয়া-ই শামী: কিতাবুল হজ্জ এবং 'মাদারিজুন্ নুবূয়ত ইত্যাদি দ্রষ্টব্য]

এ মর্মেও তাদের ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, খানা-ই কা'বা মদীনা মুনাওয়ারার বস্তি অপেক্ষা উত্তম, যদিও এমর্মে মতবিরোধ রয়েছে। মক্কা নগরী, মদীনা মুনাওয়ার নগরী অপেক্ষা উত্তম। কেননা, সেখানে হজ্ব হয়, সেখানে প্রত্যেক নেক কাজের সাওয়াব একলক্ষের সমান, মদীনা মুনাওয়ারার প্রত্যেক নেক কাজের সাওয়াব পঞ্চাশ হাজারের সমান। তাছাড়া মক্কা মুকাররামাহ্ হযরত খলীলুল্লাহ্ আলায়হিস্ সালাম আবাদ করেছেন এবং তিনি সেটার জন্য দো'আ ও করেছেন। কিন্তু হযরত ইমাম মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন, মদীনা তাইয়্যেবাহর নগরী মক্কা মু'আযযামা শহর অপেক্ষা উত্তম। নসীমুর রিয়ায ও কাযী আয়াযের শিফা শরীফে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন।

ইমাম মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর উপর উক্ত অভিমতের পক্ষে যেসব দলিল পেশ করেছেন সেগুলো হচ্ছে- ১. সূরা বালাদের এ আয়াত **لَا اُقْسِمُ** এ থেকে বুঝা গেলো যে, হুযূর-ই আকরাম যেখানে তাশরীফ রাখেন ওই স্থান শ্রেষ্ঠ। সুতরাং হিজরতের পূর্বে মক্কা-ই মু'আযযামাহ্ শ্রেষ্ঠ ছিলো, আর হিজরতের পর মদীনা মুনাওয়ারাহ্ উত্তম হয়েছে। ২. মক্কা মুকাররামাহ্য় ফারশ বা যমীনবাসীদের হজ্ব সম্পন্ন হয়, আর মদীনা মুনাওয়ারাহ্ হয় আরশবাসী ফিরিশতাদের হজ্ব সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ সত্তর হাজার ফিরিশতা সকালে আর সত্তর হাজার বিকালে রওযা-ই পাকে হাজির হন। আর রওযা পাককে ঘিরে সালাতুও সালাম পড়েন। [মিশকাত শরীফ, কারামাত অধ্যায়]

তাছাড়া, মক্কা মুকার্রামাহয় হজ্ব হয় বছরে একবার, কিন্তু মদীনা-ই মুনাওয়ারায় ফিরিশতাদের হজ্ব প্রতিদিনই সকাল থেকে সন্ধা পর্যন্ত, সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত সুসম্পন্ন হয়। মক্কা মুকাররামায় একটি নেকীর সাওয়াব এক লক্ষ হয়, কিন্তু প্রত্যেক পাপকাজের গুনাহ্ও এক লক্ষ হয়। আর মদীনা মুনাওয়ারায় প্রত্যেক নেক কাজের সাওয়াব তো পঞ্চাশ হাজার হয়, কিন্তু প্রতি পাপ কাজের গুনাহ্ হয় শুধু একটা। তাও যদি বাকী থাকে আশাতো এটাই করা যায় যে, হুযূর আকরামের সুপারিশের ফলে তাও মাফ হয়ে যাবে।

আর যা বলা হয়েছে যে, মক্কা মুকাররামায় প্রত্যেক নেকীর সাওয়াব এক লক্ষ, আর মদীনা মুনাওয়ারায় পঞ্চাশ হাজার, তা তো সাওয়াবই, কিন্তু আল্লাহর মহান

দরবারে গ্রহণযোগ্যতা (মাক্ববূলিয়াত)-এর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, মদীনা-ই পাকের একেক রাক'আত মক্কা মুকাররামার পঞ্চাশ হাজার রাক'আতের সমান। তাছাড়া মক্কা মুকাররামাহ্ আবাদ করেছেন হযরত খলীলুল্লাহ্ আলায়হিস্ সালাম, কিন্তু মদীনা মুনাওয়ারাহ্ আবাদ করেছেন, হাবীবুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। মক্কা মুকাররামার জন্য দো'আ করেছেন হযরত খলীলুল্লাহ্ আলায়হিস্ সালাম, কিন্তু মদীনা মুনাওয়ারার জন্য দো'আ করেছেন হযরত হাবীবুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। তা হচ্ছে- ''হে আল্লাহ্! মদীনা মুনাওয়ারায় মক্কা মুকাররামার দ্বিগুণ বরকত ও রহমত নাযিল করো।'' মক্কা মকাররামায় অবশ্য খানা-ই কা'বা, মক্বাম-ই ইব্রাহীম, আবে যমযম, মিনা ও মুযদালিফাহ্ ইত্যাদি রয়েছে। কিন্তু মদীনা মুনাওয়ারায় ওই দুলহা রয়েছেন, যাঁর বরযাত্রী হলেন এ সবই। কবি বলেন-

ہوتے کہاں خلیل وبنا کعبہ ومنی لولاک والے صاحبی سب تیر گھر کی ہے

অর্থাৎ: যদি মদীনা মুনাওয়ারার দুলহা না হতেন, তবে না খলীলুল্লাহ্ হতেন, না কা'বা, না আরাফাত, না মিনা হতো।

আর লক্ষ্যণীয় যে, কা'বা মুআয্যামার প্রতিটি জিনিস কালো বর্ণের কা'বা শরীফের পাথর, কা'বা মু'আযযামার গিলাফ, কালো পাথর, মোট কথা সবকটি কালো বর্ণের। আর মদীনা-ই পাকের প্রতিটি জিনিস সবুজ বর্ণের। সমগ্র মদীনা-ই পাকের যমীনে সবুজের ছড়াছড়ি। রওযা-ই পাকের গম্বুজ শরীফের রং সবুজ এবং গিলাফ শরীফ সবুজ। কালো রং হয় বিদায় বিচ্ছেদের বেলায়, আর সবুজ রং হয় মিলনের বেলায়। মদীনা-ই পাকে দু'জাহানের দুলহার সাথে মিলন হয়েছে আর কা'বা মু'আযযামায় দু'লহার বিদায়-বিষাদ ঘটেছে। মসনবী শরীফে এ প্রসঙ্গে রয়েছে-

گفت معشوقے بعاشق الی فتی - تو بغیرت دیدہ بس شہرہا

پس کدامے لال بنا ہا خوشتر است - گفت شہر لے کہ دروئے دلبر است

অর্থাৎ: কোন মা'শূক (প্রেমাস্পদ) তার আশিক্ব (প্রেমিক)কে জিজ্ঞাসা করলো- তুমি কি জল ও স্থলভাগে ভ্রমণ করেছো? বলো ওই গুলোতে কোন শহরটি উত্তম। সে বললো, ''ওই শহরই উত্তম, যাতে মাহবূব রয়েছে।''

মদীনা মুনাওয়ারার খাক শরীফ উভয় জাহান অপেক্ষা উত্তম। কেননা, এখানে আপন মাহবূব অবস্থান করছেন। যদিও কাশ্মীর ও প্যারিস দু'টি খুব সুন্দর এলাকা, কিন্তু মহান রবের চয়নের দৃষ্টি ওই ভূখণ্ডের দিকে নিবদ্ধ হয়েছে, যাতে মদীনা মুনাওয়ারা রয়েছে। ওই ভূ-খণ্ডের উপর লাখো কাশ্মীর উৎসর্গ হয়।

একটি অতি মজার কথা আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী বলেন-

غور سے سن تو رضا کعبہ سے اتی ہے صدا
میری انکھو سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو

অর্থাৎ: খানা-ই কা'বার ছাদে শোভা পাচ্ছে 'মীযাব-ই রহমত' (পয়:প্রণালী) সেটা মদীনা মুখী তো বটে, কিন্তু একেবারে রওযা-ই আক্বদাসের সোজাসুজি। উদাহরণ স্বরূপ, কারো দোকান বা ঘর যদি গলির ভিতর হয়, তবে গলির মুখে একটি অৎৎড়ি গধৎশ (তীর চিহ্ন) অংকিত করে ফলক স্থাপন করা হয়। আর সেটার গায়ে লিখে দেওয়া হয়, অমুক দোকান কিংবা অমুকের ঘর সামনে, এদিকে চলে যান।'' সুতরাং এখানেও কা'বার ছাদের ওই পয়ঃপ্রণালীও যেন একটি পথ নির্দেশক তীরফলক, যা তার ভাষায় বলে দিচ্ছে ''ওহে হাজী সাহেবান! হজ্জ তো করেছেন, কিন্তু ওই হজ্জ ক্ববুল করানোর জন্য 'শাফীউল মুযনীবীন' (গুনাহগারদের জন্য মহান সুপারিশকারী)'র পবিত্র দরবারে চলে যান! দেখুন, তিনি ওই সবুজ গম্বুজে আরাম ফরমাচ্ছেন। সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

উপরোল্লিখিত সূরা শরীফের তৃতীয় আয়াত ووالد وما ولد এও শানে রিসালত (রসূলে করীমের মর্যাদা) প্রকাশ পাচ্ছে। তাফসীর-ই রূহুল বয়ান'এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, ولد (পিতা) মানে হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম, আর ولد (পুত্র) মানে হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। অর্থাৎ ওই পিতা ও তাঁর পুত্রের শপথ; অথবা পিতা, মানে হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম, আর পুত্র মানে 'হুযূর-ই আকরামের উম্মত। যেমন হাদীস শরীফে খোদ হুযূর-ই আকরাম এরশাদ করেছেন- ''হে মুসলমানগণ! আমি তোমাদের পিতার মতো।'' এ কারণে হুযূর-ই আকরামের পবিত্র বিবিগণ মু'মিনদের মা হন। অথবা 'পিতা' মানে হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম, আর 'পুত্র' মানে 'হুযূর-ই করীমের 'আহলে বায়ত' (পরিবার-পরিজন), অর্থাৎ আওলাদ-ই পাক। এ থেকে হুযূর-ই আকরামের বংশ শরীফের মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে 'কিয়ামতের দিন কোন বংশ ও কোন সম্বন্ধ কাজে আসবে না, আমার বংশ ও শ্বশুরালয় সম্পর্কিত আত্মীয় ব্যতীত। [সূত্র: ফাতাওয়া-ই শামী, ১ম খণ্ড]

এ কারণে হযরত ওমর ফারুক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত ফাতিমা যাহরার সাহেবযাদী 'উম্মে কালসূমকে শাদী করেছিলেন, যাতে দু'ভাবে সম্পর্ক হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের সাথে হয়। এক হুযূর করীমের শ্বশুর, দুই. হযরত ফাতিমা যাহরার জামাতা।

কিয়ামতের ময়দানে

ক্বিয়ামতের ময়দানে যমীন এমন উত্তপ্ত হবে, যেন তা জ্বলছে। সূর্যের তাপ এতো বেশি হবে যে, তা কল্পনাও করা যায় না। এমনি মুহূর্তে হুযূর পুরনূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হাশরের ময়দানে তাশরীফ আনবেন। অথচ দুনিয়ায় হুযূর পুরনূরের ছায়া ছিলো না, কিন্তু হাশরের ময়দানে তিনি সমস্ত উম্মতকে আপন দয়া ও স্নেহের ছায়ায় ঢেকে নেবেন। হাশরের ময়দানের এমন অবস্থাকে চিত্রায়িত করে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী আলাইহির রাহমাহ্ তাঁর 'হাদাইক্বে বখশিশ্'-এ লিখেছেন-

جلتی تھی زمین کیسی تھی دھوپ کڑی کیسی
لووہ قد بے سایہ اب سایہ کناں آیا

অর্থাৎ: (হাশরের ময়দানে) যমীন অতিমাত্রায় উত্তপ্ত হবে, সূর্যের তাপ হবে অতিমাত্রায় তেজোদ্দীপ্ত, (হাশরবাসীদের এমনই সংকটপূর্ণ মুহূর্তে তাদেরকে (বিশেষত উম্মতকে) বাঁচানোর জন্য হাশরের ময়দানে তাশরীফ আনবেন হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। দুনিয়ায় তো হুযূরের ছায়া ছিলো না, কিন্তু হাশরের ময়দানে তিনি সমস্ত উম্মতকে আপন দয়া ও স্নেহের ছায়ার নিচে আশ্রয় দেবেন।

আ'লা হযরতের অনুকরণে অপর এক উর্দু কবি লিখেছেন-

ہر نظر کانپ اٹھیگی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دھل جائیگا
مسکراتے ہوئے آپ آجائینگے سارے محشر کا نقشہ بدل جائیگا

অর্থাৎ : হাশরের দিনে প্রতিটি দৃষ্টি কেঁপে উঠবে, স্থির থাকবে না। ভয়ের পানিতে প্রতিটি কলিজা ধৌত হয়ে যাবে। এমনি সংকটের মুহূর্তে যখন আমাদের আক্বা ও মাওলা হুযূর পুরনূর তাশরীফ আনবেন, তখন হাশরের ময়দানের নকশাই বদলে যাবে।

ক্বিয়ামতের দিনে হাশরের ময়দানের অবস্থা ও দৃশ্য

এ দিন সূর্য, যা আজ চতুর্থ আসমানে যমীন থেকে চার হাজার বছরের দূরত্বে অবস্থান করছে, শুধু এক 'মাইল' পরিমাণ দূরত্বে অবস্থান করবে। হাদীস শরীফে 'আল্মীল' (اَلْمِیْلُ) শব্দ এসেছে। বর্ণনাকারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু বলেন, আমি বলতে পারি না এ শব্দ দ্বারা প্রসিদ্ধ এক 'মাইল' (**میل مسافت**) এর দূরত্ব বুঝানো হচ্ছে, না 'মাইলে মিক্হালাহ্' (**میل مکحلہ**) বা 'সুরমাদানির শলা'

পরিমাণ দূরত্ব বুঝানো হচ্ছে। যদি প্রসিদ্ধ এক মাইলের দূরত্ব বুঝানো হয়, তবে ওই সূর্য, যা এখন সেটার পিঠ দিয়ে তার কিরণ দিচ্ছে, ওই দিন তা এদিকে মুখ করেই কিরণ বিচ্ছুরিত করবে। ময়দানে ছায়া তালাশ করলেও কোথাও একটু ছায়া পাওয়া যাবে না। সারা জীবনের সমস্ত 'আমল' (কর্ম) -এর হিসাব নেওয়া হবে। ওইদিন না কোন বন্ধু থাকবে, না কোন সাহায্যকারী। না থাকবে কোন সান্ত্বনাদাতা, না থাকবে কোন দুঃখের সাথী। যাদের নিকট থেকে সাহায্যের আশা করা যায়, তারা নিজেরাই নিজেদের নানা পেরেশানীতে পরিবেষ্ঠিত থাকবে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র ক্বোরআনে এরশাদ ফরমাচ্ছেন- ط

لِكُلِّ امْرِءٍ مِّنْهُمْ○وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ○وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ○يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ ○يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُّغْنِيْهِ

তরজমা : সেদিন মানুষ পলায়ন করবে নিজ ভাই, মাতা ও পিতা এবং স্ত্রী ও সন্তানদের থেকে। তাদের মধ্যে প্রত্যেকের সেদিন একটা মাত্র ভাবনা থাকবে, যা-ই তাকে (অন্যের ভাবনা থেকে) বিরত রাখবে। [৮০:৩৪, কান্‌যুল ঈমান]

ওই দিন সমস্ত মানুষ হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম-এর নিকট যাবে এবং পরিষ্কার ভাষায় জবাব পাবে- نَفْسِیْ نَفْسِیْ اِذْهَبُوْا اِلٰی غَیْرِیْ (নাফসী, নাফসী! তোমরা আমি ব্যতীত অন্য কারো নিকট যাও!) তারপর তারা হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম -এর নিকট যাবে। তাঁর নিকটও একই জবাব পাবে। তারপর তারা হযরত ইব্‌রাহীম আলায়হিস্ সালাম -এর নিকট হাযির হবে। এখানেও একই জবাব পাবে। তারপর তারা হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম -এর নিকট যাবে। কিন্তু পরিষ্কার ভাষায় একই জবাব পাবে। তারপর তারা হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম -এর নিকট হাযির হবে। এখানেও একই জবাব পাবে। শেষ পর্যন্ত তারা আফতাবে নুবূয়ত, মাহতাবে রিসালত হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মহান দরবারে হাযির হবে। এখানে তারা জবাব পাবে সম্পূর্ণ বিপরীত। হুযূর এরশাদ করবেন- اَنَا لَهَا اَنَا لَهَا (আমি তো ওই সুপারিশের জন্যই, আমি তো ওই সুপারিশের জন্যই)। কবির ভাষায়-

کہیں گے اور نبی اذھبھوا الی غیری
مرے حضور کے لب پر اَنَا لَهَا ہو گا

অর্থাৎ : সব নবী বলবেন- তোমরা আমি ব্যতীত অন্য কারো নিকট (শাফা'আত-ই ক্বোব্‌রার জন্য) যাও, কিন্তু আমার নবী হুযূর-ই আক্‌রামের ওষ্ঠ মুবারকে উচ্চারিত হবে- 'আমি ওই সুপারিশের জন্যই'।

হুযূর তাৎক্ষণিকভাবে শাফা'আতের জন্য প্রস্তুত হবেন। তিনি মহান রবের

মহানতম দরবারে সাজদারত হবেন। আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন- اِرْفَعْ رَأْسَکَ وَقُلْ تُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ (আপনি, হে হাবীব! আপন শির উঠান এবং বলুন! আপনার কথা শোনা হবে। সুপারিশ করুন! আপনার সুপারিশ কবূল হবে।)

এভাবে হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সুপারিশের দরজা খুলে দেবেন। তারপর অন্যান্য নবী, ওলী, নেক্‌কার বান্দা, আলিম, হাজী ও হাফিজ প্রমুখ শাফা'আত করবেন।

সুতরাং একথা সুস্পষ্ট হলো যে, কাল ক্বিয়ামতে আমাদের ছায়াবিহীন নূরী নবী, আমাদের আক্বা ও মাওলা তাঁর স্নেহ-মমতার ছায়ায় সমস্ত উম্মতকে ঢেকে নেবেন। প্রাথমিক অবস্থায় শাফা'আত-ই কুব্‌রার (বৃহত্তম সুপারিশ)-এর মাধ্যমে ক্বিয়ামতে অবস্থানরত সবাইকে মহা সংকট থেকে মুক্তি দেবেন। তারপর সমস্ত নবী-ওলী তথা আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের জন্যও আপন আপন লোকদের জন্য সুপারিশ করার দরজা খুলে দেবেন, আর নিজে আপন উম্মতের মধ্যে প্রকৃত ঈমানদারদেরকে সুপারিশ করে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে দুনিয়ায় আমাদের আক্বা ও মাওলা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রকৃত অর্থে উম্মত হয়ে থাকার এবং পরকালে তাঁর ছায়ায় আশ্রয় ও তাঁর সুপারিশ পেয়ে জান্নাতবাসী হবার তাওফীক দিন!! আমিন!!!

হুযূর-ই আক্‌রামের উজিরদ্বয়ের শত্রুদের অশুভ পরিণতি!

আবূ সাদিক্ব বর্ণনা করেছেন, এক হাজী বাগদাদ শহরে এমন এক ব্যক্তির খোঁজ করছিলো, যার নিকট তাঁর কিছু মালামাল আমানত হিসেবে রেখে হজ্জে যেতে পারবেন। এক বৃদ্ধ দোকানদারকে দেখে তার নিকট তাঁর মালামালগুলো আমানত রাখতে চাইলেন, কিন্তু সে তা রাখতে অস্বীকার করলো। হাজী সাহেব তাকে বারবার অনুরোধ করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত ওই দোকানদার রাজি হলো; তবে তজ্জন্য একটি শর্ত জুড়ে দিলো।

: কী শর্ত?

: শর্তটা হলো, আমার একটা পয়গাম (সংবাদ) হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে পৌঁছাতে হবে।

: তোমার পয়গাম অবশ্যই পৌঁছাবো, বলো তোমার পয়গামটা কী।

: আমার পক্ষ থেকে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বলবে, ''যদি আপনার পাশে আবূ বকর ও ওমর (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) না থাকতেন, তাহলে আমি আপনার দরবারে প্রতি বছর হাযির হতাম।'' (নাউযু বিল্লাহ্!)

দোকানদার যে শিয়া-রাফেযী ছিলো তাতে সন্দেহ নেই। কারণ শায়খাঈন (হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব ও হযরত ওমর ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা'র প্রতি শত্রুতা শিয়া-রাফেযীরা-ই রাখে।

এদিকে লোকটির হজ্জে যাবার তাগিদে মালগুলো গচ্ছিত রাখতেই হচ্ছে। তাই তিনি তাঁর মালামালগুলো এমন জঘন্য শর্ত শোনা সত্ত্বেও দোকানদারের নিকট রেখে হজ্জে রওনা হয়ে গেলেন।

হজ্জ শেষে পবিত্রতম রওযা শরীফে হাযির হলেন ওই হাজী সাহেব। এবার ওই বৃদ্ধের পয়গাম কিভাবে উপস্থাপন করবেন তা নিয়ে মনে নানা সংশয়। এটা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে সময়ক্ষেপন করতে করতে তাঁর চোখে ঘুম এসে গেলো। স্বপ্নে হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাক্ষাৎ নসীব হলো। হুযূর-ই আক্‌রামের সাথে হযরত আবূ বকর এবং হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমাও ছিলেন। হুযূর আলায়হিস্ সালাওয়াতু ওয়াস্ সালাম এরশাদ করলেন, ''বাগদাদের বৃদ্ধ দোকানদারের পয়গাম শুনাও।'' হাজী সাহেব রসূলে আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভক্তিপ্রযুক্ত ভয় ও হুযূরের মহত্বের কারণে আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন এবং তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেলো। তারপর তিনি ওযূ করলেন। নফল নামায পড়লেন। এরপর

আবার তাঁর চোখে ঘুম এসে গেলো। স্বপ্নে সরকার-ই দু'আলম আবার বললেন, ''বাগদাদের বৃদ্ধের পয়গাম শুনাও।'' হাজী সাহেব অতি ভক্তি সহকারে আরয করলেন-

: এয়া রাসূলাল্লাহ্! ওই অভিশপ্তের কথা আপনি আমার চেয়ে বেশী অবগত আছেন। (আমার তো ভীষণ ভয় হচ্ছে।)

: হ্যাঁ, আমি জানি। তবে তুমি যে তার সাথে ওয়াদা করে এসেছো তা পূরণ করা তোমার জন্য অপরিহার্য।

: তাহলে এয়া রাসূলাল্লাহ্ অনুগ্রহ করে শুনুন, ওই অভিশপ্ত বলেছিলো, আপনার পাশে এ দু'জন যদি না থাকতেন, তাহলে সে নাকি প্রতি বছর আপনার দরবারে উপস্থিত হতো।

(তখন সেখানে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুও উপস্থিত হলেন।) হুযূর-ই আক্‌রাম হযরত আলীর দিকে তাকালেন। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি তাঁর সাথে বাগদাদের ওই বৃদ্ধকে নিয়ে আসলেন। হুযূর ওই হাজী সাহেবের মাধ্যমে তার পয়গামের সত্যায়ন করালেন-

: তুমি কি এমন খবর পাঠিয়েছো?

: জ্বী-হুযূর!

তার গর্দান উড়িয়ে দাও। (শিরশ্ছেদ করো)

সরকার-ই দু'আলমের নির্দেশ পাওয়া মাত্রই হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তরবারী দ্বারা তার শিরশ্ছেদ করলেন। নিহতের কয়েক ফোঁটা রক্ত হাজী সাহেবের কাপড়েও পড়লো। হাজী সাহেবের ঘুম ভাঙ্গলে তাঁর পোশাকে রক্তের চিহ্ন দেখতে পেলেন। তিনি তখনই ওই তারিখ ও দিনক্ষণ লিখে রাখলেন। তারপর বাগদাদে ফিরে এসে ওই বৃদ্ধের খোঁজ নিলেন। এক মহল্লাবাসী বললো, ওই বৃদ্ধ একদিন বসা ছিলো। হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলো। আমরা তাকে বহু তালাশ করলাম; কিন্তু জীবিত পেলাম না। এক বিরান ভূমিতে তার লাশ পাওয়া গেলো, তবে দেহের সাথে মাথা ছিলো না।

হাজী সাহেব তার অদৃশ্য হবার তারিখ জিজ্ঞাসা করলেন। দেখা গেলো তারিখ ও সময় তা-ই ছিলো, যা তিনি (হাজী সাহেব) নোট করে রেখেছিলেন। তিনি বৃদ্ধের ওই ধৃষ্টতাপূর্ণ পয়গাম ও মদীনা মুনাওয়ারায় তাঁর স্বপ্নের কথা লোকজনকে বললেন। তৎক্ষণাৎ ওই খবর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো। তদানীন্তন বাগদাদের খলীফার নিকট পর্যন্ত এ সংবাদ পৌঁছে গেলো। তখন খলীফা সরকারীভাবে ঘোষণা দিলেন-''যে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবা-ই কেরামকে গালি দেয় তাদের উপর আল্লাহর লা'নত (অভিসম্পাত) হোক!'' [সূত্রঃ জামেউল মু'জিযাত]

হযরত সিদ্দীক্ব-ই আকবর ও ফারুক্ব-ই আযমের ওসীলায় প্রাণ রক্ষা পেলো!

জাফর হাযারী বর্ণনা করেন, আমি এক কাফেলার সাথে ভ্রমণ করছিলাম। আমার সফরসঙ্গীরা রাফেযী (শিয়া) ছিলো। শায়খাঈন অর্থাৎ- হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ও হযরত ওমর ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার প্রতি তাদের মানহানিকর মন্তব্যের খণ্ডন করার মধ্যে ব্যস্ত ছিলাম। এভাবে চলতে চলতে আমরা এক জঙ্গলে উপনীত হলাম। জঙ্গল থেকে এক হিংস্র জন্তু বের হয়ে আসলো। সেটা সবাইকে ছেড়ে আমাকে ধরে ফেললো। আমি ভাবলাম, এ কী হলো? এখনতো ওই রাফেযীরা বলবে, ''আমি হযরত শায়খাঈনের পক্ষাবলম্বন করে ভুল করেছি। তাই আমি এমন বিপদে আটকা পড়েছি। আমি মিথ্যুক ভ্রান্ত, আর তারা সত্যপন্থী।'' জন্তুটি আমাকে ধরে তুলে নিয়ে গেলো এবং তার বাচ্চাগুলোর সামনে নিয়ে রেখে দিলো। সেটা ওইগুলোর খোরাক হিসেবে আমাকে যোগাড় করে দিয়েছিলো। আমার মধ্যে দুটি ভয় ছিলো-একটি আমার পরম সম্মানিত শায়খাঈনের সম্মানহানির ভয়, অপরটি আমার প্রাণের ভয়। সুতরাং আমি ভীত সন্ত্রস্থ হয়ে আক্বা ও মাওলা হুযূর-ই আক্রামের পবিত্র রওযা-ই আক্বদাসের দিকে মনোনিবেশ করে সাহায্য চাইলাম আর আরয করলাম, ''এয়া রসূলুল্লাহ্! আমাকে সাহায্য করুন!'' সুব্হানাল্লাহিল আযীম!! দেখুন তারপর কী ঘটলো!

জন্তুর বাচ্চাগুলো আমার নিকট আসলো। আমার ঘ্রাণ নিলো আর পেছনের দিকে সরে গেলো। মা-জন্তুটি এক বিকট ধ্বনি দিলো। আমার মনে হলো, সেটা বলছিলো, তোমরা তাকে খাচ্ছো না কেন? আমার ধারণা সঠিক হলো। তখন বাচ্চাগুলো অলৌকিভাবে স্পষ্ট আরবী ভাষায় বলে উঠলো, ''মা তুমি আমাদেরকে তিনদিন যাবৎ অনাহারে রেখেছো। আর এখন এমন এক ব্যক্তিকে তুলে নিয়ে এসেছো, যে নবী-ই আক্রামের সাহাবীদেরকে ভালবাসে। আমরা তাকে কীভাবে খেতে পারি?''

জন্তুর বাচ্চাগুলোর মুখে একথা শুনে আমি আশ্চর্যান্বিত হলাম। তৎক্ষণাৎ ওঠে দাঁড়ালাম এবং একদিকে চলে গেলাম। আল্লাহ্রই শপথ! জন্তু ও তার বাচ্চাগুলো আমার প্রতি উদ্যত হয়নি। আমিও এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম- ''শায়খাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার ভালবাসা আমার প্রাণ রক্ষা করেছে।''

সিদ্দীক্ব ও ফারুক্বের প্রতি বিদ্বেষ আছে যে দুষ্ট অন্তরে!

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, আমরা একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দরবারে উপবিষ্ট

ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি আসলো, যার পায়ের গোছা যুগল থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিলো। হুযূর এরশাদ করলেন, ''কী ব্যাপার?'' সে বললো, (তার ভাষায়) অমুক মুনাফিক্বের কুকুর কামড় দিয়ে আমাকে আহত করেছে।'' হুযূর বললেন, ''একটু বসো!'' সে সে বসে পড়লো। কিছুক্ষণ পর আরেক জন আসলো। তার পায়ের গোছাযুগলও রক্তাক্ত ছিলো। হুযূর তাকেও এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন সেও বললো, (তার ভাষায়) ''অমুক মুনাফিক্বের কুকুর কামড়িয়ে এমন হাল করেছে।''

হুযূর দাঁড়িয়ে গেলেন আর বললেন, ''চলো গিয়ে দেখি কুকুরটা পাগল হলো কিনা! তাহলে তো মেরে ফেলতে হবে।'' যখন তাঁরা কুকুরটির নিকটে পৌঁছলেন, তখন কুকুরটি হুযূর-ই আক্রামের কদম শরীফে লুটিয়ে পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছিলো। আর পরিস্কার ভাষায় আরয করলো-

:আমাকে মেরে ফেলবেন না, আমি আল্লাহর উপর ও আপনার উপর ঈমান রাখি।

:কিন্তু তুমি আমার সাহাবী (বলে দাবীদার) দু'জনকে কেন কামড়ালে?

: হে আল্লাহ্র রসূল, এ দু'জন লোক মুনাফিক্ব। এরা উভয়ে হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমরকে গালি দিচ্ছিলো। তা শুনে আমার সহ্য হয়নি। সুতরাং আমি তাদেরকে আমার বিষমাখা দাঁত দিয়ে দংশন করেছি।

হুযূর ওই মুনাফিকদের উদ্দেশে বললেন, ''তোমরা শুনলে তো, কুকুর কি বললো।'' তোমাদের লজ্জা-শরম থাকলে পানিতে ডুবে মরা উচিত। একটা পশু হযরত শায়খাঈনের প্রতি ভালবাসা রাখে, আর তোমরা হলে মানুষ। মানুষ হয়ে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ রাখছো!''

এটা শুনতেই তারা উভয়ে হুযূরের কদম শরীফে লুটিয়ে পড়লো আর কাঁদতে কাঁদতে আরয করলো, ''এয়া রসূলাল্লাহ্! আমরা সাচ্চা অন্তরে তাওবা করছি।

----o----